প্রবাসীর চিঠি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

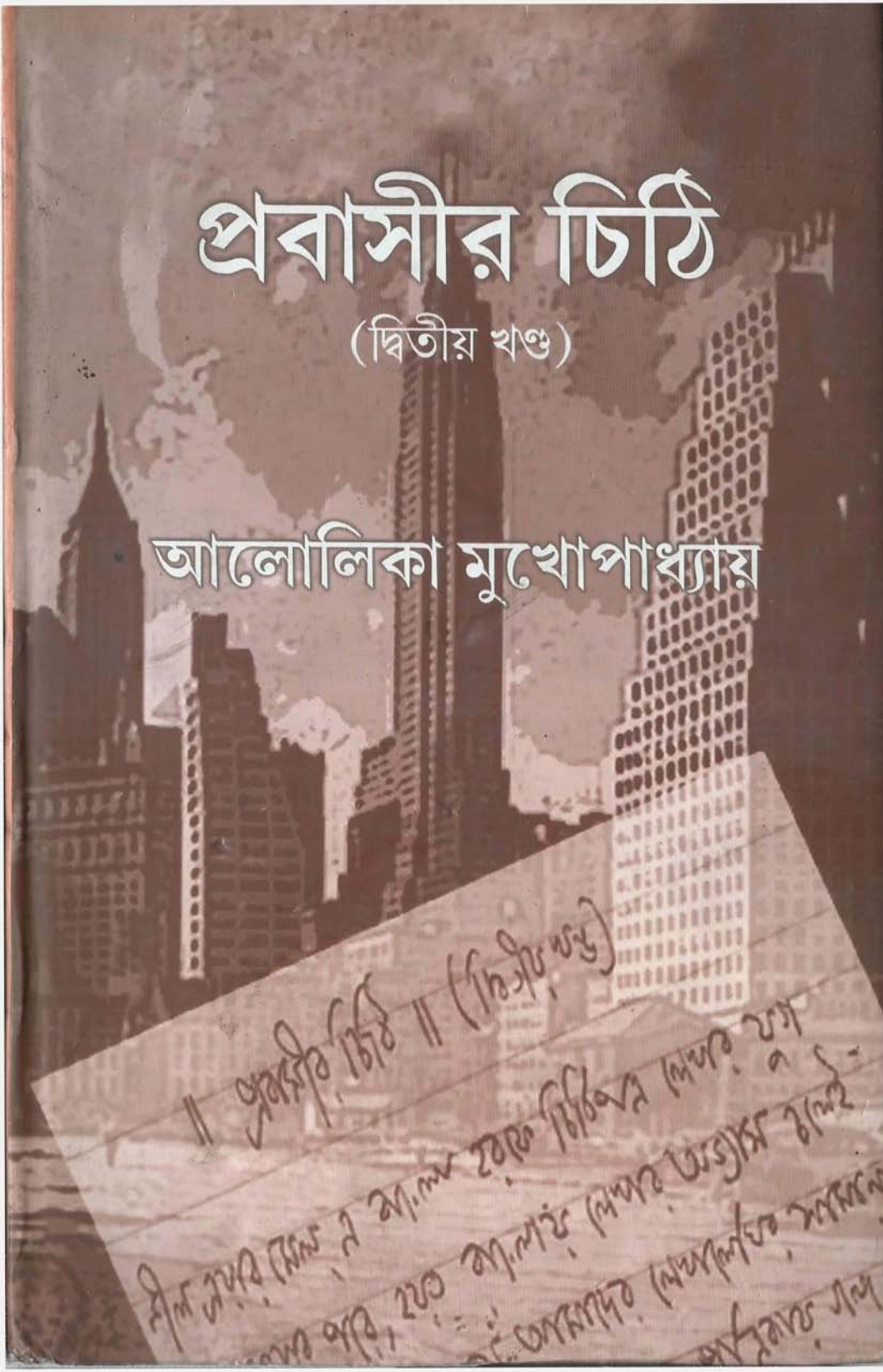

প্রবাসীর চিঠি

দ্বিতীয় খণ্ড

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

দাশগুপ্ত - অ্যালায়েন্স

PROBASEER CHITHI (Vol. 2)
by Alolika Mukhopadhyay
ISBN : 978-818211-068-7

প্রকাশক
দাশগুপ্ত - অ্যালায়েন্স
১৪/১ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯
E-mail : alliance.dasgupta@gmail.com

গ্রন্থসত্ত্ব ঃ আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০১০

প্রাপ্তিস্থান
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪/৩ কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
E-mail : boiwala.dasgupta@gmail.com

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা

প্রচ্ছদ
সুজন দাশগুপ্ত

মুদ্রণ
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮১ সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬
দূরভাষ ঃ ২২৪১ ১০০৬
E-mail : apw@satyam.net.in apw@vsnl.net

উপহার
স্নেহের শ্রীময়ী ও চেতনকে

ভূমিকা

নীল এয়ার মেল্-এ বাংলা হরফে চিঠিপত্র লেখার যুগ শেষ হওয়ার পরে, হয়ত বাংলায় লেখার অভ্যাস চলেই যেতো, যদি না প্রবাসে আমাদের লেখালেখির সামান্য চর্চা থাকতো। যদি না, কোলকাতার পত্রিকায় গল্প বা ধারাবাহিক কলাম লেখার সুযোগ আসতো।

আঠার বছর আগে "সাপ্তাহিক বর্তমানে" প্রবাসীর চিঠি শুরু করার সময় কোনো ধারণা ছিল না, কতদিন কলামটি স্থায়ী হবে। সোজা কথায়, বরুণ সেনগুপ্তর মতো প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক ও সম্পাদকের দেওয়া চাকরি নিয়ে একটু সংশয়েই ছিলাম। যত দূর দেশেই থাকি, মাথার ওপর সম্পাদক আছেন। দেখা সাক্ষাৎ না থাক, টেলিফোনে নির্দেশ পাঠান। তাঁর নীচে আছেন সহ সম্পাদক। সব থেকে বড় কথা যে পাঠক সমাজের সঙ্গে আমার পরোক্ষ সংযোগও ছিল না, তাঁরা কি আমার কলামের বিচিত্র বিষয়গুলি পছন্দ করবেন?

বরুণবাবু লেখার বিষয় নির্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমি আমেরিকার মূল সমাজকেন্দ্রিক লেখার পাশাপাশি আমাদের ভারতীয় অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা, সুখ, দুঃখ, সাফল্য, নৈরাশ্যের কথা লিখেছি। চেষ্টা করেছি, আমেরিকার সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবার, শিল্প, রাজনীতি, চিকিৎসাব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের যথাসাধ্য পরিচয় ঘটাতে। অক্ষমতা, অসম্পূর্ণতা যতোই থাক, পাঠকের আগ্রহ আর কল্পনা শক্তি মিলিয়ে মিশিয়ে অন্ততঃ ছবি ফুটে উঠতে পারবে।

আমার বিশিষ্ট বন্ধু সুজন দাশগুপ্ত "প্রবাসীর চিঠি"র দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়গুলি নির্বাচন করেছেন। সুজন এবং তাঁদের প্রকাশনা সংস্থা "দাশগুপ্ত অ্যালায়েন্স"-কে ধন্যবাদ জানাই। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে সাপ্তাহিক-এর বিভিন্ন সময়ের সহ-সম্পাদক ও সহকর্মীদের কথা। অশোক বসু, পান্নালাল ঘোষ, পার্থ ঘোষ, প্রয়াত অনুভা কর, ছন্দবানী মুখোপাধ্যায়, সাহানা নাগ চৌধুরী, প্রেমতোষ দে, অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী অলয় ঘোষাল। এঁদের সহযোগিতার কথা মনে

থাকবে। ধন্যবাদ জানাই ''বর্তমান পত্রিকা''র সম্পাদক শুভা দত্ত ও ''সাপ্তাহিকের'' সম্পাদক কাকলি চক্রবর্তীকে। 'মেন্টর' কথাটির যদি কোনো উপযুক্ত প্রতিশব্দ থাকে, তবে তার জন্যে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই প্রয়াত বরুণ সেনগুপ্তর স্মৃতির উদ্দেশে। ''সাপ্তাহিক বর্তমানে'' কলাম লেখার কাজ শেষ হলেও জানবো দীর্ঘ দিন ধরে বহুদূরে কিছু পাঠক কোথাও ছিলেন নিশ্চয়। নয়তো চাকরি থাকতো না। তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

মেথির রাজ্যে মারিয়া

আমাদের বাড়ির দশ-বারো মাইলের ভেতরে কোনও ভারতীয় মশলাপাতির দোকান নেই। এদিকটায় ভারতীয় কম। বেশি খদ্দের জুটবে না বুঝে গুজরাতিরা কোনও দোকান খুলতে ভরসা পায় না। অথচ তিরিশ চল্লিশ মাইল দুরে এডিসন শহরে গেলে মনে হবে মিনি আমেদাবাদ। আদর করে লিটল ইন্ডিয়াও বলা যায়। মশলাপাতির দোকান, গয়নার দোকান, শাড়ির দোকান, মিষ্টির দোকান, মোগলাই রেস্টুরেন্ট, বাঙ্গালোর প্যালেস, কোহিনুর রেস্টুরেন্ট—গন্ধে গন্ধে পাড়া মাত। নিউ জার্সি ভারতীয়দের স্বর্গরাজ্য। অধিকাংশের বাসও তো ওইদিকে। সে জন্যে গুজরাতি, কচ্ছিদের ব্যবসাও জমেছে ভালো।

তবু একবার সাহস করে এক বাঙালি এদিকে ছোট্ট একটা দোকান খুলেছিলেন। কিন্তু মোটেই চলল না। তাঁরা সপরিবারে পালা করে দোকানে এসে বসতেন। সকালে গিন্নি, বিকেলে ছেলে আর সন্ধেবেলা অফিস ফেরত কর্তা এসে বিক্রিবাটা করতেন। লক্ষ করতাম, সাহেবরা শুধু আসত সিগারেট আর খবরের কাগজ কিনতে। চাল ডালের খদ্দের বলতে দিনের বেলা একা আমি। বিকেলের দিকে এক-আধজন ভারতীয় মহিলা। অবশ্য আমার ঘন ঘন যাতায়াতে সমানেই মনে হত খদ্দের ঢুকছে আর বেরচ্ছে। দিনের বেলা দোকানের বন্ধ দরজায় টুং শব্দ শুনলেই "নবকল্লোল" পাঠরতা গিন্নি চমকে উঠতেন। তারপর কাচের ফাঁকে আমার উঁকি ঝুঁকি দেখে কী খুশি! প্রথম কিছুক্ষণ কুশল সংবাদ বিনিময়। তাঁর বাবার হাই ব্লাড প্রেশার। আমার বাবারও তাই ছিল। তাঁর মার কিঞ্চিৎ ব্লাড সুগার। আমার মারও তাই। সে

সময় আবার দুজনেরই মা আমেরিকায় বেড়াচ্ছেন। তিনি আমায় বলতেন—ডায়াবিনিস ভীষণ খারাপ। বন্ধ করে দিন। রোজ সকালে মেথির গুঁড়ো খাওয়ান। এখন তো প্যাকেটে ইমপোর্টেড মেথিগুঁড়ো পাওয়া যাচ্ছে। আমি পালটা উপদেশ দিয়ে বলতাম—করলার রস তো আরও উপকারী।

—না, না উচ্ছের শরবত।

—কোনও ডিফারেন্স হবে না। করলার শরবতই খাওয়াবেন মাকে।

মেথির কাটতি নেই বুঝে মহিলা তরকারি ঝুড়ি থেকে তিনটে পুষ্ট করলা তুলে নিতেন। ওজন করে বলতেন—ছ'ডলার। আমি কিনতে কিনতে আবার উপদেশ দিতাম—আপনার মাকেও খাওয়াবেন কিন্তু। একমাস পরে দুজনের মারই সুগার টেস্ট করাব...।

ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বেশ ভাব জমে উঠেছিল। আমি চাল, ডাল, সরষের তেলের পুঁচকে শিশি আর করলার ব্যাগ দুলিয়ে বেরিয়ে যেতাম। মহিলাও মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন নবকল্লোলের পাতায়।

কিন্তু খদ্দের না হলে ব্যবসা চলে? আমরা মুষ্টিমেয় ক'জন বাঙালি মিলে কত আর বাসমতি চাল, মুগ, মুসুর, ছোলা, কড়াই-এর ডাল খাব? দু'পাউন্ডের গুঁড়ো মশলার প্যাকেট সহজে শেষ হতে চায় না। নান রুটিও অনবরত কত খাওয়া যায়? লাউ, করলা, নারকোল, বরবটি আর তেলাকুচো রোজ রোজ কেনা অসম্ভব। ওইসব দিয়ে রান্না করলেই খাবার টেবিলে দ্বিতীয় প্রজন্মের খাদ্য আন্দোলন। সত্যি বলতে কি দেশে থাকতেও তেলাকুচোর তরকারি খাইনি কোনওদিন। বিদেশে বাঙালির ব্যবসাকে প্রেরণা দিতে রোজ রোজ কত আঁটি ধনেপাতা খাওয়া সম্ভব? শেষমেশ আমি ভিডিও সিনেমার ক্যাসেট ভাড়া করে তাঁদের মনোবল জাগিয়ে রাখতে চাইতাম। সবেধন নীলমণি দোকানটি উঠে যাবে ভেবে খারাপ লাগত। তাঁদের দোকানে হিন্দি ও বাংলা সিনেমার কিছু স্টক ছিল। আমার মাকে নিয়মিত খান দুই 'শো' দেখার জন্যে রীতিমত উদ্বুদ্ধ করতে হত সকাল থেকে। সর্বসাকুল্যে সাতখানা বাংলা বই এনে দেখালাম। দু'ডলার করে লাগত একটা ক্যাসেট ভাড়া নিতে। তারপর শুরু হল হিন্দির স্টক। সারা দুপুর ধরে চলেছে 'কেয়ামৎ সে কেয়ামৎ তক্'। নয়তো সাত সকালে লাগিয়ে দিয়েছি—'এক দুজে কে লিয়ে'। শেষ দিকে শুধু মার সজোরে নাক টানার আওয়াজ। প্রতাপ শৈবলিনীর দুঃখে চোখে জল। সেই বাঙালির দোকানের ক্যাসেট দেখে দেখে রতি অগ্নিহোত্রী

থেকে কমল হাসান, জয়াপ্রদা, শ্রীদেবী—কাউকে মার চিনতে বাকি থাকল না। কয়েক মাস বাদে মা দেশে ফিরে গেলেন। বাঙালির দোকানও উঠে গেল। করলার রস খাবার লোক নেই, মুলোর ঘণ্ট বানাবার মানুষ নেই, আমির খান, অমিতাভ বচ্চনের একনিষ্ঠ দর্শক নেই—বোধহয় এ জন্যেই দোকানটা মার খেয়ে গেল। প্রায় মাতৃহারা হল বলা যায়। আমারও সকাল বিকেল, কাঁচালঙ্কা কিনতে যাওয়া ঘুচল।

এবার খুঁজে খুঁজে প্রায় পনেরো মাইল দূরে 'ভারত বাজার' নামে নতুন দোকান আবিষ্কার করলাম। শহরের নাম ফেয়ার ফিল্ড। দোকানটাও বেশ বড়। চাল, ডাল, মশলাপাতি, টাটকা তরিতরকারি, আটার রুটি, নিউইয়র্কের মিষ্টির দোকানের রকমারি মিষ্টি, ভিডিও ক্যাসেট, ঝুটো গয়না, পুজোর বাসন—জিনিসের অভাব নেই। কিন্তু সবই কেমন এলোমেলো, অগোছালোভাবে রাখা। যেন একটা গুদামে ঢুকেছি। জিগর প্যাটেল হচ্ছে মালিকের নাম। বরোদার ছেলে। বয়স হবে বছর ত্রিশ/বত্রিশ। ওদের দু'পুরুষের ব্যবসা এদেশে। এতদিন দাদারা দোকানপত্র দেখত। এখন জিগরের আলাদা দোকান হয়েছে। নামের মাহাত্ম্য বজায় রাখতে জিগরের খুবই হার্দিক ব্যবহার। দোকানে গেলেই মুচকি মুচকি হাসি। যা চাইছি, সবই খুঁজে পেতে এনে দিচ্ছে। নয়তো কর্মচারীদের ভেতরের দিকে বড় গুদামে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মোট কথা, অগোছালো হলেও জিনিসপত্র জোগান দিতে পারছে। দাম বেশ গলাকাটা বলছে প্রথমে। তারপর যেন কত হৃদয়বান, এমনই ভাব করে পঞ্চাশ সেন্ট কি এক ডলার ছেড়ে দিচ্ছে। আমি জানি এডিসনের লিটল ইন্ডিয়াতে এর চেয়ে অনেক কম দামে জিনিসপত্র পাওয়া যায়। কিন্তু অত দূরে যাবে কে? জিগরের দোকানে গুজরাতি আর অন্যান্য ভারতীয়দের ভিড়ও ক্রমশ বাড়ছিল। দোকানে জিনিসপত্রের কোয়ালিটি ভালো। ওর মধুর ব্যবহার। ধমক দিলে হেসে একটু দাম কমিয়ে দেয়। আমরা অনেকেই যেতে শুরু করলাম। ওই অঞ্চলে আর একটা দোকান ছিল। নাম "ফোর্থ ডায়মেনশন"। কিন্তু তার মালিক অরবিন্দ শার সামান্য ঝগড়াটে বলে বদনাম ছিল। কে নাকি "শোহন হালুয়া" একটুখানি টেস্ট করে কিনতে চেয়েছিল। কণিকামাত্র খেয়ে, 'সুবিধের নয়' বলে কিনছিল না। অরবিন্দ সেই গুঁড়োর জন্যে পঞ্চাশ সেন্ট নিয়েছিল। আর জিগরের কী প্রাণ। কথায় কথায় এক ডেলা "ধোকলা" টেস্ট করতে দিচ্ছে। জিলিপি ভেঙে

পরখ করতে দিচ্ছে। ক্রেতাদের মন জয় করার কী আগ্রহ! ফলে ফোর্থ ডায়মেনশনের ভূতপূর্ব খদ্দেররা ভারত বাজারে বাজার করতে লাগল। আমি দুর্গাপুজোর ব্রোশিওরের জন্যে মস্ত এক পাতা বিজ্ঞাপনও আদায় করে নিলাম। পরে অবশ্য চেক আদায় করতেও প্রাণ গিয়েছিল। যাই হোক, জিগর ধীরে ধীরে বেশ উন্নতি করছিল।

কিছুদিন বাদে হঠাৎ দেখি যখন তখন দোকান বন্ধ থাকে। ভেতরে আলো জ্বলছে। বাইরে থেকে লক লাগানো নেই। অথচ ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। কখনও জিগর হুট করে দেওয়ালের পাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। কখনও ঘর্মাক্ত কলেবরে দরজা খুলে দিয়ে বোকা হাসি হাসে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল। জিগর কি ড্রাগের কারবার করছে? নাকি নিজেই নেশার কবলে পড়েছে? বাইরে ওর ভ্যান পার্ক করা থাকে। অথচ মাঝে মাঝেই অদৃশ্য মানুষ। শেষমেশ একদিন দোকানে ঢুকে দেখলাম একটা শুঁটকো মতো লোক কাউন্টার সামলাচ্ছে। জিনিসপত্রের আজেবাজে দাম বলছে। কালোজিরে চাইলে কালো তিল গছিয়ে দিচ্ছে। ছোলার ডাল চাইলে মটর ডাল চালাচ্ছে। ঘি-এর বদলে নারকোল তেলের শিশি বয়ে আনছে—একেবারে আনাড়ি টাইপের লোক। অর্ধেক দিন দরকারের জিনিস পাই না। শুঁটকো পচা ঝিঙে, দাগ ধরা করলা, মাটি মাখা আধপচা ধনে পাতা, চিমড়ে কাঁচা লঙ্কা দেখে খদ্দেররা তো রেগে কাঁই। একদিন জনতার দাবিতে গুদাম থেকে জিগর বেরিয়ে এল। ঘর্মাক্ত চেহারা। হাসিটাও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। চেঁচিয়ে বলল—দোকান এবার ঢেলে সাজাব। বড্ড অব্যবস্থা চলছে এখন। আর মাস খানেক সময় দাও। তারপর সব জিনিস এসে যাবে। হঠাৎ দেখি গুদাম থেকে হাসি হাসি মুখে বেরিয়ে আসছে সুন্দরী এক মেমসাহেব। দেখে স্প্যানিশ কিংবা ইতালিয়ান মনে হল। বয়স তো নির্ঘাৎ জিগরের চেয়ে বেশি হবে। আমাদের সবাইকে গায়ে পড়ে হাই বলল। আমরা তখন রহস্য ভেদ করতে ব্যস্ত। মহিলা ততক্ষণে রেফ্রিজারেটর খুলে কাঁচা আম বার করছে। তরকারির তাকে পুদিনার আঁটি সাজাচ্ছে। জিগর আবার হাওয়া হয়ে গেল।

উমা যোশি বাইরে বেরিয়েই বলল—জিগর নির্ঘাৎ দিনে দুপুরে অসভ্যতা করছে। সব সময় গুদাম ঘরে কেন বসে থাকে বুঝতে পারছ?

মালিনী ভাট বলল—হয়তো বিয়েই করেছে। আমরা ওর বিষয়ে কতটুকুই বা জানি? আমার মনে হচ্ছিল এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও

মানে হয় না। মশলার দোকানের মালিকের চরিত্র সংশোধনের দায় নিয়ে দোকানে আসিনি আমরা। তবে দোকানটা যদি ও ঠিকমতো না দেখাশোনা করে, আবার ফোর্থ ডায়মেনশনে ফিরে যেতে হবে। শুনছি, 'একঘরে' হবার পরে নাকি দুর্মুখ অরবিন্দ শা এখন ভীষণ মধুর ব্যবহার করছে। জিগরের কুঞ্জবনে আর এক/দুবার গিয়ে দেখব। অন্তত এবারের পুজোর অ্যাডটা জোগাড় করব। তারপর ওর 'দশা' বুঝে অরবিন্দের মুখারবিন্দ দর্শন করতে যাব।

মাঝে সত্যি সত্যিই মাস দেড়েক আর যেতে পারিনি। সুপার বাজার থেকে ঘেসো মার্কা লঙ্কা কিনেছি। নয়তো অন্য কাজে এডিসনের দিকে গেলে মশলাপাতি কিনে নিয়েছি। হঠাৎ জিগরের পত্রাঘাত! "ভারত বাজারের" চকচকে ফ্লায়ার। কত কী লিখেছে! "নব রূপে ভারত বাজার"। "সাজানো শো রুমে সেরা কোয়ালিটির জিনিস।" "বিরাট সেল"। "টিনের এঁচোড় তিনটে কিনলে একটা ফ্রি"। "গরম মশলায় বিশেষ ছাড়"। "সব ডালের এক দাম"। "পঞ্চাশ ডলারের ড়াল কিনলে পাবে এক বস্তা ফ্রি আটা"। "তিনটে লাউ কিনলে একটা ফ্রি নারকোল"। "পুজোর কোযাকুষি কিনলে এক প্যাকেট ফ্রি মাইশোর ধূপ"...এরকম নানা টোপ ফেলে কাগজ ছেপেছে জিগর। এছাড়াও ফ্রি মিষ্টিমুখ করাবে নাকি নবরূপে আবির্ভূত হবার জন্যে।

আমরা আবার গিয়ে হাজির হলাম। ভারত বাজারের চেকনাই দেখে চক্ষুস্থির। পুরো গুদাম ভেঙে শোরুম বানিয়েছে। ইন্টিরিয়র ডেকরেটর লাগিয়ে দোকান সাজিয়েছে। ঝকঝক করছে নতুন কাউন্টার। একদিকে ভিডিও কর্নার। একদিকে গানের ক্যাসেট সাজানো। অন্যদিকে পূজা ডিপার্টমেন্ট। স্টিল, পেতল আর তামার বাসনপত্র থাকে থাকে বসে আছে। ঠাকুরের সিংহাসনই কত সাইজের। দশকর্মের কতরকম বাক্স। গায়ে লেখা আছে "পূজা গুডস"। পবিত্র মালপত্রর সঙ্গে অজয় ধূপের বাক্স, কর্পূরের বাক্স, হরতুকীর প্যাকেট, গোটা সুপুরি—উপচারের অভাব নেই। বড় বড় রেফ্রিজারেটর ভর্তি করে তাজা শাকসবজি রাখা। সুপার মার্কেটের স্টাইলে ঠাণ্ডা ট্রে বানিয়েছে। জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে কত শত বরবটি। কাঠের বাক্সে রোঁয়া ওঠা কচি ঢেঁড়শের পাহাড়। কাঁচালঙ্কার গায়ে যেন মোমপালিশ চকচক করছে। নারকোল দিয়ে পিরামিড। ঝিঙের মন্দির—জিগর একেবারে

মনের সুখে ট্রেগুলো ভর্তি করেছে। ওদিকে আম দরবার। সাউথ অ্যামেরিকা আর জ্যামাইকার আম যেমন এসেছে, তেমনই ফ্লোরিডা থেকেও আমদানি কিছু কম হয়নি। বারো ডলারে বারোটা আম। আবার দেশের ফলওলাদের স্টাইলে ছোট্ট ছুরি দিয়ে ফালি কেটে কেটে আমের নমুনা চাখতে দিচ্ছে!

'সুইট মহল' বানিয়েছে আর একদিকে। নতুন কাচের শো কেসে দুনিয়ার মিষ্টি এনে ঢুকিয়েছে। রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গুলাব জামুন, শোনপাপড়ি, করাচি হালুয়া, শোহন হালুয়া, অমৃতি, জিলিপি, বরফি, প্যাঁড়া, বাদাম বরফি, লাড্ডু, বালুসাই, গজা, কালাকাঁদ, সব আনিয়েছে নিউইয়র্কের দুই হালুইকর কোম্পানি "শামিয়ানা" আর "শাহিন" থেকে। একটা তাজ গ্রুপের ব্যবসা। অন্যটা পাকিস্তানিদের। খুবই উৎকৃষ্ট মিষ্টি। জিগর অবশ্য মিষ্টি মুখ করাচ্ছে ভাঙা জিলিপি সহযোগে। "নমকিন" নামে সিঙাড়া, বড়া, কচুরি আর ধোকলার ছোট্ট ডিপার্টমেন্ট। এছাড়া চাল, ডাল, মুড়ি, চিড়ে, মশলাপাতি, বাদাম, পেস্তা, কিশমিশ সাজিয়ে দিয়ে ঘরের অর্ধেক জুড়ে 'গ্রোসারি ডিপার্টমেন্ট'। চাকা ওলা শপিং কার্ট ঠেলে ঠেলে বাজার করার ব্যবস্থা। এত বছর কোনও মশলার দোকানে এমন বন্দোবস্ত দেখিনি। এর ওপর রূপসজ্জার বিভাগ। চন্দন পাউডার, চন্দন তেল, লাক্স সাবান, নিম টুথপেস্ট, মাংকি ব্র্যান্ড দাঁতের মাজন, নিম তেল, আতর, চোখের কাজলের স্টিক, কপালের টিপের রকমারি পাতা। ডেটল আর গ্রাইপওয়াটারও এনেছে কোত্থেকে। মোট কথা দেশোয়ালিদের সেন্টিমেন্টের কথা বিবেচনা করে আমাদের ভুলে যাওয়া সব জিনিসই আমদানি করেছে জিগর। আর একটা পিরামিড বানিয়েছে পানপরাগ আর বাবা ১২০ জর্দার টিন সাজিয়ে। এক একটার দাম ছ'ডলার। দুটোরই বেশ চাহিদা লক্ষ করছি ইদানীং।

দোকানের বাহার তো দেখলাম। আর দেখলাম ফুটফুটে এক সেলস গার্লকে। মেয়েটার বয়স হবে বছর ষোলো। তুখোড় ইতালিয়ান মায়ের কন্যা। তার নাম মারিয়া। জিগর গর্ব ভরে আলাপ করাল—মিট মাই ডটার মারিয়া। নাউ শি উইল টেক কেয়ার অফ এভরিথিং।

বলে কি লোকটা? দুদিন আগে জিগরের বুড়ো বাবা বীরপ্রভু প্যাটেল ওর জন্যে গুজরাতি কনে খুঁজছিল। জিগরের নাকি বিয়েতে মন নেই। আর দেড়মাসের মধ্যে ষোলো বছরের ইতালিয়ান মেয়ের বাবা হয়ে বসে তার ওপর দোকানের ভার দিয়ে দিচ্ছে। জিগর আমাদের বেশিক্ষণ আঁধারে রাখতে

চাইল না। শুনলাম আগের বার এসে ওর গুদামঘরের সামনে যে মহিলাকে দেখেছিলাম, প্রেমপর্ব শেষ করে তাকেই বিয়ে করে ফেলেছে জিগর। বউ-এর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। আগের পক্ষের দুই মেয়ে। মারিয়া হচ্ছে ছোটজন। মারিয়ার দিদি আপাতত পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। মারিয়াই এখন থেকে স্কুলের পরে দোকানে এসে বসবে। তার ওপর জিগরের খুব ভরসা। অল্পদিনেই বুঝেছে, ও মেয়ের ভীষণ নাকি কর্মক্ষমতা। দেখলাম বটে এরই মধ্যে হালচাল বুঝে নেবার চেষ্টা করছে। দেখা যাক, ছোট্ট মেমসাহেব এবার কেমন করে গুজরাতির দোকান সামলায়? এবার থেকে মারিয়াকে পাল্লা টানতে হবে ফোর্থ ডায়মেনশনের অরবিন্দ শার সঙ্গে। আমরা সেই বুঝে দোকান বেছে নেব।

মারিয়া দিব্যি পাল্লা টানতে থাকল। ক্রমশ ভারত বাজারের ক্রেতা বাড়তে শুরু করল। আমরা সন্ধেবেলা গিয়ে দেখি মারিয়া কাউন্টারে বসে বসে হাইস্কুলের হোমওয়ার্ক করছে। যদি জিজ্ঞেস করি—মারিয়া, নতুন রুটি এসে গেছে? সে 'ক্যালকুলাস' রেখে উঠে পড়ে। ব্যস্ত পায়ে ফ্রিজারের দিকে যেতে যেতে বলে—একেবারে তাজা রুটি এসেছে। কী নেবে? চাপাটি? কুলচা না ঝাল পরাঠা?

সব স্পেসিফিকেশন তার মুখস্থ। চাপাটিরও আবার লাল আটা, হলদে আটা, সাদা আটার রকমফের থাকে। স্থানীয় গুজরাতি মহিলারা বাড়িতে রুটি বানিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগে সিল করে দেয়। আমরা বাড়িতে এনে একবার সেঁকে নিলেই ফরফর করে ফুলে ওঠে। তা সেইসব রুটি মারিয়া আলাদা আলাদা করে তাক থেকে নামিয়ে দেয়।

একবার উমা যোশি গিয়েছিল জিরে কিনতে। নতুন সাজানো দোকানে ঠিক কোন দিকে ওসব প্যাকেট রেখেছে, খুঁজে দেখছিল। মারিয়ার ততদিনে ছোট্ট একটা বোন হয়েছে। জিগরের প্রথম কন্যারত্ন। তাকে কোলে নিয়ে মারিয়া দোকান সামলাচ্ছে সেদিন। উমা যোশিকে জিজ্ঞেস করল--হোয়াট আর ইউ লুকিং ফর? উমা বলল—টু প্যাকস অফ হোল কিউমিন। মারিয়া—হোয়াইট অর ব্ল্যাক? আই নো, ইউ নিড টু কাইন্ডস অফ জিরা, রাইট?

উমা মারিয়ার সাদা জিরে, কালো জিরের সম্যক জ্ঞান উপলব্ধি করে মুগ্ধ।

সেবার আমাদের 'কল্লোল' ক্লাবের বিরাট অনুষ্ঠান। আমজাদ আলি খানের সরোদের প্রোগ্রাম হবে। পাবলিসিটির জন্যে আর টিকিট বিক্রির আশায় বিশাল তিনটে পোস্টার নিয়ে ভারত বাজারে চলে গেলাম। মারিয়াকে বেশ কিছু টিকিট গছিয়ে দিলাম ফ্লায়ার সুদ্ধু, যাতে দোকানে খদ্দের এলেই ফ্লায়ার হাতে পায়। কিন্তু মারিয়া আমজাদ আলির রঙিন ছবিসুদ্ধু পোস্টার টাঙাতে দেবে না। খালি বলে অমিতাভ বচ্চনের মস্ত পোস্টার সরিয়ে অন্য কারও ছবি টাঙালে দোকানের শোভা নষ্ট হয়ে যাবে। তার কিছুদিন আগে নিউ জার্সির জায়ান্ট স্টেডিয়ামে অমিতাভ এসেছিলেন মস্ত দল নিয়ে। হাতির পিঠে চড়ে বসে 'ঝুম্মা চুমা দে দে চুমা' করতে করতে স্টেজে ঢুকেছেন। সেই প্রোগ্রামেরই পুরনো পোস্টার নিয়ে মারিয়ার সে কী আদিখ্যেতা। ও নাকি অমিতাভের বিরাট ফ্যান। বিনে পয়সায় অনবরত হাম দেখে যাচ্ছে দোকানের ভি সি আর-এ। আমি যত বলছি ওই প্রোগ্রামটা তো হয়ে গেছে কবে। পুরনো পোস্টার ঝুলিয়ে কী লাভ? নতুন প্রোগ্রামের নতুন পোস্টার টাঙিয়ে দিতে হয়। না হলে আমজাদ আলির পাবলিসিটি হবে কী করে?

মারিয়া হেসে বলে—দেন ইউ হ্যাঙ্গ ইট অন দ্য আদার সাইড অফ দ্য স্টোর। আই ডোন্ট লাইক 'গাবার'। আবার মজা দেখা হাসি।

আমার তখনই খটকা লেগেছে। 'গাবার' আবার কে? আমার হাতের পোস্টারগুলো তো তখনও গোটানো অবস্থাতেই রয়েছে। ছবি না দেখেই মারিয়া হাঁ হাঁ করে তেড়ে উঠছে কেন? একটু পরেই বুঝলাম ও কী বলতে চাইছে।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার কি ধারণা অমিতাভ বচ্চনের চেয়ে হ্যান্ডসাম আর কেউ নেই?

—অ্যামজাড ইজ নট গুড লুকিং অ্যাট অল...।

আমি গোটানো পোস্টার খুলে মারিয়ার নাকের সামনে দুলিয়ে দিলাম। ছবিতে স্বপ্নালু চোখে আমজাদ আলি খান সরোদ বাজাচ্ছেন। মারিয়া হতভম্ব এবং ক্রমশ ক্রমশ দ্রবীভূত—এ কোন আর্টিস্ট? আমি তো ভাবছি তুমি 'গাবারের' ছবি টাঙাতে এসেছ...'।

তখন অভিনেতা আমজাদ খান বেঁচে। 'গাবারের' ছবি টাঙালেও যে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না আর 'শোলে'তে 'গাবার' না থাকলে যে ওর অমিতাভের আভা ম্লান হয়ে যেত—এসব লেকচার না দিয়ে সোজাসুজি

তিনটে পোস্টার দোকানের তিন জায়গায় দুলিয়ে দিতে বললাম। মারিয়া সেই শুঁটকো কর্মচারীকে স্টেপ টুলের ওপর চড়িয়ে পোস্টারগুলো ঝুলিয়ে দিল। বিমোহিত নয়নে নতুন আমজাদের ছবি দেখতে লাগল।

এরপর মারিয়া জিগরের সঙ্গে বরোদা বেড়াতে গেল। তার মাও গিয়েছিল। ফিরে এল যখন, রোগা দড়ি চেহারা। খুব নাকি পেট খারাপে ভুগেছিল। হাত ভর্তি কাচের চুড়ি। মারিয়ার ভাষায় 'আই গট লটস অফ গিফটস অ্যান্ড লং টার্ম ডায়ারিয়া'...।

সে হাইস্কুল পাস করে আর কলেজে গেল না। পড়াশোনার ঝোঁক তেমন আছে বলে মনে হয় না। এখন দোকানের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসেছে। মাঝে মাঝে ভাবি সর্বক্ষণ একটা সুন্দরী মেয়ে একা একা অত বড় দোকানে বসে থাকে। পাহারাদার বলতে ওই শুঁটকো লোকটা। দোকানে ডাকাতি হতে কতক্ষণ? কত ভারতীয় দোকানেই হোল্ড আপের ঘটনা ঘটে গেছে। তার ওপর ওই পাড়াটাও একেবারে নির্জন। জিগরকে তো বিশেষ দেখিও না। আরও নতুন কী সব ব্যবসার ধান্দায় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। তবু একদিন দেখা হতে কথাটা বলেছিলাম। জিগর বলল—সব ব্যবস্থা করেছি। মারিয়ার কাউন্টারের নীচে অ্যালার্মের বোতাম বসিয়েছি। বিপদ বুঝলেই টিপে দেবে। দোকানের দরজাতেও লক বসাচ্ছি। এবার থেকে লোক দেখে 'ডোর ওপনার' ব্যবহার করবে। তাছাড়া আমার বউ, নয়তো আমি, নয়তো বড় মেয়েটা, ঘুরে ফিরে সবাই দোকানে আসি। মারিয়ার রূপান্তর প্রসঙ্গে আমরা বন্ধুরা প্রায়ই আলোচনা করি। বিসওয়ালের মেয়ে খবর বার করেছে—মারিয়ার আমেরিকান বয়ফ্রেন্ড আছে। দোকানের বাইরে তার হাবভাবই অন্যরকম। নতুন বাবার সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্যে গরিব মেয়েটা দোকানের কাজকর্ম শিখে নিয়েছে। 'ভারতের' সঙ্গে মারিয়ার শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্ক। কনভিনিয়েন্সের জন্যে মেথি, মৌরি চিনতে শিখেছে। জিগর ওকে মাইনে দেয়। নিরাপত্তার ব্যাপার তো আছেই। সাময়িক মানিয়ে নিয়েছে হয়তো এসব কারণেই। মশলার আড়তের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছে।

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। ওর দোকানে ঢুকতে না ঢুকতেই ভিজে গেলাম। বর্ষার নিঃঝুম দুপুরে মারিয়া বসে বসে কাগজ পড়ছিল। আমাকে মাথা মুখ মোছার জন্যে টাওয়েল দিল। বললাম—মারিয়া, একটা ছোট্ট ঘন্টা দরকার। দু'প্যাকেট ধূপ, কর্পূর আর পান।

মারিয়া স্টেনলেস স্টিলের ঘন্টা, পেতলের ঘন্টা দুইই নিয়ে এল। কর্পূর এনে দিল। ধূপ আমি নিজেই বেছে নিলাম। কিন্তু পান পেলাম না। মারিয়া বলল—কবে তোমার পান দরকার? বাবাকে দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে আনিয়ে দেব।

—আবার তাহলে এত দূর আসতে হবে। দু'চারটে পানও নেই আজ? দ্যাখো না ফ্রিজারে যদি পড়ে থাকে?

—বাট, আই থিংক, ইউ নিড অ্যাট লিস্ট ফাইভ টু সেভেন পানস ফর ইওর পূজা। হাউ অ্যাবাউট সাম ফ্রেশ বারফি? ড্যাড উইল ব্রিং এভরিথিং অন ফ্রাইডে। হোয়েন ইজ ইওর পূজা?

এই ইতালিয়ান মেয়ে জেনে বসে আছে আমাদের পূজোতে গোটা পাঁচ/সাত পান পাতা লাগে। টাটকা মিষ্টি লাগে। অথচ আমি ওকে একবারও বলিনি কেন ধূপ, কর্পূর আর ঘন্টা কিনেছি। অনায়াসে ও আমাকে আধ পচা দু'চারটে বাসি পানপাতা গছিয়ে দিতে পারত। পুরনো মিষ্টি চালিয়ে দিতে পারত। আন্দাজে যে "পূজা" হবে চিন্তা করে নতুন জিনিস আনিয়ে দিতে চাইছে—সে নেহাতই চৌকস ব্যবসাদার হয়ে উঠেছে বলে কি? আমার বিশ্বাস হয় না।

মধ্যরাতের কবিতা

কবিতা লিখে অমরত্বের বাসনার চেয়ে জরুরি হচ্ছে এ মুহূর্তে পাঠক খুঁজে পাওয়া। এ যুগের একদল কবি সেরকমই ঘোষণা করেছেন। এঁরা নবীন কবি। এঁদের মনোভাব হচ্ছে শুভস্য শীঘ্রম। আজ রাতে বুকে আগুন জ্বেলে একটা কবিতা লিখলাম। ছ'মাস কি এক বছর বাদে তা ছাপা হল কি হল না। ক'জনের চোখে পড়ল তাও টের পেলাম না। এই প্রতীক্ষা আর সহ্য হয় না। তারচেয়ে হাতে হাতে ফল পেতে চাই। ভালো, মন্দ যেমনই লিখি এখনই তা পরখ হয়ে যাক। একটানা খাতায় বন্দি থাকার জন্যে নয়, মানুষকে শোনানোর জন্যেই কবিতার জন্ম।

তো, আমেরিকার এইসব নতুন কবিদের জন্যে মধ্যরাতে আসর বসছে। টিভির একটি চ্যানেলে ইদানীং প্রতি শুক্রবার রাতে তাঁরা দু'চার জন করে আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। আসরের নাম 'রাসেল সাইমনস প্রেজেন্টস ডেফ পোয়েট্রি।' প্রযোজকের নামে অনুষ্ঠান হলেও পরিচালনার জন্যে প্রতি সপ্তাহে একজন প্রতিষ্ঠিত কবি উপস্থিত থাকেন।

কবিরা বিশ্বাস করেন তাঁদের কবিতা কোনও একমুখী চিন্তা বা সীমিত ধারণার বাহন নয়। কবিতা লেখার একটি উদ্দেশ্য হল সংযোগ স্থাপন। রচনায় সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন সত্ত্বেও লেখার গুণে তা কবিতা হয়ে উঠবে।

শুক্রবার রাত বারোটায় কবিতার আসর শুরু হয়। র‍্যাপ কবি মোস ডেফ একদিন আসর পরিচালনা করলেন। র‍্যাপ ঘেঁষা কবিতার আসর হলেও এখানে তিনপর্বে অনুষ্ঠান ভাগ করা থাকে। সূচনায় কোনও প্রতিষ্ঠিত কবি

কিছু বলেন। কোনও বিখ্যাত কবির রচনার নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন। উইলিয়াম শেকসপিয়ারের কবিতাই হয়তো পড়ে শোনালেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও অবদান নিয়ে আলোচনা করলেন।

দ্বিতীয় পর্বে থাকে আমন্ত্রিত নবীন কবিদের নতুন রচনা পাঠ। শেষপর্বে থাকে সমালোচনা ও বিশ্লেষণ। প্রতিষ্ঠিত কবি ও কয়েকজন বিদগ্ধ অতিথি তাতে যোগ দেন। কবিতা ভালোবাসেন এমন অভিনেতা, নাট্যকার, চিত্রকর, সঙ্গীত শিল্পী, অধ্যাপক ইত্যাদিদের মধ্যে থেকেই সাধারণত এক একজনকে ওই বিশ্লেষণ পর্বে যোগ দিতে ডাকা হয়।

আমেরিকার যুব শ্রোতাদের কাছে নবীন কবিতার আসর বেশ মনোগ্রাহী হয়ে উঠছে। র‍্যাপ-এর থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও কোনও কোনও কবিতার সঙ্গে বাজনা থাকে। সমসাময়িক জীবন যাত্রার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে নবীন কবিরা যা লিখছেন, তা যে নিতান্ত তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রকাশ নয়, আসর পরিচালকরা সে সবই ব্যাখ্যা করছেন। লোকসংস্কৃতিতে কবিতার ভাষার প্রভাব এবং কবিতা নিজেই যে এক জোরালো সামাজিক শক্তি—ওই আসরের নবীন কবিরা রচনার মাধ্যমে সেই ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা কিন্তু মনে করেন না যে, শুধু যুব শ্রোতাদের জন্যেই এই আসর। জীবনমুখী কাব্য পাঠের আসরে তাঁরা সব বয়সের মানুষকেই শ্রোতা হিসেবেই পেতে চান।

সেদিন এক নতুন কবি স্টিভ কোলম্যান পাঠ করলেন—

"আই ওয়ান্ট টু হিয়ার এ লাভ পোয়েম
এ স্যাড পোয়েম
অ্যান্ড আই হেট মাই ড্যাড পোয়েম"

.....

আই ওয়ান্ট টু ফলো দ্য ফুট স্টেপস্
অফ চে
অ্যান্ড হিয়ার দ্য ট্রুথ্
অ্যাবাউট দ্য ডে
দ্য সি. আই. এ.
কিলড লুমুমবা।"

শুক্রবারের নবীন কবিদের আসরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রচারের

দিকটির ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিখ্যাত কবিরা অপরিচিত কবির রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। শুধু কবি নন, অন্যান্য সেলিব্রিটিরাও তাতে যোগ দেন।

কয়েকদিন আগে অভিনেতা বেনজামিন ব্র্যাট পাঠ করলেন দক্ষিণ আমেরিকান কবি ও নাট্যকার মিগেল পিনেরোর রচনা। পিনেরো মাত্র ৪২ বছর বয়সে লিভারের অসুখে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে সম্প্রতি 'পিনেরো' নামে একটি ছবি হয়েছে। বেনজামিন ব্র্যাট ওই চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রাসেল সাইমনসের প্রোগ্রামে ব্র্যাট-এর উপস্থিতি একদিকে যেমন প্রয়াত কবির জীবন সম্পর্কিত ছবিটির প্রচারে সাহায্য করল, অন্যদিকে ব্র্যাট এর কবিতাপাঠ শ্রোতাদের কাছেও বিশেষ উপভোগ্য হল। তিনি পড়লেন মিগেল পিনেরোর 'লোয়ার ইস্ট সাইড কবিতা। নিউইয়র্ক শহরের লোয়ার ইস্ট সাইড অঞ্চলের অনুষঙ্গ নিয়ে কবি যেখানে লিখেছেন—'আই ওয়ান্ট টু বি নিয়র দ্য স্ট্যাবিং, শ্যুটিং, গ্যাম্বলিং, ফাইটিং অ্যান্ড আন্‌ন্যাচার‍্যাল ডাইং....'

অথবা যেখানে তিনি শেষ আবেদন জানাচ্ছেন—

'স্ক্যাটার মাই অ্যাশেস থ্রু দ্য লোয়ার ইস্ট সাইড' — এই অংশে মিগেল পিনেরার বিদ্রোহী যৌবন ও কবিসত্তার আবেদন অভিনেতা বেনজামিন ব্র্যাটের কবিতা পাঠের গুণে শ্রোতাদের অভিভূত করেছিল।

একদিন আসরে এলেন প্রতিষ্ঠিত কবি নিকি জিওভানি। তিনি অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। একদিন এলেন মহিলা কবি সোনিয়া স্যানচেজ। তিনি পড়লেন একটি কবিতা, যেখানে ড্রাগের নেশার খরচ জোগাড় করার তাগিদে একটি লোক তার সাত বছরের মেয়ের কৌমার্য বিক্রি করতে চলেছে। সোনিয়া স্যানচেজ তাঁর দীর্ঘ কবিতার কয়েকটি চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে ওই অমানবিক ঘটনা বিবৃত করেছেন। একটি অংশে গানের সুর ব্যবহার করেছেন।

এবার নতুন কবিদের কথায় আসি। এঁদের কারও কারও কবিতা ছাপা হয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর পাঠক সমাজে পৌঁছয়নি। টিভির মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে ভেবে আয়োজকরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন। "ডেফ" কথাটি কালো গীতিকার ও কবিরা ব্যবহার করেন সজীব, স্নিগ্ধ, চিরনবীন ইত্যাদি বোঝাতে। অর্থাৎ ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে যা লেখা হয়। র‍্যাপ কবি মোজ ডেফ যেদিন

ওই আসরে এলেন, তিনি শেকসপিয়রের কবিতা পড়ার আগে বললেন—'উইলিয়াম শেকসপিয়র, ডেফ পোয়েট।'

অর্থাৎ শেকসপিয়রকেও এঁরা চিরনবীন বলে দলে নিয়েছেন।

নতুন কবিদের মধ্যে কালো, ল্যাটিনো ও এশিয়ান কবিদের তুলনায় সাদা আমেরিকান কবিদের সংখ্যা কিছু বেশি। কালো, ল্যাটিনো ও এশিয়ান কবিদের মধ্যে কারও কারও রচনায় সাম্প্রদায়িক বৈষম্যজনিত ক্ষোভ ও অভিমান বেশ স্পষ্ট। দুই এশিয়ান মহিলা কবি নিজেদের পরিচয় দেন 'ইয়েলো রেজ' বলে। পীতবর্ণের কবিদ্বয়ের ক্ষুব্ধ মনোভাবের কারণ হচ্ছে—আমেরিকায় এশিয়ানদের এখনও মার্কামারা ছাঁচে ঢালাই করা হয়। সেই সাম্প্রদায়িক চিহ্নিত করণের মধ্যে যথার্থ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ নেই। কবিতা পাঠের আসরে 'ইয়েলো রেজ'রা অংশত প্রতিবাদমূলক রচনাই পাঠ করলেন।

এক কালো কবি নিজের পরিচয় দিলেন 'ব্ল্যাক আইস' নামে। মূল সমাজের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের শীতল কঠিন সম্পর্কের আভাস দিলেন তাঁর দুটি, একটি কবিতায়। রচনার মধ্যে সমাজবিরোধী কালোদের নিজস্ব ভাষা ও শব্দের ব্যবহার এত বেশি যে, তিনি যেন শুধু নিজের সম্প্রদায়ের জন্যেই কবিতা লিখছেন। আঞ্চলিকতা আর সাম্প্রদায়িকতা মিলেমিশে গিয়ে কালো কবির কবিতা বলেই তা চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। ওইসব শব্দ শুনতে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের পক্ষে কবিতার রসগ্রহণে বাধা পড়েছে।

কিছুদিন আগে এক শুক্রবার রাতে এলেন নতুন মহিলা কবি সুহেইর হামাদ। প্যালেসটিনিয় আমেরিকান সুহেইর থাকেন নিউইয়র্কে ব্রুকলিনে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হওয়ার পর তিনি 'ফার্স্ট রাইটিং সিনস' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি পড়ে শোনালেন। আরব আমেরিকানদের ওপরে এদেশের মানুষের রাগ, সন্দেহ যখন প্রবলভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তখন মার্কিন নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কবিকে সেই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। অথচ নিউইয়র্ক তাঁর নিজের শহর। ব্রুকলিন থেকে টুইন টাওয়ার দেখা যেত। ১১ সেপ্টেম্বরে সুহেইরের চোখের সামনে দুটো টাওয়ার ভেঙে পড়ল। সেই দৃশ্যের বর্ণনা আছে ওই কবিতায়। 'আই ক্রায়েড হোয়েন আই সও দোস বিল্ডিংস কোল্যাপ্স অন দেমসেলভস লাইক এ ব্রোকন হার্ট...'

কবিতার পরবর্তী অংশে আছে পথেঘাটে অপমানিত আরব মহিলার সোচ্চার প্রতিবাদ—

'ওয়ান মোর পার্সন
অ্যাসকস মি
ইফ আই নিউ দ্য হাইজ্যাকার্স...

এবং শেষ অংশে সুহেইর হামাদ লিখছেন বড় এক উৎকণ্ঠার কথা। তাঁকে যেন এক আমেরিকান বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করছেন।

—মেয়ে, তোমার এত ভয় কিসের?

উত্তরে কবি লিখছেন—

মাই ব্রাদার ইজ ইন দ্য নেভি আই সেড,
অ্যান্ড উই আর অ্যারাবস।

তখন বৃদ্ধা বলছেন—ওয়াও, ইউ গট ডাবল ট্রাবল।

সুহেইর হামাদের কবিতার সেই আরব মেয়েটি একদিকে তার ভাই-এর জন্যে চিন্তিত। মার্কিন নেভিতে কাজ করে তার ভাই। আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে আফগানিস্তানের লড়াইয়ে চলে গেছে। অথচ জন্মসূত্রে প্যালেসটিনিয়ান বলে আমেরিকায় আজ তারা সন্দেহ আর ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছে।

এই উভয় সঙ্কট উপলব্ধি করেই সেই বৃদ্ধা তখন মেয়েটিকে বলছেন—

আহা। তবে তো তোমার দ্বিগুণ বিপদ,
দ্বিগুণ দুঃখ।

সুহেইর হামাদের কবিতা শ্রোতা আর সমালোচকদের বিচারে নতুন কবিদের সাম্প্রতিক রচনার মধ্যে প্রথম সারির মর্যাদা পেয়েছে।

মধ্যরাতের কবিতার আসরের প্রযোজকরা এর আগে ডেফ কমেডি জ্যাম নামে একটি সাপ্তাহিক হাস্য কৌতুকের অনুষ্ঠান চালু করেছিলেন। আমেরিকার 'স্ট্যান্ড আপ কমেডি'র ধারায় ওই 'ডেফ কমেডি জ্যাম সেশন' কৌতুক রস সমৃদ্ধ এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কালো সমাজের নিজস্ব রঙ্গ, রসিকতা, হাস্য পরিহাস নিয়ে ডেফ কমেডি ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 'রাসেল সাইমনস প্রেজেন্টস ডেফ পোয়েট্রির' প্রযোজক, পরিচালকদের ধারণা শুক্রবারের কবিতার আসরও ক্রমশ আরও বেশি দর্শক, শ্রোতাদের আকর্ষণ করবে।'

রাত জেগে কবিতা লেখে, এমন লোক আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু রাত জেগে নতুন কবিদের কবিতা শোনার লোক তেমন পাওয়া যায় না।

তবে শ্রোতা হিসেবে আপনাকে যদি রাত বিরেতে বাইরে যেতে না হয়, ঘরে বসেই টিভিতে কাব্যপাঠ দেখতে শুনতে পান, তবে তো ভালোই লাগবে।

ধরুন টিভিতে প্রতি শুক্রবার রাত বারোটা থেকে একটা, দেড়টা অবধি আসর বসল। কিংবা মাসে দু'বারও হতে পারে। এই নবীন কবি সম্মেলনে প্রতিযোগিতা বা পুরস্কারের ব্যাপার নেই। মূল উদ্দেশ্য হল নতুন কবিদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করানো। আসর পরিচালনার জন্যে প্রতিবার একজন প্রখ্যাত কবি আসবেন। আপনাকে জাগিয়ে রাখার জন্যে তিনিই পড়বেন শেষের কবিতা। কবিতা পাঠের জন্যে নবীন কবিদের কিছু সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হবে।

কথা হচ্ছে, এ অনুষ্ঠান স্পনসর করবে কারা? সরকার না বেসরকার? রাজ্যে আছেন আমাদের বাংলা ডিপার্টমেন্টের বুদ্ধদেব। কবি সুকান্তর কবি আত্মীয়। মধ্যরাতে নবীন কবিদের বাংলা কবিতা পড়ার জন্যে সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে সাহায্য আশা করা যায় কি?

নয়তো আছেন সম্পাদকরা, যাঁদের কাগজে নিয়মিত কবিতা ছাপা হয়, তাঁরাই নতুন কবিদের উৎসাহ দিতে টিভিতে কবিতার আসর স্পনসর করতে পারেন। প্রাইম টাইম ভাড়া নেওয়ার ব্যাপার নেই। নিশুতি রাতের আসরের খরচ যে কোনও বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকেও তো পাওয়া যেতে পারে। নবীন কবিদের সঙ্গে আপনাদের সংযোগ সৃষ্টির কাজে প্রতিষ্ঠিত কবিদের সহযোগিতাও নিশ্চয়ই থাকবে।

শ্রোতা হিসেবে আপনার কাজ শুধু জেগে বসে থাকা। কবি হিসেবে একমাত্র কাজ নবনব কাব্য প্রসব। মধ্যরাতের আসরে কোন শুক্রবার ডাক পড়বে কেউ তা জানে না।

চোরের হাসি

এই সংখ্যায় ভূতের হাসি দিয়ে বেশ একটা ছমছমে গল্প শুরু করা যেত। কিন্তু প্রথমত গল্প লিখতে বসিনি। দ্বিতীয়ত আমার দিকে চেয়ে ভুবনমোহন হাসি যে হেসেছিল, সে রীতিমত রক্তমাংসের সাহেব এবং পাকা চোর।

নিউইয়র্কে যে পাড়ায় থাকতাম, বাড়ি খুঁজে দেবার দালালদের ভাষায় 'এক্সক্লুসিভ রেসিডেনশিয়াল নেবারহুড'। পাড়াটা বেশ নির্জন আর ইহুদি প্রধান এলাকার মধ্যে ছিল। ভারতীয় বলতে আমাদের বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকতেন ইউনাইটেড নেশনসের মাদ্রাজি পরিবার। প্রায়ই ঝলমলে শাড়ি পরে আর নাকে কানে হিরের ঝিলিক দিয়ে দোতলায় উঠে যেতেন অভিনেত্রী পদ্মিনী রামচন্দ্রন। তিনি বিয়ের পর থেকে আমেরিকার বাসিন্দা। আরও সব সালংকারা দক্ষিণী মহিলাদের যখন তখন আসা যাওয়া দেখে আমি ধরে নিয়েছিলাম, এ পাড়ায় চুরি ছিনতাইয়ের ভয় টয় নেই। নিউইয়র্ক শহর সম্পর্কে আতঙ্ক যতই থাক, কুইনস অঞ্চলে পথঘাট নিরাপদই ছিল সে সময়। আর এই বিশ্বাসেই ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্টে গয়নাগাটি না রেখে বাড়িতেই শোবার ঘরের আনাচে কানাচে রেখে দিতাম। লকার খোলার ব্যাপারেও সেরকম দরকার মনে করিনি।

তখন গয়না পরার সুযোগ বিশেষ ছিলও না। কিন্তু ক্রমশ বাঙালিদের উৎসাহে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্গাপুজো শুরু হল। তারপর কুইনসের ফ্লাশিং অঞ্চলে সরস্বতী পুজো। আমাদের শৈলেশ চৌধুরি আর মণিদীপা দত্ত আবিষ্কার করল তারা নির্ঘাৎ প্রেমে পড়েছে। অতএব জনতার দাবিতে ঘটা করে একখানা "এনগেজমেন্ট" পার্টিও দিয়ে ফেলল। এরকম সব দেশজ

অনুষ্ঠানে আমরা গয়না পরব না, তা তো সম্ভব নয়। ফলে উইক এন্ডে সোনা দানা গায়ে উঠতে লাগল এবং আমাদের অজান্তে অন্তরাল থেকে নিশিকুটুম্বরা লক্ষ করতে শুরু করল। "হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন" বুঝে মহা উৎসাহে তাদের অভিযান আরম্ভ হল।

আমরা বছরখানেক দিব্যি কাটিয়ে ছিলাম সে বাড়িতে। সামান্য তালাচাবি এঁটে দিয়ে উইক এন্ডে এধার ওধার বেরিয়ে পড়তাম।

বছরখানেক বাদে মাদ্রাজিরা বদলি হয়ে চলে গেল। দোতলা ফাঁকাই থাকে। ইহুদি বাড়িওলা কাকে যে ভাড়া দেবে বুঝতে পারছিলাম না। আমাদেরও একটু কৌতূহল ছিল। মাথার ওপর উটকো লোক না এলেই বাঁচি। পরপর দু-তিন প্রস্থ কালো পরিবারকে ছুতোনাতায় বাড়ি ভাড়া দিল না দেখলাম। তারপর নিজেই এসে জানিয়ে গেল সপ্তাহ দুই পর নতুন ভাড়াটে আসবে এবং তারা ইতালিয়ান পরিবার।

দিনটা ছিল সম্ভবত মঙ্গলবার। বেশ গরম পড়েছিল সকাল থেকে। বিকেলের দিকেও গুমোটভাব। একতলার ফ্ল্যাট। এমনিতে বিশেষ গরম হত না। পেছনে ছোট্ট বাগান ছিল। সেদিকের কাচের দরজা জানলা খুলে রেখেছিলাম। সন্ধে থেকে বাগানেই বসেছিলাম। এক বন্ধু এসেছিল সপরিবারে। খাওয়া দাওয়ার পর আড্ডা চলছিল। একটু কফি করব ভেবে উঠে ভেতরে গেলাম। রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজ খুলে দুধের বোতল নিতে গিয়ে দেখি দুধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কফি করার পর আজ রাত্রেই দুধ কেনা দরকার। এসব ভাবতে ভাবতে কাচের জানলার ওপারে রাস্তা ছিল। দেখলাম ভারী প্রিয়দর্শন এক যুবক আমাকে লক্ষ করছে এবং মুখে মৃদু মৃদু হাসি। আমি অনায়াসে ভেবে নিলাম নিশ্চয়ই ওপর তলার নতুন ভাড়াটে। কারণ তাদের কিছু কিছু মালপত্র ওপরে তোলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম গত দু-তিন দিন ধরে। তবে চোখে দেখিনি কাউকে। তা এরকম পরিচিত হাসি দিচ্ছে যখন, এমন ইতালিয়ান হিরোর মতো চেহারা, ভাড়াটে ছাড়া আর কে হবে? আমি হাসলাম তো বটেই। আবার কাচের জানলার ভেতর দিয়ে একটু হাতও নেড়ে দিলাম।

কফি পর্ব শেষ হবার পর বন্ধুদের গাড়ি করে নামাতে যেতে হল। কারণ ওদের গাড়ি ছিল না এবং ছোট বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছিল দেখে সাবওয়ে চড়ে যেতে বারণ করলাম। যাওয়াতে আধঘন্টার বেশি সময় গেল। সুপার

বাজারে দুধ কিনতে আরও দশ-পনেরো মিনিট। যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। বাইরে থেকে অত খেয়াল করিনি। কিন্তু দরজায় চাবি ঘোরাতে দেখি দরজা আপনিই খুলে গেল। অথচ নিজে হাতে লক করে গিয়েছিলাম। ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম পেছনের বাগানের দরজা হাট করে খোলা। সারা বাড়ি ঘুটঘুটে অন্ধকার আর সিগারেটের গন্ধ পেলাম শোবার ঘরে ঢুকতেই। মুহূর্তের মধ্যে যেন ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হবার উপক্রম। আমার স্বামী তখনও রাস্তায় গাড়ির পার্কিং খুঁজছেন। মেয়েকে কোলে নিয়ে অন্ধকারে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পেছনের বাগানে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ পেয়ে আমিও মরিয়া হয়ে সামনের দরজার দিকে ছুটলাম। দরজার বাইরে পৌঁছতেই স্বামীর সঙ্গে প্রায় ধাক্কাধাক্কি। কোনও মতে বলতে পারলাম—"চোর, বাড়িতে চোর এসেছিল...।"

পুলিশে ফোন করার পর দেখলাম সারা বাড়ির বড় জিনিস কিছুই নেয়নি। অথবা নেবার সময় পায়নি। কিন্তু কী অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ওইটুকু সময়ের মধ্যে সমস্ত সোনার গহনা এবং রুপোর জিনিসপত্র বেছে নিয়ে গেছে। পুলিশের দল এসে ঝোপেঝাড়ে লাঠি পিঠিয়ে কর্তব্য কর্ম সমাধা করে গেল। তারপর একজন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "সুন্দরবাবু"র কায়দায় 'হুম' বলে কিছুক্ষণ ভাবতে বসল। বলল—"বালিশের ওয়ার একটা নিয়েছে নিশ্চয়ই?"

একেবারে ডাহা সত্যি! দেখলাম একটা বালিশ থেকে ফুল ফুল ছাপ দেওয়া ওয়াড় খুলে নিয়ে পালিয়েছে। তখনও রহস্য বুঝিনি। শেষে সুন্দরবাবুই খোলসা করে বলল—"এ হচ্ছে টিপিক্যাল জাংকি (ড্রাগ অ্যাডিক্ট) ছোঁড়াদের কাজ। যখন নেশার পয়সা জোটে না, তখন ঠিক কোনও বাড়ির জানলা ভেঙে ঢুকবে। বড় জিনিস নেবার ঝামেলায় যাবে কেন? চোরাই মাল বেচাকেনা করতেও তো সময় লাগবে। তার চেয়ে গয়নাগাটি আর কাঁচা ডলার ঝটপট তুলে নিয়ে একটা বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে পুরে দৌড় লাগাবে। বিক্রি করতে ক'মিনিট? পেল্লায় টিভি ঘাড়ে করে দৌড় মারা যায় নাকি এত অল্প সময়ে? লোকটা তোমাদের আগেই লক্ষ করেছিল। বাড়িতে গয়না পাবে জেনেই এইটুকু সময়ের মধ্যে ড্রয়ার সাফ করে গেল।"

আমার স্বামী তখন পুলিশের কথা অনুযায়ী খোয়া যাওয়া জিনিসের ফর্দ বানাতে বসেছেন। ওই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তারপর পুলিশের রিপোর্ট

নিয়ে ইনসিওরেন্স কোম্পানির শরণাপন্ন হওয়া। তবে গয়না বাড়িতে রাখাটাই ইনসিওরেন্স কোম্পানির মতে বেজায় দোষ। নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেবে হয়তো।

সুন্দরবাবু ছড়ি ঘোরাচ্ছে আর চটপট ফর্দ বানাতে বলছে। সে এক ঝকমারি ব্যাপার। দিশি গয়নার ইংরেজি নাম বানানো অত সহজ নাকি? সিঁথিকে টায়রা বলে চালানো গেল। চুড়িকে "ব্যাঙ্গল" সেও তো সোজা ট্র্যানস্লেশন। কিন্তু অনবরত হা-হুতাশের ফাঁকে ফাঁকে চুড়, বাউটি, কানপাশা, সীতাহার এসব ট্র্যানস্লেট করা যায়? বাচ্চা মেয়েটার মুখেভাতের অর্ধেক গয়না চলে গেল। মটরমালার ইংরেজি 'বল চেইন' যদি বা লিখে দিলাম, হাতের ছোট্ট ছোট্ট রুলিগুলোর কথা মনেই পড়ল না। পায়ের মলটলও চেপে গেলাম বরের ধমকে।

সুন্দরবাবু ফর্দ নিয়ে ভ্যানে উঠে চলে যাবার পর মনে পড়ল—আমার সাধের হিরের আংটিটার কথা বেমালুম লিখতে ভুলে গেছি। স্বামী আহত মুখে জানতে চাইলেন—"ফুলশয্যার আংটিটা পরতে না-ই বা কেন?" আমি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা খেয়ে বললাম—"খালি তো বলো লুচি খাব, গজা খাব! হিরের আংটি পরে রোজ রোজ অত ময়দা ঠাসা যায়? ওই জন্যে খুলে রেখেছিলাম...।"

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। চোর পালানোর পর বুদ্ধি অসম্ভব বেড়েছে। সেই সব হারানো জিনিস কোনওদিনই আর ফেরত পাওয়া যায়নি। ইনসিওরেন্স কোম্পানি পত্রপাঠ জবাব দিয়েছিল গয়নার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম নেই। নামমাত্র কিছু ঠেকিয়ে দিয়েছিল। তখন কোনওকিছু নিয়ে লড়বার মতো অভিজ্ঞতাও ছিল না।

এখন সবাই কতরকম সম্ভাবনার কথা ভেবে কত রকম আগাম ব্যবস্থা করে রাখে। গয়না থাকে ব্যাঙ্কের লকারে। বাড়িতে কিছু রাখলে তার জন্য আলাদা প্রিমিয়াম দিয়ে অন্য একটা ইনসিওরেন্স করে রাখে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি উপদেশ দেয়—গা ভর্তি গয়না পরে অথবা বাড়ির যাবতীয় দামি জিনিসের ছবি তুলে রেখো। চুরি হলে ওই ছবিগুলোই প্রমাণ করবে তোমার আসলে কী কী ছিল। তার ওপর ক্ষতিপূরণ পাবে। বাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থারই বা কত কায়দা! ছুটিতে বাইরে গেলে বাড়ির আলোর সুইচের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় ধরে টাইমার ঘড়ি বসিয়ে যাও। একমাস/দু'মাস বাইরে ঘুরে এসো।

জনমানবহীন বাড়িতে অ্যালার্ম ক্লক অনুযায়ী সন্ধে লাগতে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠবে। রাত এগারোটা নাগাদ নিভে যাবে আপনিই। আবার টিভিও চলবে মাঝে মাঝে। পুলিশের খবর দেওয়া থাকলে সুন্দরবাবুর অনুগামীরা ছড়ি ঘুরিয়ে বাড়ির চারপাশে টহল মেরে যাবে অন্তত দু-চার দিন অন্তর। পোস্ট অফিসে খবর দিয়ে রাখলে তারা পুরো সময়কার যত চিঠিপত্র নিজেদের হেফাজতে জমিয়ে রাখবে যাতে বাড়ির ডাকবাক্সে জমা চিঠির পাহাড় দেখে চোরের মনে সন্দেহ না জাগে। পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সমঝোতা থাকে। বাগানে ঘাসের জঙ্গল গজাতেই দেবে না। লোক ডেকে ছাঁটিয়ে রাখবে সময়মতো। ফিরে এসে পাওনাগণ্ডা মেটালেই হবে। মোট কথা বাড়িটি বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় থাকবে না গজেনবাবু দেড়মাসের জন্যে কলকাতার গিয়ে বসে আছেন। এরপর আছে আরও আধুনিক ব্যবস্থা। বার্গলার্স অ্যালার্ম সিস্টেম। সারা বাড়ির দরজা, জানলায় বিশেষ গোপন তারের সাহায্যে অ্যালার্মের ব্যবস্থা করে দেয় বিশ্বস্ত অ্যালার্ম কোম্পানি। হাজার দুই ডলার মতো খরচ করলে মোটামুটি ভালোই অ্যালার্ম লাগিয়ে দেয়। কেউ বিনা নোটিসে দরজা, জানলা খোলার চেষ্টা করলেই পাড়া মাত করে বাজবে শ্যামের বাঁশি। অনেকটা সাইরেনের মতো আওয়াজ। সোজা গিয়ে সেই শব্দভেদী বাণ পৌঁছবে কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে। সাইরেনের কোড নম্বর মিলিয়ে হু হু করে পুলিশের ভ্যান এসে যাবে একেবারে খবরের কাগজের ভাষায় "অকুস্থলে"। তবে ততক্ষণে চোরও পগার পার হতে পারে। সাইরেন তো তারও কানের গোড়ায় শুরুতেই বেজে উঠে বিপদ সংকেত জানিয়ে দিয়েছে। এরকম নানা অ্যালার্ম কোম্পানি এদেশে ফলাও ব্যবসা করছে। কারণ বাড়ি পাহারা দেবার লোকজন তো নেই। একটি বাড়িতে অন্তত চারটি প্রবেশ দ্বারের কাছে ইলেকট্রনিক মনিটরের ব্যবস্থা থাকবে। অ্যালার্ম কোম্পানির বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী অফিসে বসে বসেই যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাবে কোন বাড়িতে চোর তালা ভাঙছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিয়ে দেবে। এভাবে বাড়িতে আগুন লাগার সম্ভাবনাও রোধ করা যায়। তখন দমকলে খবর চলে যায়। ২৪ ঘন্টাই এই মনিটর চলতে থাকে। এককালীন খরচ না দিয়ে মাসে মাসে মাত্র কুড়ি ডলার করে কিস্তিতে বার্গলার অ্যালার্ম সিস্টেম লাগানো যায়। বাড়িতে দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট্ট বোর্ডে বোতাম সহ যন্ত্রটি লাগানো থাকে।

লাগানোর সময় কোম্পানির লোক এসে দেখিয়ে দিয়ে যায় কীভাবে অ্যালার্ম-এর চাবি বা বোতাম টিপে সেটি চালু রাখতে হয়। প্রত্যেক পরিবারের গোপন সংকেত সংখ্যা থাকে। তার হদিশ জানে শুধু অ্যালার্ম কোম্পানির কমপিউটার।

এই সব আধুনিক যন্ত্রের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা অনেকটাই সুদৃঢ় হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে ঝুট ঝামেলাও হয়। মিহির গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী রেখা বরাবর বাড়িতে ছোট ছেলে রেখে চাকরি করেন। এদেশে নিয়ম হচ্ছে বারো বছর বয়স পর্যন্ত একা বাড়িতে ছেলেমেয়েকে রাখা আইনবিরুদ্ধ। কারণ সারাদিনে তাদের বিপদ ঘটলে দেখার কেউ নেই। এমনিতে স্কুলে এবং আরও ছোট বয়সে ডে-কেয়ার সেন্টারেই থাকে বাচ্চারা। কিন্তু মুশকিল হয় স্কুল ছুটির পর থেকে বাবা মা বাড়ি না আসা পর্যন্ত ঘন্টা দু-তিন সময় নিয়ে। বেবি সিটারের বন্দোবস্তই করা হয় সাধারণত। কিন্তু কেউ কেউ খরচ বাঁচাতে চান। চুপচাপ ছেলেমেয়েকে একা বাড়িতে রেখে অফিসে যান। বিশেষ করে স্কুলের দীর্ঘ আড়াই মাসের গরমের ছুটির সময় একা বাড়িতে রেখে গেলে বেবি সিটারের পয়সা অনেক বেঁচে যায়। ঘন্টায় বাচ্চা পিছু অন্তত তিন ডলার দেওয়া মানে সামান্য চাকরিতে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাওয়ার অবস্থা। তবে সাধারণত এই নিয়ম ভাঙতে চান না কেউ। প্রথমত সন্তানের নিরাপত্তার চিন্তা থাকে। দ্বিতীয়ত পাড়া প্রতিবেশী যদি পুলিশকে জানিয়ে দেয় তো আরও ঝামেলা বাড়বে। কিন্তু মিহির গোস্বামীর ন'বছরের ছেলে রাজু কারও তাঁবেতে থাকতে রাজি নয়। একা বাড়িতে ভিডিও গেম খেলে, বই পড়ে আর লম্বা লম্বা টেলিফোন চালিয়ে দিব্যি তার ছুটি কাটে। তা রাজুর রাজত্বে সে ভালোই থাকত গরমের ছুটিতে। একবার ভুল করে দরজা টেনে দিয়ে চিঠির বাক্স দেখতে বেরিয়েছিল। আর বাড়ি ঢুকতে পারে না। দরজা অটোমেটিকভাবে তালাবন্ধ হয়ে বসে আছে। রাজু খানিকক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বাগানের দিক থেকে জানলার কাচ সরিয়ে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। শুরু হল চোর-তাড়ানো সাইরেনের প্রচণ্ড কানফাটা আওয়াজ। রাজু ভ্যাবাচাকা খেয়ে সারা মাঠ ছুটছে। তক্ষুনি পুলিশ এসে হাজির। রাজুকে হাজার জেরা। এক তো নিজেকে ওই বাড়ির ছেলে বলে প্রমাণ করতে প্রাণ যায়। তারপর মোক্ষম প্রশ্ন—"তুমি এইটুকু ছেলে সারাদিন একা বাড়িতে থাকো কেন? গার্জেন কোথায়? বেবি সিটার কোথায়?" বিশ্ব

পাকা রাজু উপস্থিত বুদ্ধির জোরে ঘটনা সামাল দিয়েছিল। কাল্পনিক দিদি নাকি একটুর জন্যে লাইব্রেরিতে গেছে ইত্যাদি বলে পুলিশকে ভুজুং ভাজুং দিতে দিতে ওর বাবা মা পুলিশের ফোন পেয়ে চলে এসেছিলেন।

প্রত্যেক বাড়ির ভেতরে যে "অপারেটিং কি প্যাড" বসানো হয়, তার কোড নম্বর থাকে শুধু মালিকের কাছে আর অ্যালার্ম কোম্পানি মারফত পুলিশের রেকর্ডে। অনেকটা ব্যাঙ্কের লকারের গোপন নম্বরের মতো কায়দা। দরকার হলে বা বিপদের সময় বাড়ির ভেতর থেকেও মালিক সেই প্যাডের বোতাম টিপে সরাসরি পুলিশ বা দমকল বাহিনীকে খবর পাঠাতে পারেন।

বড় বড় শহরে নিরাপত্তার জন্যে নানা ব্যবস্থা। পাড়ায় পাড়ায় "ক্রাইম ওয়াচ" কমিটি থাকে। অনবরত অচেনা ভ্যান পাড়া দিয়ে টহল মারছে কিম্বা ফাঁকা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ভাঙাচোরা একখানা গাড়ি নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে দেখলেই কিন্তু পরোপকারী বুড়িরা ভীষণ তৎপর হয়ে ওঠেন। তক্ষুনি পুলিশে ফোন। অপরাধের মধ্যে হয়তো একজন কালো ড্রাইভার ভ্যান নিয়ে কোনও অর্ডারি মাল ডেলিভারি দিতে এসে বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অকারণ তাকে পুলিশের কাছে পরিচয়পত্র দেখাতে হল। ফোন না করে এলে কোনও বাড়ির দরজা সহজে খোলে না। কালো লোক হলে তো জানলার পাশ থেকে উঁকি দিয়েই খেদিয়ে দেওয়া। সাদা হলে বড় জোর "এখন ব্যস্ত আছি" বলে সরে পড়া। এ সব ট্রেনিং রপ্ত হতে সময় লেগেছে বটে। সেই কবে রক হাডসনের মতো দেখতে একটা চোরকে ওপর তলার নতুন ভাড়াটে ভেবে হেসে হাত নেড়েছিলাম আর সেও ফিক ফিক করে হেসেছিল আর পরে জানলা ভেঙে ঢুকে আমার গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়েছিল, সে সব নিয়েও আর হা-হুতাশ করি না। তারপর থেকে বার্গলার অ্যালার্ম, ক্রাইম ওয়াচ কমিটি, লকারে গয়না রাখা, ইনসিওরেন্সের ক্ষতিপূরণ পাবার আশায় "মণিহারা"র কণিকা মজুমদারের স্টাইলে ছবি তুলে রাখা—চোর পালিয়ে বুদ্ধি বিলক্ষণ বেড়েছে। এখন শুধু চোর চক্রবর্তীকে আর একবার চোখে দেখার আশা। শিব্রামের স্টাইলে তাকে সাত পাকের বাঁধন পরিয়ে পরিয়ে প্রহরে প্রহরে পুজোর নামে প্রণিপাত এবং বমাল সমেত সুন্দরবাবুর যোগ্য (?) হাতে তুলে দেবার সৌভাগ্য কি আর হবে?

ডিম নিয়ে ডামাডোল

"কুসুমকুমারী বিষকন্যা হইবার পূর্বে সাবধান! সাবধান!"

শুনছি ডিমের বাক্সের গায়ে এরপর এরকমই লেখা থাকবে। না, কোলেস্টেরলের জন্যে নয়। পচা ডিমের পরিণতি বোঝানোর জন্যে। লেখা থাকবে — ডিমের মধ্যে মারাত্মক জীবাণু থাকতে পারে। শিশু, বৃদ্ধ আর দুর্বল প্রতিরোধ শক্তির লোকেদের গুরুতর অসুস্থতা হতে পারে। আপনার নিরাপত্তার জন্য ডিম রেফ্রিজারেটরে রাখবেন। এক মাসের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলবেন। ডিমের ভেতরের তাপমাত্রা যেন ৪৫° ফারেনহাইটের নীচে থাকে। রান্না করার সময় ডিম পুরোপুরি সেদ্ধ করবেন। কোনও কারণেই গলগলে কুসুম খাবেন না।

এই ফিরিস্তি অবশ্য অনেকদিন ধরেই দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকার সরকারি মহলে ডিম নিরাপত্তা নিয়ে এত সভা, সম্মেলন চলছে, যে কাঁচাখেকোর ভূমিকা প্রায় সকলেই ত্যাগ করেছে। মনে করুন — ছোটবেলায় শিমুলতলায় গিয়ে রোজ রোজ কাঁচা ডিম খেয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের কথা। শরীরের কোষে কোষে তাজা ভিটামিন চালান দেওয়ার জন্য কাঁচা ডিম, কোয়ার্টার বয়েল, হাফবয়েল, জলের পোচ, মাখনের পোচ, আধভাজা স্ক্র্যাম্বলড এগ, ফ্লিপ-সাইড, সানি সাইড-আপ। পদাবলী আর নামাবলীর আড়ালে সেই আদি ও অকৃত্রিম কুসুমকুমারী। একটু ঘা লাগলেই ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী পিরিচে বহিয়া যায়। যদি সে তরতাজা থাকে ভালো। আপনার অঙ্গে অঙ্গেও ভিটামিন বয়ে গেল। কিন্তু কুসুমে যদি কীট থাকে, তাহলেই সর্বনাশ। বিষাক্ত জীবাণু স্যালমনেলা এনটেরিটাইডস-এর সংক্রমণে আক্রান্ত

হবেন। পেটের মোচড়ে অঙ্গে অঙ্গে বিভঙ্গ তুলে হাসপাতালে চলে যাবেন। সঙ্গে বমি, ডায়ারিয়া, জ্বর, ডিহাইড্রেশন। কুসুমকুমারী বিষকন্যা হয়ে গত বছর অন্তত ছশ একষট্টি হাজার লোককে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মারা গেছে তিনশ পাঁচজন। এ জন্যেই ডিম নিয়ে ওয়াশিংটনে এত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পচা ডিমের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। প্রথম তো ভার্জিনিয়াতেই উত্তেজনা ছড়াল। রিচমণ্ডের কাছে একটি রেস্তোরাঁয় প্যানকেক খেয়ে একজন টিন-এজার ছেলে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্যালমনেলা পয়জনিং-এর জন্যে হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে ভর্তি হল। তার মা শহরের হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে খবর দিতে ওই রেস্তোরাঁ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার এক ঘটনা। ক্রমশ এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, ওই অঞ্চলে কয়েকশো লোক ফুডপয়জন থেকে গুরুতরভাবে অসুস্থ হল। একশ একুশ জনের স্যালমনেলা পয়জনিং হয়েছিল। দেখা গেল প্রত্যেকে ডিম মেশানো খাবার খেয়েছিল।

আমেরিকায় প্রতি বছরই এ রোগ হচ্ছে। তবে সকলেই তো হেল্‌থ বিভাগে খবর দেয় না। তাই সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। ভার্জিনিয়া রাজ্যে "হাউস অফ প্যানকেক" রেস্তোরাঁয় খেয়ে এতজন লোক অসুস্থ হওয়াতে, ওয়াশিংটনে "ডিম অধিবেশন" শুরু হল। জুনের শেষে "হাউস অফ রিপ্রেজেন্টিটিভ" দের জেনারেল অ্যাকাউন্টিং অফিস থেকে সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বিরাট এক রির্পোট দিয়েছে স্যালমনেলা এনটেরিটাইডিস-এর ব্যাপক সংক্রমণ, এ রোগের মৃত্যুর হার ইত্যাদির প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অক্ষমতা নিয়েই সমালোচনা করা হয়েছে।

ইলিনয়ের সেনেটর ডিক ডারবিন তো সেনেটে বেশ এক চোট নিয়েছেন। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইউ-এস "ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন" এবং এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টের "ফুড সেফটি অ্যান্ড ইন্সপেকশ্‌ন সার্ভিস"। তাদের দোষ হচ্ছে — হিমঘরে ডিম রাখার নিয়মকানুন ঠিকমতো প্রয়োগ করতেই পারেনি। ৯১ সালে কংগ্রেসে ডিম ও হিম প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে। কথা ছিল ডিম সংরক্ষণের জন্যে উপযুক্ত তাপমাত্রা স্থির করে আইনের সাহায্যে তা বাধ্যতামূলক করা হবে। কংগ্রেস আট বছর আগে রায় দিয়ে দিল। অথচ "ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন"

আর এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এত দিনেও তাপমাত্রা ঠিক করতে পারল না। আইনের প্রয়োগ করতে পারল না। পচা ডিম খেয়ে লোকে হাসপাতালে যাচ্ছে। ৩৩১ জন মারা গেছে। সেনেটর কৈফিয়ত চাইবেন না তো কী? ডিমের জন্যে হিমের মাত্রা ঠিক করতে আট বছর লাগে?

যাই হোক, এবার কড়া নিয়ম জারি করা হয়েছে, ডিম হিমঘরেই থাকুক, কিংবা ট্রাকে চড়ে এধারে ওধারে চালান থাকুক, রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা অন্তত ৪৫° ফারেনহাইট রাখতে হবে। ট্রাকের ভিতরে যে বিশাল রেফ্রিজারেটর থাকে, সেখানে জব্বর ঠাণ্ডা থাকলে আন্ডা ঠিক থাকবে। শুধু সেখানে নয়, সুপারবাজারে, রেস্তোরাঁয়, স্কুল, কলেজ, আর অফিসের ক্যাফেটোরিয়ার রান্নাঘরেও ডিমকে ওইভাবে রাখতে হবে। ডিমের ভেতরে ৪৫° ফারেনহাইট ঠাণ্ডা থাকলে আর এক মাসের মধ্যে ব্যবহার করে নিলে সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে রক্ষণ ও ভক্ষণ, ততক্ষণ পর্যন্ত অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেবে না বলে আশা করা যাচ্ছে। এ জন্যে ডিমের বাক্সের গায়ে দু-চার লাইন লিখে দেওয়া হবে। আজও লোকেরা ডিমলিপি পড়ে কুসুমের আত্মকথা জানতে পারবে।

এত করেও যে সব সময় স্যালমনেলা সংক্রমণ ঠেকানো যাবে, তা নয়। তবে সম্ভাবনা কমবে। ডিম সংরক্ষণের সতর্কতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, ব্যবসায়ী দল, জীববিজ্ঞানীরা নানা মতামত দিচ্ছেন। জীববিজ্ঞানীরা বলছেন ডিমের আয়ু হচ্ছে আঠাশ দিন। তারপর কুসুমের চারপাশে মেমব্রেন বা ঝিল্লিগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমশ জীবাণুগুলি সংখ্যায় বাড়তে থাকে।

ওই বিজ্ঞানীদের মতে সরকারের ডিমের বিষয় তেমন জ্ঞান নেই। সে জন্যে জীবাণুওলা পয়জনিং-এ এত লোক অসুস্থ হচ্ছে। এফ-ডি-এ আর ফুড সেফটি অ্যান্ড ইন্‌সপেক্‌শন সার্ভিসের লোকদের উচিত ডিম নিয়ে আরও জ্ঞান সঞ্চয় করা।

এদিকে আমেরিকার কয়েকটি রাজ্যে এখনও সুপারবাজারে ডিমের বাক্সের গায়ে বিক্রির শেষ তারিখ লেখা থাকে না। তাদের চাপ দেওয়াতে বলছে — আমরা কী জানি? ওয়াশিংটন থেকে দিনক্ষণ ঠিক করে দিক। বলুক ডিমের বাক্স কতদিন পর্যন্ত বিক্রি করা যায়? তারপর বাক্সের গায়ে ছাপ মারব। মুরগিগুলো কি আমাদের বলে-কয়ে ডিম পেড়েছে, যে তারিখ জানব? ডিমের জন্মও জানি না। মৃত্যুও জানি না। সরকার বিধাতা লিখে দিক।

কিন্তু কীভাবে ডিমে সংক্রমণ হয়? আশির দশকের প্রথম দিকে দেখা যেত, শতকরা মাত্র ছয় ভাগ ক্ষেত্রে স্যালমনেলা এনটেরিটাইডিস জীবাণু থেকে ওই সংক্রমণ হচ্ছে। তখন এরকমই ধারণা ছিল যে — ডিমের খোলার ছিদ্র দিয়ে পাখির মল প্রবেশ করে ওই জীবাণুযুক্ত সংক্রমণ ঘটায়। কিন্তু ৮৮ সালে নতুন তথ্য জানা গেল। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হল — যদি মুরগির ডিম্বকোষে স্যালমনেলা সংক্রামিত হয়ে থাকে, তবে ডিম দেওয়ার সময় তা ছড়িয়ে যায়। অর্থাৎ ডিম্বকোষ বা ওভারির সংক্রমণ থেকে মুরগির ডিমেও জীবাণু সংক্রামিত হয়। ৯৪ সালের মধ্যে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল। যতরকম স্যালমনেলা পয়জনিং হয়ে থাকে, তার মধ্যে স্যালমনেলা এনটেরিটাইডিস-এর প্রকোপই সব চেয়ে বেশি হচ্ছিল। ৮৫ থেকে ৯৮ সালে, মধ্যে প্রায় আটশোবার এ রোগের খবর পাওয়া গেল। তেরো বছরে ৮০ জন মারা গেল।

গত পাঁচ বছর ধরে "ফুড-নেট" নামে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিভাগ খাবারের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছে। এদের প্রধান কাজ হচ্ছে অন্যান্য খাবারের মতো ডিমের ব্যাপারেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া। এরা জানাচ্ছে দু'বছর থেকে স্যালমনেলা সংক্রমণের হার ৪৪% নেমে গেছে। কারণ "ফুড নেট" আমেরিকার ডিম ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত অর্থ সাহায্য ও উদ্যোগের সহায়তায় "এগ কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স প্রোগ্রাম" পরিচালনা করছে। এই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ডিম ব্যবসায়ীরা ওই প্রোগ্রামের জন্যে অর্থ দিয়েছিল। কারণ, একে কোলেস্টেরলের জন্যে ডিমের বদনাম হয়েছে। ডিম বিক্রির হার লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে। তার ওপর ফুড পয়জনিং-এর ঘটনা বাড়তে থাকলে এতকালের আন্ডার ব্যবসার মাথায় নির্ঘাৎ ডাণ্ডা পড়বে। এমনিতেই লোকে হার্ট অ্যাটাকের ভয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় ডিম খাওয়া ছেড়েছে। এবার পেট ছাড়ার ভয়ে আদৌ খাবে কি না সন্দেহ। শুধু তো ডিম খাওয়া নয়, যে সময় রান্না আর বেক করা মিষ্টি ইত্যাদিতে কাঁচা ডিম লাগে, তারও পদ্ধতি বদলে যাবে। বিকল্প রান্নায় তো অনেকেই ওস্তাদ। নতুন নতুন রান্নার বই লিখবে। টিভি-তে ডিম ছাড়া রান্না শেখাবে। অণ্ডশিল্পের এই প্রচণ্ড ক্ষতির কথা ভেবে ব্যবসায়ীদের গণ্ডে হাত। তারা তখন "ফুড-নেট"-এ অর্থদণ্ড দিয়ে ডিমের সুনাম ফিরিয়ে আনতে চাইল। "ফুড-নেট"-ও খুব তৎপর। তারা ডিম উৎপাদন, সংরক্ষণ নিয়ে কয়েকটি

নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। কীভাবে পোলট্রি ফার্মিং হবে, কত তাপমাত্রায় ডিম রাখা হবে, কতদিন পর্যন্ত ডিম তাজা থাকবে এবং বিক্রি করা যাবে এবং কীভাবে সংক্রমিত ডিমগুলি আলাদা করে নিয়ে প্যাস্তুরাইজড করা হবে — প্রত্যেকটি বিষয়ে নীতি নির্দেশ দেওয়া আছে। সেভাবেই কাজ চলছে।

"এগ নিউট্রিশন সেন্টার" জানাচ্ছে আমেরিকার পোলট্রি ফার্মিং কোম্পানিগুলির ৯৩ শতাংশ ওই নির্দেশ অনুযায়ী ডিম উৎপাদন ও সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করেছে। তা সত্ত্বেও সরকারি কৃষি দপ্তরের হিসেব হচ্ছে — গত বছরে প্রতি কুড়ি হাজার ডিমের মধ্যে একটি করে সংক্রমিত ডিম পাওয়া গেছে। তার সংখ্যাও কম নয়। প্রায় ৩.৪ বিলিয়ন অর্থাৎ চৌত্রিশ কোটি ডিমে স্যালমনেলা জীবাণু ছিল।

মুশকিল হল ফার্ম থেকে খাবার টেবিল পর্যন্ত যে দীর্ঘ পথ, ডিম তার ধকলও সইতে পারে না। সাত জায়গায় ঘুরে আসতে গিয়ে সংক্রমিত হতে পারে। "ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন" ঠিক করেছে এজন্যেও জাতীয় পরিকল্পনা নেওয়া হবে। কংগ্রেসম্যান আর বিজ্ঞানীরাও একমত। "প্রেসিডেন্টস কাউনসিল অন ফুড সেফটি" এ কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পরিকল্পনার খসড়া জমা দেবে। ইতিমধ্যে হোটেল, রেস্তোরাঁগুলি প্যাস্তুরাইজড ডিম ব্যবহার করা শুরু করেছে। ফুড পয়জনিং-এর মামলায় ফেঁসে যাওয়ার আগে সাবধান হওয়া উচিত।

"ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন" এবার থেকে ডিমের বাক্সের গায়ে লেবেল লাগানোর নির্দেশ দিয়েছে। স্যালমনেলা জীবাণু সংক্রমিত ডিম নিয়েই সতর্কতা। ওই সংক্রমণযুক্ত ডিম যদি কাঁচা অথবা আধ সেদ্ধ অবস্থায় পেটে চলে যায়, স্যালমনেলা এনটেরিটাইডিস হতে পারে।

এমনিতেও ডিম সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। কেনা ডিম ফ্রিজে রাখলেও এক মাসের ভেতর ব্যবহার করে ফেলা উচিত। ডিম বাইরে বেশিক্ষণ ফেলে রাখবেন না। ফাটা ডিম ব্যবহার করবেন না। যেসব খাবারে কাঁচা ডিম লাগে, যেমন মেয়নিজ, স্যালাড ড্রেসিং, বাড়ির তৈরি আইসক্রিম ইত্যাদিতে প্যাস্তুরাইজড ডিম দিতে বলা হচ্ছে। কেক, বিস্কুট, তৈরি করার সময় কাঁচা ডিম দিয়ে ফেটানো গোলা চেখে দেখাও ঠিক নয়। ডিমের তৈরি খাবার যেমন ফ্রেঞ্চ টোস্ট, প্যানকেক, ইতালিয়ান লাসানিয়া ইত্যাদি তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে, মাঝখানের অংশ যেন ১৬০° ফারেনহাইট

তাপমাত্রায় রান্না করা হয়। ডিমের ওম্‌লেট সেদিক থেকে নিরাপদ। কারণ পুরোপুরি ভাজা হয়ে যাচ্ছে। যদিও খাদ্যগুণ থাকছে না এবং কোলেস্টেরল বাড়াচ্ছে। ছোট থেকে বড় প্রত্যেকের জন্যেই সবচেয়ে নিরাপদ ও পুষ্টিকর হচ্ছে ডিমসেদ্ধ।

মাছের ফ্রাই গড়ে কিংবা মাছ মাংসের চপ গড়ে ফ্রিজে একদিনের বেশি ফেলে রাখবেন না। যতই ঠাণ্ডায় থাক, কাঁচা ডিমের গোলা মাখানো খাবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেজে নেবেন। একটা কথা ঠিক, আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশে একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বাজার করে ফ্রিজে জমিয়ে রাখার অভ্যাস বোধহয় এখনও হয়নি। সেদিক থেকে ডিমের তারিখ দেখে এক মাসের মধ্যে খরচ করারও তাড়া নেই। কিন্তু ভয় অন্য জায়গায়। হোটেল, রেস্তোরাঁ আর রাস্তার ধারের মাংসের রোল ও মোগলাই পরোটার দোকানে ডিম কীভাবে আনছে, রাখছে, জানার উপায় নেই। বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে পেটের গোলমালে অসুস্থ হওয়ার কারণই হয়তো তাই। হাজার খানেক ফিশ ফ্রাই কিংবা মাংসের চপ গড়ে কতক্ষণ কোন ফ্রিজে রাখা হচ্ছে কে জানে? যে কোনও ঋতুতেই বিনা রেফ্রিজারেশনে, রুম টেম্পারেচারে কয়েক ঘণ্টা খাবার পড়ে থাকা মানেই ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর সম্ভাবনা থাকছে। বিশেষ করে কাঁচা অবস্থায় মশলা ও ডিমের গোলা মাখানো খাবারে। ভিনিগার ও মশলাগুলি 'প্রিজারভেটিভ" হিসাবে কাঁচা মাছ, মাংসকে কিছু সময় পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত রাখতে পারে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। ঘরের ভেতরের গরম, আর্দ্রতা থেকে খাবারে ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। ধীরে ধীরে পচনক্রিয়া শুরু হয়। বিয়েবাড়িতে ওই ফ্রাই, কাটলেট খেয়েই আপনার ফুড পয়জন হতে পারে। চীনের দোকানের চিংড়িও আপনাকে পেটের যন্ত্রণায় ভোগাতে পারে।

যাই হোক ডিম দিয়ে কথা শুরু হয়েছিল। গলা কুসুম, ঝরা কুসুম, সিকি সেদ্ধ, আধ সেদ্ধ সব বাদ দিন। টেনিদার সঙ্গে পিকনিকে যাচ্ছেন ভেবে মাঝে মাঝে ডিম সেদ্ধ করুন। কাঁচা ডিম মানে শিমুলতলা। সেদ্ধ ডিম মানে পিকনিক। কুসুম হারায় না। গান তো আপনার আছেই। গেঁওখালির পথে পথে 'ওহে সুন্দর, বেলা না যেতে খেলা কেন তবু যায় ঘুচে — কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও —।

স্কন্ধ পুরাণ

"আসুন আমরা সব কিছু ভুলে গিয়ে কাঁধ কাঁধ মিলিয়ে চলি। একতাই আমাদের মুলমন্ত্র...।"

কথাগুলো বছরে ছ'বার পড়ি কিংবা শুনি। ভোটাভুটির আগে, পরে তো শুনবই। ক্লাবের ইলেকশনে, কমিউনিটি সেন্টারে কিংবা পুজোর মিটিং-এ, মহাবঙ্গ সম্মেলনে টাউন মিটিং আর কুচকাওয়াজের ফাঁকে নেতাদের জলদ আওয়াজ — কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলুন। কণ্ঠলগ্ন সেইসব দৃশ্য ভাবতে ভাবতে আমি একা একাই কাঁধ মেলানো প্র্যাকটিস করছিলাম। দেওয়ালের দিকে মুখ করে, দু'ফুট পিছিয়ে গিয়ে, দু'হাত বিছিয়ে ডানা মেলতে মেলতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম... আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।

হ্যাঁচকা ব্যথায় যেথা গান থেমে যায়। ওঃ। ডান কাঁধে বিদ্যুৎ খেলে গেল। থির বিজুরি সম থমকে রইলাম। কিন্তু, না। রণে ভঙ্গ দিলে চলবে না। অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ তুলে দেওয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে।

একটু দম নিয়ে আবার পেখম মেলছি। স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ। পাখির ব্যায়াম প্রায় পাখি পড়ার মতো করেই ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট শিখিয়ে দিয়েছে। আমার কাজ শুধু সকালে উঠে জয় বজরংবলী বলে শুরু করা। হ্যাঁ, মারুত নন্দনের পোজও আছে কয়েকটা। এধার ওধার লম্ফঝম্প মারতে হবে। সেগুলো দুপুরে করব। ততক্ষণে হাতের খিল খুলে যাবে। সাঁঝবেলায় মাঝখাম্বাজে রোইং-এর ভঙ্গি দিয়ে শেষ কোয়েলিয়া গান থামা এবার। এভাবেই আমি প্রহরে প্রহরে ব্যায়াম করছি। নয়তো জমাট স্কন্ধ সারবে না। অর্থোপেডিক সার্জনও কাঁধে কাঁধ মেলাতে বলেছেন। তবে অন্যদের সঙ্গে নয়। স্বামীজির ভঙ্গিতে বুকে আড়াআড়ি করে হাত রেখে একবার হেঁইও ব'লে

এ কাঁধ ধরে টানা। একবার ও কাঁধ ধরে টানা। আসলে টানটা মারতে হবে শক্ত হাতে কনুই চেপে ধরে। একটা পবিত্র পোজ। এ জন্যে সকালেই সেরে নিই।

লক্ষ করে থাকবেন এ বছরে অসুখ বিসুখের কথা বেশি লিখিনি। নিজের অ্যানুয়্যাল সিকনেস রিপোর্ট একদম বাদ গেছে। বছর ঘুরে গেছে দেখে খেয়াল হল, জমাট স্কন্ধের কথা লেখা হয়নি তো। আমি যে আবার একজন নতুন ডাক্তার খুঁজে বার করেছি, আবার নতুন ব্যথার সাতকাহন গেয়ে অর্থোপেডিককে অর্থপ্রাপ্তির মুখ দেখিয়েছি — কিছুই লেখা হয়নি। অবশ্য এসব তুচ্ছ ঘটনা কাগজে লেখার মতো নয়। তবে, কাঁধে ব্যথা কিংবা কাঁধ আর হাতের জয়েন্টে কনকন, ঝনঝন, ছুঁচ ফোটা ইত্যাদিতে যাঁরা যন্ত্রণা পান তাঁদের কথা ভেবে কাঁধে কাঁধ মিলাতে চাই। ব্যথা, ওষুধ ও কাঁধ সঞ্চালনের একতাই আমাদের মূলমন্ত্র। তাল সে তাল মিলা...।

আগে উপসর্গ দিয়ে শুরু করা যাক। আপনার কি কখনও আধো রাতে হাতের ব্যথায় ঘুম ভেঙ্গে যায়। কাঁধ থেকে কনুই-এর বর্ডার লাইন পর্যন্ত চিড়িক মেরে ওঠে? হাতটা গুটিয়ে আনলে খচাং করে লাগে? আচ্ছা, আর একটা পয়েন্ট। ডান হাত বাড়িয়ে নাইট ল্যাম্প নেভাতে গেলে হাতের নীচে ছুঁচ ফোটে? সকালে উঠে হাত উঁচু করে কিছু ধরতে গেলে কাঁধ চিনচিন করে। টাইপ করা কমপিউটার নিয়ে বসা, লেখালেখির কাজ, তবলা বাজানো, বেহালার ছড়টানা, সেতারে ঝংকার তুলে তুলে রেওয়াজ, বাড়িতে হাতা, খুন্তি নেড়ে নেড়ে রান্না, হাতে কাপড়জামা কাচা, ইস্ত্রি করা, কাঁধে ভারী ব্যাগ নিয়ে ঘোরাঘুরি, অনেকক্ষণ ধরে সেলাই ফোঁড়াই-এর কাজ, ময়রার দোকানে তাল তাল ছানা, ময়দা চটকানো, এমনকি কৌটোর প্যাঁচ ঘোরাতে গেলেও খ্যাঁচ করে লাগে? মাঝে মাঝে পিঠের ডানা পর্যন্ত ব্যথা ছড়িয়ে যায়? ডানা দুটোর হাড় চিনচিন করে। টিপলে ব্যথা সত্ত্বেও আরাম হয়? হাত ঘুরিয়ে পিঠ ছুঁতে গেলে কাঁধ খসে যাবে মনে হয়।

যদি এতে কিছু হয়, বুঝতে হবে আমার কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন। "ফ্লোজন্-শোল্ডার" হয়েছে। হ্যাঁ, দু'পাতা ফর্ম ফিল আপ করে ডাক্তারকে দিতে তিনি তাই বুঝেছেন। "এক্স-রে" করে প্লেট দেখিয়ে আমাকেও তাই বুঝিয়েছেন। আমি অবশ্য অত দেখিনি। কংকালের কাঁধ দেখার কী আছে? ব্যথা সারাবি কি না তাই বল?

প্রথমে অবশ্য হাড়ের ডাক্তার কাছে যাইনি। বছর খানেক ধরেই ডান কাঁধ আর ডান হাতের ওপরটা একটু একটু নোটিশ দিচ্ছিল। আমল দিইনি। ভেবেছির্লাম ট্র্যাভল করার সময় ভারী কিড ব্যাগ বয়ে বয়ে হয়েছে। ভেবেছিলাম সুপার মার্কেট থেকে ভারী ভারী ঠোঙা নিয়ে গাড়িতে তোলা আর বাড়িতে নামানোর জন্যে হয়েছে। বেহালা বাজাই না বটে। কিন্তু ছুরি দিয়ে ধুমসো বাঁধাকপি, খটখটে কুমড়ো, গেঁটে আলু, পেট মোটা ওলকপি, গাদা গাদা পেঁয়াজ আর মাংস কাটতে কম চাড় লাগে? বেহালার ছড়ের বদলে ছুরির চাড় দিতেই হাতে চিড়িক মারা ব্যথা।

তাও গ্রাহ্য করিনি।। দু/চারটে বড়ি টড়ি খেয়ে সেরে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে হিটিং প্যাড কিংবা হট পাওয়ার। কিন্তু ব্যথা কাঁধে চেপে বসে, নামায় কার সাধ্য? শেষ পর্যন্ত ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানকে বললাম। তিনি পাঠালেন ও. বি. গাইনির ডাক্তারের কাছে সেখানে এখন অ্যানুয়াল চেক-আপের সঙ্গে শিরদাঁড়ায় এক্স-রে করা নিয়ম হয়ে গেছে। মেয়েদের ক্যালসিয়ামের অভাবে ক্রমশ হাড্ডি পিলপিলিয়ে যায়। তাই অস্টিওপোরোসিস ঠেকাতে আগেই এক্স-রে করে দেখবে। শিরদাঁড়ার হাল বুঝে দরকার হলে আরও ক্যালশিয়াম আর ভিটামিন ডি'র ডোজ বাড়িয়ে দেবে। ব্রিটল বোনস বা ভঙ্গুর অস্থি ধরা পড়লে একটা বাড়তি ওষুধ লিখে দেবে। এছাড়া দুধ খাও, দই খাও, ব্যায়াম করো, হর্মোনের ওষুধ খাও, নানা ফিরিস্তি।

শিরদাঁড়ার এক্স-রে করালাম। হাড় নরম হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। মেরুদণ্ডে জোর আছে জেনে উৎফুল্ল হওয়ার মুখেই শুনি এক ইঞ্চি বেঁটে হয়ে গেছি। সে কি? এখন তাহলে আমার হাইট কত? বেঁটে হয়ে গেছি মানেটা কী? যা তা একটা বলে দিলেই হল? নার্সটাকে চেপে ধরলাম। আমাকে তুমি এক ইঞ্চি বেঁটে বললে কেন? ফাইলেই বা টুকলে কেন?

নার্স আমার নাতিদৈর্ঘ্যের ইতিহাস খুলে দেখাল। গত একুশ বছর ধরে ডঃ নিকোসিয়ার কাছে অ্যানুয়াল চেক-আপ-এ আসছি। এত বছর খাতা কলমে এক হাইট ছিল। হঠাৎ এ বছরে নার্স মেপে দেখল এক ইঞ্চি কম। এদিকে ওজনের ব্যাপারটা ঠিক উলটো। একুশ বছর আগে ছিল একশ দশ পাউন্ড। আর এখন একশ পঁচিশ পাউন্ড। ঠিক আছে, কিন্তু আরও বেঁটে হওয়ার কারণটা কী? কী সেই হ্রস্বতার রহস্যের চাবিকাঠি?

ডঃ নিকোসিয়া বোঝালেন — দ্যাট্স নাথিং! যাদের হাড় সরু, তারা

ক্যালিসিয়ামের অভাবে শেষ বয়সে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তোমার সে বয়স হয়নি। ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সিও নেই।

—তাহলে? এক ইঞ্চি কমে গেলাম কেন?

ডঃ ডনকোসিয়া হেসে খুন — ঠিকমতো সোজা হয়ে দাঁড়াওনি বলে। এসো, আমি মেপে দেখছি। আর রাজি হলাম না। নিকোসিয়া বোঝালেন — তোমার অস্টিওপোরোসিস-এর সাইন নেই। হাতের ব্যথাটা হয়তো মাসল পেইন। ওষুধপত্র খেয়ে দেখো ক'দিন। আমি তখনও এক ইঞ্চির দুঃখে উদাস হয়ে বসে আছি বুঝে ডাক্তার পিঠ চাপড়ে বললে—ও সব কিছু না। একুশ বছরে আমার চেঞ্জটা দেখছ না? ওয়েট গেইন করে যাচ্ছি। মাথা খালি হয়ে যাচ্ছে। অ্যাম আই লুকিং সেম অ্যাজ আই ইউজ্‌ড্‌ টু বি?

তা সত্যি! এই লেনার্ড নিকোসিয়ার মতো রূপবান ডাক্তার খুব বেশি দেখিনি। চোখের সামনে তাঁরও বয়সও বেড়ে গেল। যাক্‌ গে, আমার এক ইঞ্চি হাইট ঘুচে গিয়ে থাকলে, নিকোসিয়ারও তো একমাথা চুল ঘুচে গেছে। অতএব ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব। ওষুধের স্যাম্পল ট্যাম্পল হাতিয়ে বাড়িয়ে চলে গেলাম।

একদিন কী মনে হতে উরসুলাকে ফোন করলাম। গ্রিক আমেরিকান এই মহিলাও ডঃ নিকোসিয়ার কাছে যায়। ইদানীং পিঠের ব্যাথায় ভুগছে বলে অস্টিওপোরোসিস-এর পরীক্ষা করাতে গিয়েছিল। এখন অর্থোপেডিক দেখাচ্ছে। উরসুলাকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম — আচ্ছা, তোমার হাইট ঠিক আছে তো?

উরসুলা অবাক — কীসের হাইট?

—তোমার। তোমার। নার্সটা হাইট নেয়নি?

—ও হ্যাঁ, হাইট তো চেক করেই। জানো তো, অদ্ভুত ব্যাপার। আমি এই বয়সেই স্টুপ করেছি। অ্যাবাউট আ ইঞ্চ। অথচ আমার মা কিন্তু এখনও স্ট্রেইট। শি ইজ অলমোস্ট এইটি থ্রি।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। নার্সটা সবাইকে এক ইঞ্চি কমাচ্ছে। হয় চোখের প্রবলেম। নয় মিচকে পাজি। আমরা কোলকুঁজো হয়ে বেঁকে পড়ছি — এটাই বোঝানোর তালে আছে মনে হয়। পরের বারে শায়েস্তা করব। লম্বা লম্বা আমেরিকান মহিলাদের নিয়ে তুই যা খুশি কর। দু'মুঠো কমাতে চাস, কমিয়ে দে। কিন্তু আমাকে ছোট করবি কেন?

মাঝে কিছুদিন গেল। কাঁধের ব্যথা ঝিমিয়ে গেছে। আবার হঠাৎ কনকনানি শুরু হল। এবার টোটকা টুটকি ছেড়ে গুট্‌কির কাছে গেলাম। পুরোনাম ডঃ লুইস গুটিকন। অর্থোপেডিক সার্জন। ব্যথার ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিধির কথা শুনে কাঁধের ওপর খামচে খামচে পরীক্ষা করলেন। হাত উঁচু করে আমপাড়ার ভঙ্গিতে আঁক করে উঠতেই গুটকিন বললেন — থাক, থাক। এক্স-রে বুঝতে করলে পারব। তারপর এক্স-রে করে ফ্রোজন শোল্ডার ধরা পড়ল। কেন হয় জানতে চাওয়ায় বললেন, ঘাড়ধাক্কা খেলেও হয়, না খেলেও হয়। হাত মটকে গেলেও হয়, না গেলেও হয়। গাড়ি আক্সিডেন্টে চোট পেলে তো হয়ই। না পেলেও হতে পারে। আছড়ে পড়ে যাওয়া, না পড়ে যায়—দু'কারণেই হতে পারে। মোট কথা ওখানে হাড়, মাংস, পেশি টেশিগুলো একটু গেঁড়াকল পাকিয়ে রয়েছে। চিন্তার কিছু নেই। তিন সপ্তাহ ফিজিক্যালথেরাপি আর কুড়িদিন ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। ইনফ্ল্যামেশন থেকে স্টিফনেস হয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আইস প্যাক আর ময়েস্টহিট্ প্যাক দিলে ব্যথা এখনই কমে আসবে।

ওষুধটার নাম সেলিব্রেক্স। আর্থ্রাইটিসের এই নতুন ওষুধ এখন বাজারে খুব চলেছে। আমার চেনাশোনা হাঁটু ব্যথার রোগী, পিঠে ব্যথার রোগী, টেনিস এলবো বা কনুই ব্যথার রোগী, সবাই খাচ্ছে শুনছি। সেলিব্রেক্স-এর কেমিক্যাল নাম সেলিককসিব। শরীরের ককল্-টু এনজাইমের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘাটায় সার্ল ও ফাইজার কোম্পানির তৈরি "সেলিব্রেক্স" এখন বাতের মহৌষধ। ডাক্তার আমাকে দুশো মিলিগ্রামের একখানা করে ক্যাপসুল ঠুকে দিয়েছেন।

রাতারাতি বেশ ফলও পাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম ফিজিওথেরাপিটা চেপে যাব। তিন সপ্তাহ ধরে, সপ্তাহ তিনদিন করে যাওয়া আর এলোপাথাড়ি কাঁধ নাচানো, হিট ট্রিটমেন্ট কোল্ড প্যাক, হাত ধরে টানা হ্যাঁচড়া কার ভাল লাগে? শুনেছি যন্ত্রণা আরও ছড়িয়ে যায়।

কিন্তু পালানোর উপায় নেই। ডঃ গুটকিন তাদের ফোন করে দিয়েছেন। ফিজিক্যাথেরাপি সেন্টার থেকে পটাপট ডেট বুক করে নিল। আমাকেও রগড়ে দেবে। ওদিকে মেডিকেল ইনশিওরেন্স কোম্পানির থেকেও রগড়ে নেবে। তাদের মহারগড় টের পেয়ে চুপচাপ ডেটগুলো লিখে নিলাম। এখন ক্যালেন্ডার ভর্তি শুধু – পি. টি. টেন টু ইলেভন-ফিফটিন।

প্রথম দিন সোনার তরী। নৌকো বাওয়া শেখাল। কিন্তু শুয়ে শুয়ে। দু'হাত লগি উঁচু করে ধরা। তারপর হেঁইও করে পুরো মাথার পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া। দশ সেকেন্ড ধরে রাখা। আবার মাথা পেরিয়ে সামনে টেনে আনা। আকাশগঙ্গা পারাপার করে আর পারছি না। ব্যথায় ককিয়ে যাচ্ছি দেখে থেরাপিস্ট চাকলা চাকলা বরফ নিয়ে বসল। এমনিতেই ঘাড় আর হাতের জয়েন্ট চটকে চটকে ব্যথা করে দিয়েছে। ওটা নাকি ইনফ্ল্যামেশন পরীক্ষা করার কায়দা। এবার হাতের গোছে লাট্টু ঘোরানোর কায়দায় বরফের গুলি ঘোরাতে লাগল।

আবার ওয়ার্ল্ড একসারসাইজ। কিন্তু এবার মহিষমর্দিনী পোজ। কাঁধের পাশ দিয়ে কোণাকুণিভাবে ত্রিশূলের স্টাইলে ডাণ্ডা ধরিয়েছে। যা বুঝলাম চিৎ হয়ে ত্রিশূল চালাতে হবে। অদৃশ্য অসুরকে এফোঁড় ওফোঁড় করতে হবে। মোট কুড়িবার।

অদৃশ্য বারি বিহারের পরে আমি অরি সংহারে মেতে উঠলাম। কাঁধ ছিঁড়ে পড়েছে, তাও ত্রিশূলে ঠেলে দিচ্ছি। শুধু শুয়ে আছি বলে "ভাসানের পোজ"। আমার অভূতপূর্ব রণকৌশল দেখে থেরাপিস্ট মুগ্ধ। প্রথম দিনেই ডায়াগন্যাল স্ট্রেচিং-এ এরকম উল্লাস ও উন্নতি আশা করেনি। ভাবছে বরফ ঘষার ফল। আমি তখন ছৌ নাচ শুরু করেছি।

এবার কবীন্দ্র ভঙ্গি। দাঁড়িয়ে দু'হাত পেছনে রেখে দশ সেকেন্ড। তারপর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে কনুই চেপে ধরে ওপরে ঠেলে তুলতে হবে। ওরে বাবাঃ, মোক্ষম ঝট্‌কা লেগেছে। নিজেকে নিজে পিছামোড়া করে বাঁধতে গেছি! অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যায়ামে ক্ষান্ত দিলাম। থেরাপিস্ট কাঁধে মাসাজ করে শান্ত করল। তারপরেই হাত ধরে পাঁচবার হ্যাঁচকা টান।

একটু জিরিয়ে নিয়ে দেওয়ালে ডিঙি মেরে দু'হাত ছড়িয়ে দিলাম। আরও স্ট্রেচিং করলাম। তারপর ভজ গৌরাঙ্গ নৃত্য। কিন্তু আকাশ থেকে হাত নামানোর সময় একটু একটু করে কাঁপাতে কাঁপাতে নামাতে হবে। বরষে রিমঝিম ঘন ঘন রে। খুব সোজা। থেরাপিস্টটাকে আমল না দিয়ে বারবার করতে লাগলাম। বর্ষামঙ্গলে অতিষ্ঠ হয়ে ঘড়ি দেখে ঘর থেকে বার করে দিল।

তখন বুঝিনি কী শিক্ষা বাকি আছে। বাড়ি আসার পর থেকে যন্ত্রণা শুরু হল। ব্যথা যে এরকম ট্রান্সফার নিয়ে ঘুরে বেড়ায় জানতাম না। ছিল ঘাড়ে আর হাতে ব্যথা। বদলি হয়ে চলে গেল তারা পিঠে। সারা পিঠ জুড়ে তাণ্ডব।

ত্রিশূল এখন আমাকেই খুঁচিয়ে মারছে। সন্ধেবেলা আমাদের সেই রসিক বন্ধু সুজন দাশগুপ্ত ফোন করল। ওর বউ শমীতাও হাঁটুর যন্ত্রণার জন্যে ফিজিওথেরাপি করাচ্ছে। আমার পিঠে ব্যথার কথা শুনে সুজন সান্ত্বনা দিল — প্রথম দিন এরকম হবে রে। ব্যথা মুভ করছে মানে থেরাপিতে কাজ হচ্ছে। এরপর দেখবি আরও দূরে দূরে চলে যাবে।

—আরও দূরে মানে? পিঠেই তো যথেষ্ট ভোগাচ্ছে।

সুজন সোৎসাহে খবর দিল — দ্যাখ না, পায়েও চলে যাবে। বুই (শমীতার ডাকনাম) তো হাঁটুর ব্যথা সারাতে গেল। থেরাপিস্ট ব্যথাটা হাঁটু থেকে পিঠে তুলে দিয়েছে। তোরও দেখবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারাবে।

সুজনের সুসংবাদ শুনে পিঠে আইস প্যাক ঠেসে দিয়ে বসে থাকলাম। রাতের দিকে কমে এল। হয়তো ওষুধের জন্যে।

ফিজিওথেরাপির দ্বিতীয় দিনে আগের দিনের সব ট্রেনিং ঝালিয়ে নিতে হল। পিছমোড়াটা বাড়িতে করিনি। ওখানেও বাদ দিলাম। বললাম, হাত বেঁকে গেলে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব না। থেরাপিস্ট বলল — না, না নিজেকে বেশি ব্যথা দিও না। ওটা আস্তে আস্তে হবে।

এবার নতুন ভঙ্গি। একটা টেবিলে ডান হাত লম্বা করে বিছিয়ে দিলাম। সাইড করে চেয়ারে বসেছি। এবার মাথা নত করে নিজের কোলে লুটিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু হাত নড়বে না। ওই রকম টান টান করে বিছিয়ে রাখতে হবে। বাহুবল, স্কন্ধবল ও পৃষ্ঠবলের পরীক্ষা হচ্ছে বেশ কষ্টকর। ঝুঁকে পড়ে নিজের কোলে মাথা ঠেকাতে গেলেই বাহুমূলে শূলবেদনা। দশ সেকেন্ড করে হুমড়ি খেয়ে থাকা সোজা নয়।

পক্ষবিস্তার করে এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসা, কাঁধে ঢেউ খেলানো ইত্যাদিতে আবার সেই স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যভঙ্গি ফিরে পেলাম। মহাফূর্তিতে ঘরময় পাখসাট মেরে বেড়াচ্ছি। থেরাপিস্ট থামিয়ে দিল। আগের দিনের বর্ষামঙ্গলের পরে ভয় পেয়েছে। বলল — স্ট্রেচিং আজকের মতো শেষ। এবার ছোট্ট একটা মাসাজ করব। তারপর হিট দেব। মাসাজের নামে ফুর্তি আরও বেড়ে গেল। আসলে আমি তো কায়রোপ্র্যাকটরের কাছেই যাব ভেবেছিলাম। মালিশ বিশেষজ্ঞরা সব ব্যথা সারিয়ে দেবে বলে বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু ডাঃ নিকোসিয়াকে বলতেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ডাক্তারদের ধারণা কায়রোপ্র্যাকটরদের কাছে যাওয়া মানে স্রেফ গা, হাত, পা টেপানো।

আরাম হয়, হয়তো সাময়িক উপকারও হয়। কিন্তু রোগ সারে না। সব ব্যথা ফিরে আসে। কায়রোপ্র্যাকটরদের কাছে পিঠ টিপিয়ে কার স্পাইন ইন্‌জুরি হয়েছে, কার কোমরে সায়াটিকা চাগাড় দিয়েছে, হিতে বিপরীত হওয়ার এইসব বাজে গল্পও রটে। আমার কিন্তু ভারী ইচ্ছে ছিল একবার যাই তাদের হাতের কেরামতি পরখ করে আসি! সে আর হল না।

যাই হোক, থেরাপিস্ট কাঁধ আর পিঠ মুচড়ে দিল। টিউবওয়েল পাম্প করার ভঙ্গিতে আমার হাতটা এগিয়ে, পেছিয়ে দিয়ে ছোট্ট মাসাজ সেরে নিল। এবার হিট কমপ্রেস। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ডান হাতে মোটা একখানা প্যাড জড়িয়ে দিয়ে দেওয়ালে কয়েকটা বোতাম টিপে হিট চালিয়ে দিল। হাতে গরম গরম চাপ লাগছে। থেরাপিস্ট ঝুঁকে পড়ে বলল — "এই ঘণ্টাটা বাঁ হাতে ধরে থাক।" দেখি পুজোর ঘণ্টার মতো ছোট্ট একটা পেতলের ঘণ্টা ধরিয়ে দিচ্ছে। অবাক হয়ে বললাম — "কিন্তু বাঁ হাতে তো কিছু হয়নি!" থেরাপিস্ট হাসল। বলল ওটা কলিং বেল্। যদি শরীর খারাপ লাগে ঘণ্টা বাজালেই ও চলে আসবে। আমি জেরা করলাম — শরীর, খারাপ মানে? হাতটা পুড়ে টুড়ে যাবে নাকি? হাতে শক মারতে পারে কি না তাও জানার ইচ্ছে ছিল। ফিজিক্যালথেরাপি করতে এসে শক থেরাপি সহ্য করব না।

থেরাপিস্ট বলল, সে সব কিছু নয়। অনেকরকম রোগী আসে তো। কারও মাথা ঘোরে। কারও বুক ধড়ফড় করে। কারও নিঃশ্বাসের কষ্ট থাকে। বুড়ো বুড়িদের তো যখন তখন শরীর খারাপ হতে পারে। পনেরো মিনিট একা ঘরে শুয়ে হিট নেওয়ার সময় সকলকেই তাই ঘণ্টা ধরিয়ে দেয়।

বুঝলাম। এ সময় কেউ পটকে গেলে এই কোম্পানিও লাটে উঠবে। খাটে শুইয়ে গরম প্যাড ঠুসে দেওয়ার পরে তাই এত ব্যবস্থা। ঘরে মৃদু আলো জ্বেলে রেখে লোকটি চলে গেল। এখন পনেরো মিনিট অন্য ঘরে থেরাপি করাবে। এই অফিসে অন্তত পাঁচ ছ'খানা ছোট ঘর আছে। অনেক মেশিন টেশিন বসানো একটা হলও আছে। অফিসের রিসেপশন থেকে মহিলাদের হাসি গল্প ভেসে আসছে। শুয়ে শুয়ে সেঁক তাপ নিচ্ছি আর রেডিওর খবর শুনছি। হঠাৎ ঠুং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলাম। নিজে থেকে বাজাইনি। বাঁ হাতটা নাড়তে গিয়ে ঠুং করে বেজে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে থেরাপিস্ট ফিরে এল। যুবকের মুখে ব্যস্তসমস্তভাব। জিজ্ঞেস করল — কোথাও কষ্ট হচ্ছে?

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম — কোনও কষ্ট নেই। হাতটা সরাতে গিয়েছিলাম।

ছেলেটি হেসে ফেলল। বাকি সময়টা পাশে বসে গল্প করল। তারপর ফেট্টি খুলে দিল। আজকের মতো ছুটি, আবার পরশু আসব, জমাট স্কন্ধ না সারানো পর্যন্ত থেরাপি বন্ধ হবে না।

ফেরার সময় গাড়ি ব্যাক করতে গিয়ে মনে হল ব্যথাটাও ব্যাকগিয়ারে শিফট করেছে। মাথা ঘোরাতেই বাঁ দিকের ডানায় চিড়িক। এবং কী আশ্চর্য ডান হাতে নো ঝিলিক। ব্যথাটা সরতে সরতেই সারবে মনে হচ্ছে।

আমেরিকার চীনে খাবার

চীন আমাদের বেশ চিন্তায় ফেলেছে। এমন সব বিপজ্জনক খেলনাপাতি, টুথপেস্ট, ভেষজ ওষুধপত্র আর খাবার-দাবার রপ্তানি করেছে যে, আমেরিকার স্বাস্থ্য দপ্তর বলছে, প্রত্যেকটাই শরীরের ক্ষতি করছে। এ দেশে "ডলার স্টোর" হচ্ছে এক ডলারের দোকান। প্রত্যেক জিনিসের দাম এক ডলার। সস্তার সাত অবস্থা ভেবে আর কিছু না কিনলেও গ্রিটিংস কার্ড, উপহার মোড়ার রঙিন কাগজ, উপহার ভরে দেওয়ার জন্যে ঝলমলে কাগজের ব্যাগ, রান্নাঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্র, হাত ধোয়ার লিকুইড সাবান, ফ্রিজে খাবার রাখার জন্যে নানা মাপের প্ল্যাস্টিকের বাক্স—এ ধরনের জিনিস খুব সস্তায় কেনাই যায়। কিন্তু চীনের তৈরি টুথপেস্ট কিনে কয়েকজন খুব আক্কেল সেলামি দিয়েছে। মুখের ভেতর ঘা হয়ে অযথা ভোগান্তি। এ-তো গেল এক ডলারের দোকানের জিনিসের কথা। কিন্তু আমেরিকার নামকরা খেলনার দোকানের দামি খেলনাতেও অতিরিক্ত সিসা মেশানো রং মাখিয়েছে চীনেরা। "ম্যাটেল্" নামে আমেরিকার এই খেলনা কোম্পানির "আউট সোর্সিং-এর কুফল। লেড পয়জনিং-এর সম্ভাবনা বুঝে "ম্যাটেল" এখন ওইসব খেলনা দোকানে ফিরিয়ে নিচ্ছে। ক্রেতাদের দাম ফেরত দিচ্ছে। একই কাণ্ড হল কুকুর ও বেড়ালের খাবার নিয়ে। চীন থেকে রপ্তানি করা ডগ ফুড আর ক্যাট ফুড খেয়ে বেশ ক'টা কুকুর, বেড়াল মরে গেছে। একদল সময়মতো পশু হাসপাতালে গিয়ে বেঁচেছে। কী ব্যাপার? পরীক্ষা করে ধরা পড়ল এই টিনের খাবারের মধ্যে ইঁদুর ও পোকা মারার বিষ ছিল। উদ্দেশ্য রহস্যময়। মাঝখান থেকে একদল কেষ্টর জীব মরে গেল। এখন চীন থেকে

মাছ আমদানি বন্ধ। নিউইয়র্কের চায়না টাউনের কাঁচাবাজারে মাথাওয়ালা চীনা চিংড়ি বিক্রি হচ্ছে না। নিউ জার্সির হংকং মার্কেটেও চীনে মাছ চালান আসছে না। মাঝে মাঝে কোরিয়ান মার্কেটে মাছের বাজার করতে গিয়ে মাথাওয়ালা চিংড়ি কিনে আনি। আপাতত কিনছি না। ওই দোকান থেকেই চীনে কোম্পানির "টাইগার বাম" কিনেছিলাম। পাঁচ ডলারের মালিশের কৌটো থেকে পীত জাতির তৈরি পীত মলম হাঁটুতে লাগাতেই লংকাবাটার এফেক্ট হল। ব্যথা সারল না। চীনের টাইগার বাম! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা এড়াতে মলম আর হাঁটুতে মাখাইনি।

এখন চীনের প্রোডাক্ট নিয়ে প্রচুর সতর্কবাণী শুনছি। তবে আমেরিকার প্রোডাক্টের চীনে রেস্তোরাঁ যথারীতি রমরম করে চলছে। চাইনিজ ফুড আমেরিকানদের খাদ্যরুচির সঙ্গে এমন মিশে গেছে যে, বোধহয় এরকম কোনও শহর নেই, যেখানে অন্তত একটা চীনে রেস্তোরাঁ পাওয়া যাবে না।

বহু বছর আগে পেনসিল্‌ভানিয়ার পাহাড়ি এলাকায় হেজলটন নামে ছোট্ট শহরের হোটেলে ক'দিন ছিলাম। সেখানে ক্যাডবেরি কোম্পানির চকোলেট তৈরির প্ল্যান্ট ছিল। চারদিকে পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। এই গ্রামের মতো আধা শহরেও চায়না গার্ডেন খুঁজে পেয়েছিলাম। ডিনারে রোজ আমেরিকান রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়ার বদলে চাড্ডি ফ্রাইডের রাইসের লোভে চৈনিক উদ্যানে ঢুকে পড়েছিলাম। রান্না মোটামুটি। আমেরিকান চাইনিজ ফুড বলতে যেমন বোঝায়, সেরকম সাদামাটা। আমরা "স্পাইসি" বানাতে বললে একটু তরিবত করে দিত। তার সঙ্গে লাল লংকার তেল আর সয়া সস্‌ মিশিয়ে সেই পদাবলির পদোন্নতির চেষ্টা হত। আবার ফ্লোরিডার মায়ামিতে গিয়ে অন্যরকম চাইনিজ খেয়েছি। ওখানে প্রচুর কিউবান থাকে। ওরা ঝাল রান্না ভালোবাসে। সে জন্যেই বোধহয় মায়ামির চীনে রেস্তোরাঁর রান্নায় বেশ তেল, ঝাল থাকত। তবে চীনে সুখাদ্যের জন্যে নিউইয়র্ক, বস্টন, লস এঞ্জেলেস বা স্যানফ্রানসিসকোর চায়না টাউন হচ্ছে সেরা জায়গা।

আমেরিকায় প্রথম চীনে রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছিল ১৮৪৯ সালে। স্যানফ্রানসিসকো শহরে ওই রেস্তোরাঁর মালিক আর রাঁধুনি ছিল নরম্যান আশিং নামে একজন চীনে শ্রমিক। সে নিতান্ত জীবিকার প্রয়োজনেই নতুন কাজ শুরু করেছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচুর চীনে শ্রমিক এসেছিল। ওই রাজ্যে সে সময় এত কাজ হচ্ছিল যে, নতুন

আসা চীনেরা শ্রমজীবী হিসেবে ভালোই উপার্জন করছিল। কিন্তু সুসময় বেশিদিন থাকল না। চাকরির বাজার মন্দা হওয়ামাত্র তারাই প্রথম ছাঁটাই হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, নতুন মার্কিন আইন অনুযায়ী চীনেরা চাকরির বাজারে বিভেদের শিকার হল। চায়নাম্যানদের কেউ কাজ দিতে চায় না। একমাত্র রাঁধুনি হয়ে হোটেল, রেস্তোরাঁয় চাকরি পেতে পারে। কারণ ওই কাজটা সবাই করতে চায় না। চীনেরা দলে দলে রাঁধুনি হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে জমানো ডলার দিয়ে ছোট ছোট চীনে খাবারের দোকান খুলতে লাগল।

১৮৯০ সালের মধ্যে আমেরিকার দুই উপকূলের বড় বড় শহরে চীনে রেস্তোরাঁর ব্যবসা জমে উঠল। শ্রমিকরা এসেছিল প্রধানত চীনের ক্যান্টন প্রদেশ থেকে। দক্ষিণ চিনে ওই প্রদেশের রান্নার বিশেষত্ব আমেরিকানদের রসনার উপযোগী হবে কি না ভেবে, চীনে রাঁধুনিরা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল। চীনের সঙ্গে আমেরিকার খাদ্যরুচি মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন রান্না বানাল "চপ সুই"। উপকরণ হল মাংসের ছোট ছোট টুকরো, সবজি আর বিন স্প্রাউটের (মুগ ডালের বীজ ও কচি ডগা) ছোট ছোট অংশ। চপ সুই-এর মানে কুচানো মাংস আর সবজি মেশানো পদ। এমনও হতে পারে, সে সময় আমেরিকায় সফর করতে আসা একজন চীনে ভাইসরয়ের সম্মানে রাঁধুনিরা "চপ সুই" তৈরি করেছিল। যা-ই হোক, ওই অভূতপূর্ব উদ্ভাবন রীতিমতো ফল হল। আমেরিকানরা এত সস্তায় এরকম ভোজ কখনও খায়নি। একেবারে অচেনা-অজানা খাবার নয়। মাংস আছে, তরকারি আছে, সঙ্গে কচি কচি ডালের বীজ। তার ওপর স্বাদ, গন্ধও চমৎকার। চপ-সুইয়ের চাহিদা এমন বেড়ে গেল যে, শুধু ওই খাবার বিক্রির জন্যেই চীনেরা ছোট ছোট রেস্তোরাঁ খুলে ফেলল। তার নাম "চপ সুই হাউস" একই সঙ্গে চীনেরা বাজারে আনল চাওমিন, ডিমের ওমলেট ছড়ানো রান্না এগ ফু ইয়াং ও আরও নানারকম মুখরোচক পদ। মিষ্টিমুখের জন্যে দিল ফরচুন কুকি। চিনি আর ময়দা মেশানো ফাঁপা বিস্কুটের মধ্যে সরু এক চিলতে কাগজে ইংরেজিতে "ভাগ্য" লেখা আছে। তখন আমেরিকান সমাজ চীনের কালচার বলতে চীনে খাবারই ছিল প্রথম অভিজ্ঞতা। শিক্ষিত লোকেরা ইতিহাস, সংস্কৃতি বিষয়ে অবহিত থাকলেও অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের চীনে রান্নার দৌলতে চীনকে চিনল।

ব্যবসা জমিয়ে তোলার জন্যে চীনেরা তাদের রেস্তোরাঁর মেনু কার্ডেও

নতুনত্ব আনল। চীনের ট্র্যাডিশন্যাল রান্না কীভাবে আমেরিকানদের খাওয়ানো যায়? তেল, ঝাল, সবই তো খেতে শেখাতে হবে। তখন মেনু কার্ডে "ফ্যামিলি স্টাইল" লাঞ্চ আর ডিনার-এর পদ ছাপল। ওপরে "কলাম এ"। নীচে "কলাম বি"। দুই তালিকায় তিনটে করে রান্নার পদ লেখা। দুটো থেকেই যে কোনও একটা বা দুটো পদ বাছতে হবে। ওইরকম অর্ডার দিলে দামও কম পড়বে। "কলাম বি"-তে আছে অথেনটিক চীনে রান্না। তো, আমেরিকানরা তখন ফ্যামিলি স্টাইল নিতে শুরু করল। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের খাদ্যরুচির পরিবর্তন হতে লাগল।

আরও একটা বড় কাজ চীনেরা করে দেখিয়েছিল। তাদের তো বর্ণবৈষম্য মেনে চলার দায় ছিল না। তাদের রেস্তোরাঁয় উনিশ শতকের শেষাশেষি থেকেই কালো আর ইহুদিদের জন্য দরজা খোলা ছিল। সে সময় আমেরিকার বেশিরভাগ হোটেল, রেস্তোরাঁয় ওই দুই সম্প্রদায়ের লোকেদের ঢোকার অধিকার ছিল না। গোঁড়া ইহুদিদের খাওয়ার বিচার-আচার যেমনই হোক, অধিকাংশ ইহুদি তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। ফলে চীনের রেস্তোরাঁয় ইহুদিদের ভিড় বাড়তে লাগল। কালোরা তো ভীষণ ভোজনরসিক। মাছ, মাংস, কাঁকড়া, চিংড়ি, হাঁসের মাংস-চৈনিক সুখাদ্যে তারাও খুব মজে গেল। ইহুদিরা তখন থেকেই ক্রিসমাসের রাতে অনেকে সপরিবারে চীনে রেস্তোরাঁয় খেতে যেত। এখনও বহু ইহুদি পরিবার পঁচিশে ডিসেম্বর চীনে রেস্তোরাঁয় যায়।

এদেশে চীনে-আমেরিকান রান্নার চাহিদা সবচেয়ে বেশি বোঝা গেল ষাটের দশকের শেষদিকে। ১৯৬৫ সাল থেকে নতুন অভিবাসন আইন অনুযায়ী এশিয়ানদের ইমিগ্রেশন নিয়ে আসা শুরু হল। তখন শুধু ক্যান্টনের চীনে শ্রমিক নয়, উত্তর চীন থেকে হুনান্ সেচুয়্যান প্রদেশের লোকেরা দলে দলে আমেরিকায় চলে এল। আমেরিকায় নানা শহরে নতুন চীনে রেস্তোরাঁ চোখে পড়তে লাগল। কোনওটির নাম "সেচুয়ান গার্ডেন"। কোনওটির নাম 'হুনান প্যালেস"। তেল, ঝাল, আদা আর আস্ত শুকনো লংকা মেশানো সেচুয়ান চিকেন, হুনান পর্ক খেয়ে খদ্দেররা এমন স্বাদ পেল যে, 'ভ্যাদভেদে চপ সুই আর বিক্রি হয় না। চপ সুই হাউসগুলোই বন্ধ হয়ে গেল।

একে উত্তর চীন থেকে গরগরে রান্না নিয়ে রাঁধুনিরা চলে এসেছে। তার ওপর সারা আমেরিকা জুড়ে ইমিগ্র্যান্টের ভিড় বাড়ছে। আমাদের মতো নতুন আসা দক্ষিণ এশিয়ানরা তখন ছুটির দিনে নিউইয়র্কের ক্যানাল স্ট্রিটে

'চায়না টাউনে' চলে যাচ্ছি। নিউইয়র্কের কুইনস বরোতেও ততদিনে অনেক চীনে রেস্তোরাঁ খুলেছে। তবে সেখানে রান্নায় তখনও ক্যান্টনিজ আর আমেরিকান-চাইনিজ স্বাদই বজায় রেখেছিল। আমাদের তেমন পছন্দ হত না। যদিও রোজ রোজ রান্না করতে ইচ্ছে না হলে, পাড়ার চাইনিজ টেক-আউট-এ গিয়েই "মেক ইট স্পাইসি" বলে একটু মুখোরোচক রান্না নিয়ে আসতাম।

শুধু অভিবাসীপ্রধান রাজ্যগুলিতে নয়, দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের শহরগুলিতে গত ত্রিশ/চল্লিশ বছরে চীনে রেস্তোরাঁর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ৭১ সাল নাগাদ ইউটা রাজ্যে ২৮টি চীনে রেস্তোরাঁ ছিল। এখন সেখানে ২৬৩টি রেস্তোরাঁ হয়েছে।

কোথায় কী ধরনের খাবার পাওয়া যাবে, তাও নির্ভর করছে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের খাদ্যরুচির ওপর। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের চীনে রেস্তোরাঁয় হ্যামবার্গারও পাওয়া যায়। দক্ষিণের রাজ্যগুলির চীনে রেস্তোরাঁয় "ফ্রায়েড চিকেন ডিশের" কয়েকটি রান্না থাকে। কারণ, ওদিকে ভাজা মাংস খাওয়ার চল খুব বেশি।

ইদানীং আরও নতুন নতুন চীনে পদের উদ্ভাবন হয়েছে। মিশ্র পদ বা "ফিউশন"-এরও চাহিদা আছে। কিছুদিন আগে নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে চীনে রান্নার প্রদর্শনী হয়েছিল। সেখানে প্রায় দশ হাজার পদাবলির তালিকা দিয়েছিল। কানাডার এক তথ্যচিত্র পরিচালকের নাম চিউক কোয়ান। তিনি চীনে রেস্তোরাঁর বিষয়ে ছবি করার জন্যে তেরোটি দেশে গিয়েছিলেন। মরিশাসে গিয়ে দেখেছেন এক মহিলার চীনে ত্রিপদী রান্না বেশ চলছে। চীনে, ভারতীয় আর ক্রিয়োল রান্না মিশিয়ে নতুন পদ হয়েছে। কালো এবং ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সংস্কৃতির সমন্বয়ে শুরু হয়েছিল ক্রিয়োল কুইজিন। চিংড়ি, ঢেঁড়স, চাল, টম্যাটো, বড় বড় লাল ও ফিকে সবুজ লংকার টুকরোর সঙ্গে বিশেষ মশলা দিয়ে ওই ধরনের রান্না হতে। এখনও এ দেশের দক্ষিণে, বিশেষত লুইসিয়ানা অঞ্চলে ওই রান্নার খুব চাহিদা। মরিশাসের ওই মহিলা যে ফিউশন আবিষ্কার করেছেন, তার নাকি দারুণ আস্বাদ।

চাইনিজ আমেরিকান ফিউশন রান্নায় বিশেষ পারদর্শী মিং সাই নামে এক চীনে-আমেরিকান। ম্যাসাচুসেটস ওয়েলেসলি শহরে তাঁর রেস্তোরাঁর নাম "ব্লু জিন্‌জার"। মিং সাইকে একদিন টিভির পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিস

চ্যানেল দেখাল। ছোটবেলায় ওহায়োর একটি শহরে থাকতেন। যখন মিং-এর চোদ্দো বছর বয়স, ওর মা "ম্যান্ডারিন কিচেন" নামে রেস্তোরাঁ খুলেছিলেন। তার আগেও দিদিমাকে রান্নাঘরে সাহায্য করার জন্যে ছোট্ট মিং পিংপং টেবলের ওপর স্প্রিং রোল এর ময়দার লুচিগুলো গুটিয়ে দিতেন। তারপর মা যখন রেস্তোরাঁ খুললেন, মিং রোজ সকাল সাতটার সময় বড় বড় বাসনে প্রচুর ভাত রান্না করে চলে যেতেন। বিকেলের মা'র সঙ্গে রেস্তোরাঁয় গিয়ে "মুশু পর্ক" আর "সুইট অ্যাণ্ড সাওয়ার পর্কের" জন্যে শুয়োরের মাংসের ছোট ছোট টুকরো ভেজে দিতেন। ছুটির দিনে ঠেলাগাড়ি করে এগরোল নিয়ে রাস্তায় বিক্রি করতেন। মিং-এর বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ছোট্ট ঠেলাগাড়ির নকশা তৈরি করে দিয়েছিলেন। এভাবে মিং ছোট থেকে চীনে রান্নার কায়দাকানুন শিখেছিলেন। কিন্তু বাবার ইচ্ছে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে। পড়াশোনাতেও সে যথেষ্ট ভালো। মিং মেধার জোরেই ইয়েল্ ইউনিভাসিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু দুটো গরমের ছুটি প্যারিসে কাটাতে গিয়ে তাঁর মন বদলে গেল। প্যারিসে গিয়েছিলেন সামার কোর্সে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কিছু বিষয় পড়তে। কিন্তু রান্নাই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করল। মিং বুঝলেন ওই পেশাতেই তিনি আনন্দ পাবেন। ইয়েলের পড়া অসমাপ্ত রেখে কিউলিন্যারি কোর্সে ডিগ্রি নিলেন।

"ব্লু জিনজার"-এর রান্নার প্রশংসা ম্যাসাচুসেটস-এর অনেক কাগজেই বেরিয়েছে। চীনে, জাপানি রান্নায় ফরাসি আর আমেরিকান পদ্ধতি প্রয়োগ করে মিং সাই এশিয়ান ল্যাকার পসোঁ, শিয়াটেক-লিক ডাম্পলিং (মাশরুমের ডিমসাম বা ডাম্পলিং) নামে দারুণ সব মুখোরোচক পদ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর ধারণা আমেরিকায় চীনে খাবার জনপ্রিয়তা কোনও সাময়িক ঝোঁক নয় যে, কয়েক বছর বাদে লোকের আর পছন্দ হবে না। চীনে খাদ্য এখন আমেরিকানদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। এর চাহিদা যেভাবে বেড়ে চলেছে, ভবিষ্যতে চীনে রেস্তোরাঁয় সংখ্যা বোধহয় গুনে শেষ করা যাবে না।

এ দেশে ভারতীয়রা ইদানীং ইন্ডিয়ান-চাইনিজ রেস্তোরাঁর খাবারই বেশি পছন্দ করছে। গত দশ-বারো বছরে বেশ কিছু ভারতীয় রেস্তোরাঁর মালিক এক ব্যবসা ধরেছে। কেউ নর্থ-ইন্ডিয়ান রান্নার সঙ্গেই চীনে রান্না পরিবেশন করছে। কেউ পুরোপুরি চীনে রেস্তোরাঁর খুলেছে। চিলি চিকেন, চিলি ল্যাম্ব, মাঞ্চুরিয়ান ডিশ, প্যান ফ্রায়েড হাক্কা নুডল্স্ — এসব আগে কেউ রাঁধতেই

জানত না। এখন ইন্ডিয়ান চাইনিজ-এ চিকেন অ্যাস্প্যারাগাস স্যুপের মতো অনেক রান্না পাওয়া যাচ্ছে। একই রেস্তোরাঁয় কেউ থাই রান্নাও রাখছে। তবে থাই রান্না খাওয়ার জন্যে অথেনটিক থাই রেস্তোরাঁয় যাওয়া যায়। নিউইয়র্কে ম্যানহ্যাটনে "সুকোথাই" বহুকালের প্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁ। টেকসাসের হিউস্টনে থাই রেস্তোরাঁর রান্না দারুণ ভালো। বরং নিউজার্সিতেই সেরকম নামকরা থাই রেস্তোরাঁ ছিল না। এখন যেগুলো হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি রেস্তোরাঁর রান্না ভালো।

এখানে কেটারিং ও রেস্তোরাঁর ব্যবসায় "মুঘল" নামে একটি কোম্পানি অনেক বছর ধরে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য করেছে। হিলটন, ম্যারিয়ট, হায়াত, শেরাটনে ভারতীয়দের বিয়েতে "মুঘলের" কন্ট্র্যাক্ট বাঁধা। এখন অবশ্য আর দুটি কোম্পানি প্রতিযোগিতায় নেমে, "মুঘলের" কেটারিং ব্যবসার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে "মুঘলের" মালিক সতীশ মেহতানি আর তাঁর স্ত্রী স্নেহ মেহতানি সময় বুঝে "চীনে রেস্তোরাঁ" খুলে ফেলেছেন। নিউজার্সির ইসেলিনে ভারতীয় পট্টিতে প্রথমে খুলেছিল "মিং"। একেবারে ক্যালকাটা চাইনিজ। খেতে গিয়ে দেখি চীনে রাঁধুনি বাংলা বলছে। বাড়ি তার ট্যাংরায়। "মিং" ভীষণ চালু রেস্তোরাঁ। কিন্তু প্রতিযোগিতা কোথায় নেই? "মুঘলের"-ই এক পুরানো রাঁধুনি ফিরোজ অনেকদিন আগে মেহতানিদের ছেড়েছিল। সেও চীনে দাওয়াই দিল। "মিং" থেকে কয়েক মাইল দূরে সাউথ প্লেনফিল্ডে ফিরোজ খুলল "নানকিং"। সেখানেও এখন খুব ভিড় হচ্ছে। তবে মুঘলের সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত। তারা আমাদের এই উত্তর জার্সিতে মরিস টাউনে হায়াত রিজেন্সিতে দুটো নতুন রেস্তোরাঁ খুলে ফেলল। একটা "মেহেন্দি"। অন্যটার নাম "মিং টু"। গত ফেব্রুয়ারি মাসে চালু হয়েছে।

আমাদের মেয়ের বিয়ের সময় থেকে কেটারিং-এর সূত্রে মেহতানিদের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে। নতুন রেস্তোরাঁ খুললে চিঠি পাঠায়। এবার তাই "মিং টু"-তে খেতে গিয়েছিলাম। সতীশ মেহতানি নিজেও সেদিন ছিল। দেখলাম আমেরিকান খদ্দেরই বেশি। খেতে বসে অ্যাপেটাইজার হিসেবে সিঙ্গাপুরি ফ্রায়েড ডাম্পলিং অর্ডার দিলাম। বিবরণ পড়ে মনে হল চিকেন আর চিংড়ি মেশানো বড়াগুলো ভালো হবে। নিয়ে আসা মচমচে চেহারা পছন্দও হল। কিন্তু খেয়ে দেখি এক্কেবারে উচ্ছের বড়া। করলার চপও বলা যায়। চিংড়ি তেতো হয়? বিষাক্ত চীনে চিংড়ি চালায়নি তো? ওয়েটারকে

ডেকে বলতে, সেও অবাক। প্লেট ফিরিয়ে নিয়ে গেল। একটু পরে সতীশ মেহতানি এসে হাজির। তার পেছনে ওয়েটার এক প্লেট বড় বড় চাইনিজ ফ্রায়েড চিংড়ি নিয়ে এসেছে। আবার চিংড়ি? সতীশ আশ্বাস দিল — নির্ভয়ে খাও। চিংড়ির দোষ নেই। কিচেনে গিয়ে ফ্রায়েড ডাম্পলিং তেতো হওয়ার কারণটা ধরতে পারলাম। ব্যাটারের মধ্যে বেকিং পাউডার বেশি ঢেলেছিল। নিজে চেখে দেখে বুঝতে পারলাম। ভাগ্যিস তোমরা বলেছিলে। আমেরিকানরা হয়তো ভাবত সিঙ্গাপুরি ডাম্পলিং একটু তেতো হয়। দ্বিতীয়বার অর্ডার দিত না। তোমার জন্যে কি নতুন ব্যাটার মাখিয়ে ভাজিয়ে দেব।

রাজি হলাম না। ইন্ডিয়ান-চাইনিজের মেন-ডিশ খাওয়ার জায়গা রাখছি। সিঙ্গাপুরি, মর্তমান কিছুই চাই না। কিন্তু "মিং টু"-র রান্না যতটা মুখরোচক আশা করেছিলাম, ঠিক তেমনি লাগল না। আসলে এ অঞ্চলে আমেরিকান কাস্টমারই বেশি। "হায়াতের" ভেতর রেস্তোরাঁ খোলায় বোধহয় একটু ফিউশনের দিকে গেছে। এর চেয়ে এডিসনের কাছে ইসলিনের "মিং" এর রান্নায় বম্বে, কলকাতার চীনে রান্নার আসল স্বাদ পাওয়া যায়। একই মালিক, অথচ স্থানীয় লোকেদের রসনা অনুযায়ী দু'ভাবে চাইনিজ রাঁধছে। নাঃ এরপর ক্যালকাটা চাইনিজ খাওয়ার জন্যে "মিং" নয়তো ফিরোজের "নানকিং"-এ যাব। কোনওটাই কাছে নয়। মিং অন্তত চল্লিশ মাইল। "নানকিং" আরও দূরে, তবু কলকাতার চেয়ে কাছে।

পঞ্চাশোর্ধে গৃহবিচ্ছেদ

ঘর-সংসার ছেড়ে বনজঙ্গলে নয়, পঞ্চাশোর্ধে বিবাহ বিচ্ছেদ কারও কারও কাছে মুক্তির উপায় বলে মনে হচ্ছে। এবং এ সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময় মহিলারাই নিচ্ছেন অথবা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আমেরিকায় মধ্যবয়স্ক দম্পতিদের বিবাহবিচ্ছেদের হার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এদেশে বাঙালি সমাজেও এরকম ঘটনা ঘটছে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, টেকসাস, ক্যালিফোর্নিয়া, যেখানেই যাওয়া যাক, পঞ্চাশ বছর বয়েসে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্ন দম্পতির বক্তিগত মতামত জানা যাক।

নিউজার্সির ডাঃ চন্দনা ব্যানার্জি মধ্য চল্লিশে বিয়ের পাট চুকিয়ে দিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত একাই আছেন। চন্দনার বক্তব্য—তেইশ বছরে বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর সঙ্গে বয়েসের বেশ তফাত ছিল বলে প্রথম প্রথম সমীহ করে চলতাম। কিন্তু তখন থেকে বুঝেছিলাম আমাদের মানসিকতা একেবারে আলাদা। ক্রমশ দেখলাম, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও দাম নেই। স্বামী সব ব্যাপারে দাবিয়ে রাখতে চাইছেন। আমার চেহারা, চালচলন কিছুই তাঁর পছন্দ নয়। আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। রাগ বা ঝগড়াঝাঁটি করতাম। সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু তখন আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। নিজেও আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী ছিলাম না। তাই বাচ্চাদের কথা ভেবে অশান্তি সত্ত্বেও বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না। আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। ভাবতাম ডিভোর্সের পরে বাচ্চাদের জন্যে অ্যালিমনি পেলেও, ওদের বাবার অভাব পূর্ণ করতে পারব না। এতে ওদের ক্ষতি হবে। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। কিন্তু

মনে মনে জানতাম এ সম্পর্কে টিকবে না। ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে এত বছর স্বামীর সঙ্গে ছিলাম। ওরা বড় হওয়ার পরে ডিভোর্সের ব্যাপারে মনস্থির করে স্বামীকে জানালাম। তিনি অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। আমি ভুল করেছি বলে সাবধান করেছিলেন। কিন্তু বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারেননি। এখন আমি অনেক শান্তিতে আছি। সারাসপ্তাহ ডাক্তারি করি। ছুটির দিনে গান-বাজনা, নাটকের রিহার্সাল, গল্প-কবিতাপাঠের আসর। আমার বাড়িতে আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া, হইচই লেগেই থাকে। ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যেমন ভালো, আমার সঙ্গেও তাই। সিঙ্গল মহিলা হিসেবে আমার কোনও নিঃসঙ্গতাবোধ নেই। নিজের প্রফেশন, বন্ধুবান্ধব, ছেলেমেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনি নিয়ে খুব ভালো আছি।

চন্দনার স্বামী দেবব্রত ব্যানার্জি ডিভোর্সের বছর দুই পরে একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব বাঙালি বিধবাকে বিয়ে করেছেন। আগের বিয়ে ভাঙা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এরকম — আমি ইনট্রোভার্ট স্বভাবের মানুষ। চন্দনার উচ্ছলতা ধীরে ধীরে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। ছেলেমেয়েরা যখন ছোট, নিউইয়র্কের এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার হল। অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। সে সম্পর্ক যদি-বা ভাঙল, আরও এমন কিছু ব্যাপার ঘটল যে, সংসারে শান্তি বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। পার্টিতে ড্রিংক করে ও এমন কথাবার্তা বলত, আমার খারাপ লাগত। হতে পারে, স্বামী হিসেবে আমাকে ওর পছন্দ হত না। আমার পক্ষেও সেটা জেনে জোর করে বিয়ে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল না। তাই ডিভোর্স মেনে নিলাম। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আগের মতোই দেখাশোনা হয়।

টেকসাসের প্রবুদ্ধ আর ঝরণার বিয়ে ভাঙল তাঁদের পঁচিশ বছরে বিবাহবার্ষিকীর পরের বছর। ঝরণাই ডিভোর্স চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য—বহু বছর অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত পারলাম না। আমেরিকায় বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্ত কম স্যাক্রিফাইস করিনি। প্রবুদ্ধর আজ চাকরি আছে, তো কাল নেই। এরকম আনসার্টেনটির মধ্যে বাচ্চাদের ফেলে রেখে আমাকে চিরকাল চাকরি করতে হয়েছে। ইচ্ছে না থাকলেও উপায় ছিল না। প্রবুদ্ধর বাড়ির লোকজন আমেরিকা বেড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যেই মা-বাবাকে প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে আনতে চাইতাম, তখনই একটা সমস্যা তৈরি হত।

ঠিক যেন সময় বুঝে ওর চাকরি চলে যেত। জানি, এটা ওর ইচ্ছাকৃত ছিল না। কিন্তু যে স্বামীর ওপর নির্ভর করা যায় না, তার যদি আবার সন্দেহবাতিক থাকে, তাহলে অসহ্য মনে হয় না? ছেলেদের মানুষ করতে হবে বুঝে বেশি প্রতিবাদ করতাম না। সবাই আমার চেহারার প্রশংসা করে। পুরুষরা পার্টিতে একটু বেশি মনযোগ দেয় — এসব ভেবে প্রবুদ্ধ আমাকে সন্দেহ করত। অথচ তখন আমার কোনও প্রেমিকও ছিল না। যখন সেরকম একজন বাঙালি পুরুষকে পেলাম, ভাবলাম এবার নিজের মতো করে সংসার করব। ছেলেদের সব কথা জানালাম। তারপর প্রবুদ্ধকে ডিভোর্স করে দীপককে বিয়ে করেছি। এত কমপ্যাশনেট স্বভাব ওর, মনে হয় কেন আরও আগে আমাদের দেখা হয়নি।

প্রবুদ্ধ ইন্টারনেটে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখে ষাট বছর বয়েসে শিকাগোর এক ডিভোর্সি মহিলাকে বিয়ে করেছে। খুব ঘটা করে বিয়ে হয়েছে ইন্টারনেটে ওদের "শুভবিবাহের" ওয়েবসাইটে শুভদৃষ্টি, মালাবদল, পাণিগ্রহণের ছবি-টবি বহু লোক দেখেছে। প্রবুদ্ধও দাবি করেছে — এমন বউটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...

পেনসিলভ্যানিয়ার সোনালী মিত্রও শেষ পর্যন্ত চণ্ডাল রাগী স্বামীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে পালিয়ে গেলেন। ডিভোর্স হয়েছে খবর পাইনি। তবে তিন ছেলেমেয়েই মার স্বপক্ষে। দীর্ঘদিন স্বামীর কাছে থেকে মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে করতে সোনালী শেষে পলাতকা হয়েছেন। মা কোথায় আছে, ছেলেমেয়েরা জানলেও বাবাকে টের পেতে দেয়নি। তবে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে সোনালীকে তো এবার সম্মুখ সমরে নামতে হবে। ছেলেমেয়ে আর উকিলের ভরসায় সাহস করে এগিয়ে আসবেন বলে শোনা গেছে।

প্রায় এরকম পরিস্থিতিতেই আমেরিকান মহিলা জেন বারোস্ আর হলি স্মিথ তাঁদের স্বামীকে ছেড়েছিলেন। জেন পঞ্চাশ বছরে ডিভোর্স করেছিলেন। এখন তাঁর আটান্ন বছর। একা থাকার মধ্যে যে কোনও আনন্দ নেই, তা স্বীকার করেও জেন বলেছেন — স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারছি, এটাই বড় কথা।

আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ দম্পতি আছেন, যাঁরা "আমৃত্যু পাশে থাকার" অঙ্গীকার মেনে বিয়ে রজতজয়ন্তী ছাড়িয়ে সুবর্ণজয়ন্তীও পার করেছেন। সুদীর্ঘ সুখী দাম্পত্যজীবনের উপকারিতা বিষয়ে তর্কেরও সুযোগ নেই। তবু

পঞ্চাশোর্ধ্ব দম্পতিদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটছে কেন? বিয়ে ভাঙার বিশেষজ্ঞ তথা উকিলদের ধারণা — এঁরা ভবিষ্যৎ সুখের আশায় এ কাজ করছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ সুখ মানে কী? জীবনের অর্ধেক পার করে দিয়ে কত দীর্ঘ ভবিষ্যৎ আশা করছেন এঁরা?

আসলে, লোকের পরমায়ু তো বেড়ে যাচ্ছে। লোকে যত দীর্ঘায়ু হবে, তার ভবিষ্যৎও সেরকম লম্বা হবে। সেই হিসেবমতো এদেশের লোকেদের পঞ্চাশ বছরের পরেও ভোগসুখের জন্যে হাতে ভালোই সময় থাকে। তাহলে তার সদ্ব্যবহার করবে না কেন? স্বামীর বদ-ব্যবহার বা স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য না করে তারা নবজীবনের গান গাইবে। প্রায় বারোশো পুরুষ ও মহিলাকে নিয়ে একটি গণসমীক্ষা হয়েছিল। এঁদের বয়েস ৪০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। এঁরা সকলেই ডিভোর্সি। কেউ চল্লিশের ঘরে, কেউ পঞ্চাশ থেকে ষাটের কোঠায় পৌঁছে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। সমীক্ষায় জানা গেছে — এঁরা সবাই পরবর্তী জীবনের অপেক্ষাকৃত সুখ-শান্তি পেয়েছেন সেইসঙ্গে একটি ভুল ধারণাও দূর হয়েছে। তা হল ওই বয়সে গভীর প্রেম হয় না।

ওই বারোশোজনের মধ্যে ৬৬% মহিলা ডিভোর্সের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তুলনায় পুরুষদের মধ্যে ৪১% ঘর ভেঙেছেন। পুরুষরা নাকি আগে থেকে স্ত্রীর মনের পরিবর্তন বা আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা বুঝতেই পারেন না। মেয়েরা ঠিক বোঝেন, কখন ভাঙনের ঢেউ আসছে। চৌত্রিশ বছর ধরে বিবাহিত এক ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন সকালে শুনলেন বউ ডিভোর্স চায়। ডিভোর্স দেওয়ার পর দশ বছর বাদে তিনি বলেছেন — সত্যি তো কেউ আর রাতারাতি ডিভোর্স চায় না। আগের বউ নিশ্চয়ই অনেক দিন ধরে ঠিক করেছিল আমার সঙ্গে থাকবে না। আমিও যে একটু-আধটু সন্দেহ করতাম না তা নয়। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার বেশি মাথায় ঢোকেনি। বউই আক্কেল দিয়ে চলে গেল।

দাম্পত্য অশান্তির পরিণতি যে কী হতে পারে, মেয়েরা তার পূর্বাভাস পায়। ডেনভার ইউনিভার্সিটির "সেন্টার ফর ম্যারিট্যাল অ্যান্ড ফ্যামিলি স্টাডিজ" এর পরিচালক ডঃ হাডওয়ার্ড মার্কম্যান বিয়ের সাফল্য সম্পর্কে বই লিখেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ হচ্ছে মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে, কখন দু'জন মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। যেমন — দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা কমে যাওয়া। ক্রমশই মতবিরোধ বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় আসে, যখন

কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ করে রাগের মাথায় সচরাচর কেউ বিয়ে ভাঙে না। অনেকদিনের ক্ষোভ, অভিমান, রাগ, দুঃখ জমা হতে হতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুর্ভেদ্য দেওয়াল উঠে যায়। বিচ্ছেদের সূচনা হয়। তারপরেও দ্বিধা, দ্বন্দ্ব থাকে। ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে। যে মহিলাদের নিজস্ব কেরিয়ার এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা থাকে, তারা বেশিদিন তিক্ত সম্পর্কের জের টানতে চায় না। পঞ্চাশের ঘরের মহিলারা এই ধরনের পরিস্থিতিতে ডিভোর্স নিতে দেরি করে না। কিন্তু যাদের প্রফেশনাল কেরিয়ার নেই, আর্থিক অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তা আছে, তারা বাধ্য হয়েই আপস করে। ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে গেলে, তখন ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নেয়।

ছোট ছেলেমেয়েরা একদিকে যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য বন্ধন সুদৃঢ় করে, অন্যদিকে তাদের পিছুটানই অনেক সময় অসফল, অসুখী বিবাহ সম্পর্ককে বছরের পর বছর জোড়াতালি দিয়ে রাখে। ভাঙা সম্পর্ক জোড়া তো লাগেই না। উপরন্তু স্বামী-স্ত্রীকে অশান্তি সহ্য করেও একসঙ্গে থাকতে হয়। বিবাহবিচ্ছিন্ন পুরুষদের ৫৮% এবং মহিলাদের ৩৭% বলেছেন — ডিভোর্সের আগে শুধুমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে তাঁরা পাঁচ-সাত বছর অপেক্ষা করেছিলেন। পুরুষরা সাধারণত আরও একটি কারণে বিয়ে ভাঙতে চান না। তা হচ্ছে — আধুনিক যুগেও "বিবাহ বিচ্ছেদ"-কে তাঁরা স্বামী হিসেবে ব্যর্থতা বা পরাজয়ের ঘটনা বলে ভাবেন। অধিকার হারানোর ভয়ও থাকে। মেয়েরা আগে ভাবেন আর্থিক নিরাপত্তার কথা। সেই অনিশ্চয়তা থাকলে ডিভোর্সের ইচ্ছে সত্ত্বেও সংসার ভেঙে চলে যেতে ভরসা পান না।

তবে সব সময় তো পরিকল্পনামাফিক জীবন চলে না। পঞ্চাশোর্ধ্ব ডিভোর্সিদের মধ্যে প্রতি চারজন পিছু একজনের (ডিভোর্সের সময়) নাবালক সন্তান ছিল। জ্যাক মার্টিন নামে একজন বলেছেন — তখন শুধু চিন্তা হত আমাদের পারিবারিক বিচ্ছেদের জন্যে ছোট মেয়েটার কত ক্ষতি হয়ে গেল। তার ওপরেই সব থেকে বেশি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ওর শিশু-মনের ওপর এত চাপ পড়েছিল যে, ছোট থেকে মনমরা হয়ে থাকত। ভয় হয়, ওর ভবিষ্যৎ জীবনেও হয়তো এর প্রভাব পড়বে।

ডিভোর্সের সঙ্গে ছেলেমেয়ের অধিকার হারানোর আশঙ্কা পুরুষেরই বেশি থাকে। এজন্যে তাঁরা ডিভোর্সে রাজি হতে চান না। মায়েদের

পিছুটানের সমস্যা কম। কারণ তাঁরা ধরেই নেন, ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব বা অধিকার মাকে দেওয়া হবে। এবং তাই ঘটে। যে কোনও বয়সে ডিভোর্স হোক না কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদের সে অধিকার দেওয়া হয় না। আদালত সাধারণত মাকেই সন্তান পালনের দায়িত্ব দেয়। ওই সমীক্ষায় ৪২% পুরুষ বলেছেন — ডিভোর্সের পরে তাঁদের প্রধান ভয় ছিল, হয়তো ছেলেমেয়েদের আর ফিরে পাবেন না। যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। সে তুলনায় ১৫% মহিলা ওই ধরনের আশঙ্কায় ছিলেন। আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবার সঙ্গেই ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার সুযোগ কমে যায়। একেকটি বিবাহবিচ্ছেদের ফলে পুরুষই সাধারণত সন্তানের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হন।

এদেশে বিয়ে নিয়ে নানা গবেষণা হয়। এরকম একটি গবেষণা সংস্থার নাম 'রেলেশনশিপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট"। তাদের গবেষণা থেকে জানা গেছে — পঞ্চাশোর্ধ্ব লোকেদের মধ্যে তাদেরই বিবাহ বিচ্ছেদ বেশি হয়, যাদের প্রথম জীবনেও একেবার বিয়ে ভেঙেছিল। অর্থাৎ এরা মধ্য বয়েসে দ্বিতীয়বার ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিতেও দেরি করে না। প্রথমবারের অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি চায় না।

চাকরি বা কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরে অনেকের দাম্পত্য অশান্তি বাড়ে। এও মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া খবর। "সেন্টার ফর দ্যা ফ্যামিলি ইন ট্র্যানজিশন" নামে সংস্থার পরিচালক জানাচ্ছেন — অবসরজীবন শুরু হল মানে স্বামী, স্ত্রীর প্রাত্যহিক রুটিন বদলাতে হবে। এই পরিবর্তনটাই সমস্যার সৃষ্টি করে। যতই ঘনিষ্ঠতা থাক, চব্বিশ ঘণ্টা গায়ে গায়ে থাকতে গেলে দুজনকেই কিছু অভ্যাস বদলাতে হয়। যে অবসর নিয়েছে, তার সুবিধের জন্যে অন্যজন কেন ইচ্ছেমতো চলতে পারবে না? শুরু হয় ছোটখাট ঝগড়া দিয়ে। খিটিমিটি বাড়তে বাড়তে তুমুল অশান্তি বেধে যায়। আবার এমনও দেখা গেছে, বাড়ির ছোট ছেলে বা মেয়ে যখন চাকরি নিয়ে দূরে চলে গেল, সেই শূন্যতাবোধ থেকে স্বামী, স্ত্রীর মনমেজাজ খারাপ হতে থাকে। সন্তানকে কেন্দ্র করে একটি যৌথ জীবন ছিল। সে না থাকতে হাতে কাজ নেই বলে বিরক্তি আসে। তুচ্ছ কারণে ধুন্ধুমার লেগে যায়। তবে মধ্য বয়েসে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হিসেবে শুধু এইসব অশান্তিই যথেষ্ট নয়। আগে থেকে সমস্যা শুরু হয়। পরে পরিস্থিতিগুলি তার ইন্ধন জোগায়।

পঞ্চাশোর্ধ্ব বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলাদের বক্তব্য — প্রধানত তিনটি কারণে তাঁরা ডিভোর্স নিতে বাধ্য হয়েছেন — (১) শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন। (২) স্বামীর অন্য মহিলার প্রতি আসক্তি। (৩) স্বামীর ড্রাগ অথবা অ্যালকোহলের নেশা। ডিভোর্সের জন্যে প্রাক্তন স্বামীদেরই তাঁরা দায়ী করেছেন। ওই তিনটির মধ্যে এক বা একাধিক পরিস্থিতিতে পড়লে শান্তিতে সংসার করা সম্ভব নয়। সুতরাং ডিভোর্স নেওয়া ছাড়া উপায় কী?

অন্যদিকে এই বয়েসি ডিভোর্সি পুরুষরা জানিয়েছেন — আমাদের মধ্যে ভালোবাসা ফুরিয়ে গিয়েছিল। কেউ মনে করেন — স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মূল্যবোধের সংঘাত আর দুজনের জীবনযাত্রার ধরন আলাদা হওয়ার ফলে একসঙ্গে থাকা সম্ভব হয়নি। তবে একদল পুরুষ সোজা স্বীকার করেছেন — সব দোষ আমার। নিজের স্বভাবদোষে বউ হারিয়েছি।

একটি বিষয়ে কিন্তু দুপক্ষই পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপান। সে হচ্ছে বিবাহবহির্ভূত প্রেম ভালোবাসা বা সাময়িক অ্যাফেয়ার। এ দোষ কেউ নিজের ঘাড়ে নিতে চান না। পঞ্চাশোর্ধ্ব ডিভোর্সিদের মধ্যে যাঁদের ওই কারণের বিয়ে ভেঙে গেছে, তাঁদের মধ্যে ৯৩% মহিলার অভিযোগ — স্বামীর বাইরে অ্যাফেয়ার ছিল। তুলনায় ৭৮% পুরুষ স্ত্রী বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন। তবে এক্ষেত্রে সত্যাসত্য বিচার করা কঠিন। হয়তো মিথ্যে সন্দেহ থেকে অশান্তি শুরু হয়েছি। হয়তো স্বামী বা স্ত্রী কেউ নিজেই বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে অকারণ অন্যজনকে দায়ী করেছিলেন। এমনও ঘটতে পারে — বছরের পর বছর উপেক্ষা, নিরাসক্তি, অবহেলা সহ্য করতে করতে স্বামী বা স্ত্রী ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তখন বাইরের কেউ আগ্রহ দেখালে, সঙ্গ দিতে চাইলে তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। এভাবেই নারী, পুরুষ বাইরে তাঁর "বন্ধু" খুঁজে নিতে চেষ্টা করেন।

সাধারণত পুরুষদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ শোনা যায়। পলিগ্যামি বা একাধিক নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করা যে পুরুষের একান্ত প্রবণতা, প্রচলিত এই বিশ্বাস এখনও আছে। এর একটি কারণ — পুরুষ চিরকাল দীর্ঘ সময় ঘরের বাইরে থেকেছে। কর্মসূত্রে একা দেশে-বিদেশে ঘুরেছে। সমাজের রক্তচক্ষুর বাইরে থেকে অন্যান্য স্বাধীনতার মধ্যে যৌনস্বাধীনতাও গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের বাইরে "অবৈধ" সম্পর্কের আকর্ষণ পুরুষকে বারেবারেই বহুগামী করেছে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে সে সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই একুশ শতকে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ তাদের প্রতিও আনা হচ্ছে। কারণ, তারা শিক্ষা ও উপার্জনের জন্যে বাইরের জগতে পৌঁছে গেছে। আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ তাকে অধিকার-সচেতন করেছে। কর্মজীবনে পুরুষের সাহচর্য ভালো লাগছে। এ অবস্থায় বিবাহিত জীবনে শান্তি অশান্তি যাই থাক, "অ্যাফেয়ার"-এর সুযোগ পুরুষের মতোই সমান সমান থাকছে। এবং তারাও বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। ইদানীং বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় মেয়েরাও কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বিবাহিত পুরুষের প্রতি তীব্র আকর্ষণে নিজের ঘর-সংসার এবং প্রেমিকের সংসার ভেঙে দিতে দ্বিধা করছে না।

প্রেম কিন্তু সব বয়সেই নীরবে চলে আসে। বিবাহবিচ্ছেদের পরে বয়স্ক লোকেদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই। পঞ্চাশের ঘরে পৌঁছানো ডিভোর্সি মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন বিবাহবিচ্ছেদের দু-তিন বছরের ভেতর মনের মতো একজন পুরুষ খুঁজে পেয়েছেন। বিয়ে যে করতে হবে, তার কোনও মানে নেই। হয়তো প্রয়োজনও নেই। নিঃসঙ্গতা দূর হয়েছে প্রিয় বান্ধবের সঙ্গে সুন্দর সময় কেটে যাচ্ছে — এতেই তাঁরা খুশি। ওদিকে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৮১ জন মধ্যবয়েসেও একাধিক বান্ধবী পেয়েছেন। তাদের মধ্যে যার সঙ্গে গাঢ় মনমৌজি হয়েছে, তাকে বিয়ে করেছেন। আর এই যে "ডেট করা" বা খোঁজাখুঁজি, তার জন্যে সকলেই যে ডিভোর্স পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন তাও নয়। নারী-পুরুষ মিলিয়ে শতকরা ২৬ জন আগেভাগেই তা শুরু করে দিয়েছিলেন।

বিবাহবিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা যে সুখের নয়, তার সঙ্গে গভীর মনোবেদনা, হতাশা, অভিযোগ, অনুতাপ জড়িয়ে থাকে — এ সত্য সকলেই অনুভব করেছেন। অথচ এ আঘাত ও মানসিক চাপে নারী-পুরুষের প্রতিক্রিয়া কিন্তু সমান হয়নি। পঞ্চাশোর্ধ্ব পুরুষদের প্রতি চারজন মধ্যে একজন চটপট যৌনসঙ্গী খুঁজে নিয়েছেন। জীবনের ব্যর্থতা ভুলতে সেক্সই নাকি উপযুক্ত থেরাপির কাজ করেছে। এছাড়া মদ্যপানেও দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মহিলারা বলেছেন অন্য কথা। ডির্ভোসের পরে বিষাদের হাত থেকে, মুক্তি পাবার জন্যে তাঁরা ঘরে-বাইরে নানা কাজকর্মে জড়িয়ে থেকে, স্বাস্থ্যচর্চা করে, যোগব্যায়ামের ক্লাসে গিয়ে শরীর ও মনের অবসাদ দূর করতে চেয়েছেন। একদিকে নারী ও সুরা, অন্যদিকে কাজকর্মে ডুবে থাকা আর

যোগব্যায়াম। পুরুষ আর মহিলারা মধ্যবয়েসে বিবাহবিচ্ছেদের কষ্ট ভুলতে যে যার থেরাপি খুঁজে নিয়েছেন।

পুনর্বিবাহের সিদ্ধান্ত কারা আগে নেয়? বিবাহবিচ্ছেদ অনেক মহিলাকে মুক্তির সন্ধান দেয়। দীর্ঘ দিনের অশান্তি, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়ে তারা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে। এই যে নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পাওয়া, স্বাধীন জীবনযাপনের আগ্রহ, এ থেকেই সে জোর খুঁজে নেয়। ভাবে একলা থাকা কোনও সমস্যা নয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব ডিভোর্সি মহিলাদের ৪৩% বলেছেন আর বিয়ে করার কথা ভাবছি না। এক বিয়েতেই শখ মিটে গেছে। আবার কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। পুরুষদের মধ্যে ৩৩% এই কথাই বলেছেন।

সংকটের মুহূর্তে বন্ধুবল না থাকলে মোকাবিলা করা কঠিন হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বন্ধুবল বা সাপোর্ট সিস্টেম তার ডিভোর্সের সময় খুবই সহায়তা করে। সাংসারিক অশান্তি, বিয়ে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা মেয়েরা অনেক আগে থেকে বন্ধুদের জানায়। বুদ্ধি, পরামর্শ চায়। ফলে সমব্যথীরা পাশে থেকে সাহায্য করে। অন্যদিকে পুরুষ নিজের পারিবারিক সমস্যার কথা বাইরে আলোচনা করতে চায় না। তার অহংবোধ বাধা দেয়। মেয়েদের মতো বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলার প্রবণতা পুরুষের থাকে না। যেজন্যে, ডিভোর্সের পরে সে একাই মনের ভার বহন করে। অর্থাৎ, তার ক্ষেত্রে বন্ধুদের সাপোর্ট সিস্টেম সেভাবে কাজ করে না। নিঃসঙ্গতার দুঃখ, সাংসারিক বিপর্যয়, সব কিছু মিলিয়ে পুরুষ বেশ অসহায় বোধ করে দেখা গেছে, পঞ্চাশোর্ধ্বে ডিভোর্সের পর মেয়েদের তুলনায় তিন গুণ হারে পুরুষরা পুনর্বিবাহ করে।

এসব সত্ত্বেও যারা মধ্যবয়েসে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের ৭০%-এর ধারণা তারা ঠিক কাজই করেছে। যেমন নিউজার্সিতে ডাঃ চন্দনা ব্যানার্জি। তাঁর মনে হয় সময় থাকতে ডিভোর্স নেওয়ার ফলে জীবনকে অনেক বেশি উপভোগ করতে পারছেন। বিয়ে ভাঙার জন্যে কোনও অনুতাপ নেই। তাঁর দু-একজন পুরুষ বন্ধু আছে। তবে বিয়ে করার মতো সম্পর্ক নয়। মহিলা বন্ধুদের একটি বিরাট দল আছে। তাদের সঙ্গে চন্দনা বছর বছর "বঙ্গ সম্মেলনে" যান। নিউইয়র্কে ব্রডওয়ে শো দেখতে যাওয়া, দেশি-বিদেশি ক্ল্যাসিক্যাল গানের আসরে যাওয়া, বারোয়ারি সরস্বতীপুজোয়

ঠাকুরের ভোগ রেঁধে দেওয়া — চন্দনা সদাব্যস্ত। এছাড়া ডাক্তার হিসেবে সারাসপ্তাহের কাজের চাপ তো আছেই। সেদিক থেকে ওঁর সিঙ্গল লাইফ স্টাইল-এ অভ্যাস হয়ে গেছে। বিয়ে করে আর বিড়ম্বনা বাড়াতে চান না।

কিন্তু স্বামী যখন মধ্যবয়েসে নব প্রেমজালে জড়িয়ে তিরিশ বছরের বিবাহিত সম্পর্ক ভেঙে দেন, সেই সিদ্ধান্ত কি স্ত্রীর পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ? বাধ্য হয়ে একক জীবনে ফিরে যেতে হয়। মেরিল্যান্ডের সুমিতা সেন এখন বাহান্ন বছর বয়েসে একটি অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকেন। স্বামী বিয়ে করেছেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রীকে। সুমিতাকে ওর মেয়ে বস্টনে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চায়। সুমিতা এখনও ধাতস্থ হতে পারছেন না। স্বামীর মতিগতি বুঝেও সহজে সংসার ভাঙতে চাননি। ভেবেছিলেন দু'দিনের মোহ কেটে যাবে। শেষ পর্যন্ত সুমিতাকেই নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে হল। বিবাহবিচ্ছেদ মানে পরাজয়? লজ্জা? নাকি প্রাত্যহিক প্রবঞ্চনা আর অসম্মানের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া? সুমিতাকে এই দ্বিতীয় কথাটা তাঁর মেয়ে বোঝাতে পারছে না।

সারমেয় পরীক্ষক

কলকাতায় পরাশর রোডে থাকতেন পশুরোগের ডাক্তার গীতা ত্রিবেদী। মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে রোগী দেখতে আসতেন। ভীষণ তেজস্বী কুকুর গামার অসুখ বিসুখ করলে গীতা ত্রিবেদীকে নিয়ে আসা হত। ডাকসাইটে গামা তাঁকে এমন তেজ দেখাত যে আমরা লজ্জা পেতাম। কিন্তু তিনি তার মুখে জালের টুপি পরিয়ে, মাটিতে পেড়ে ফেলে পরীক্ষায় বসতেন। দরকার হলে ইঞ্জেকশনও দিয়েছেন। একবার বাড়ির গন্ধরাজ গাছে মৌমাছির মস্ত মস্ত দুটো চাক হয়েছিল। মশাল জ্বালিয়ে চাক ভাঙা দেখে গামা ভারী উত্তেজিত হয়ে গেল। গাছতলায় মাতব্বরি করতে গিয়ে শয়ে শয়ে মৌমাছির কামড় খেয়ে এল। মুখ, চোখ ফুলে ঢোল। তর্জন, গর্জন বন্ধ। আধবোজা চোখে ঝিম মেরে পড়ে আছে। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু খাণ্ডবদহন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ গন্ধরাজ তলা দিয়ে গেট পর্যন্ত যেতে রাজি নয়। সেখানে তখন ভিটেয় আগুন দেখে অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে। গামারই ওই অবস্থা করেছে, তবে আমাকে রেহাই দেবে? যাই হোক, সে যাত্রা গীতা ত্রিবেদী আসেননি। কিন্তু আগে, পরে কয়েকবারই গামার চিকিৎসা করেছেন। মাঝ বয়সে তার ক্রিমি হয়েছিল। শেষ বয়সে থ্রম্বোসিস। কুকুরের ডাক্তারের দয়াতেই সে পনেরো বছর পার করেছিল। কুস্তিগীরের মতো দেহ ধারণ করার সুযোগ পেয়েছিল। তেজ আর শক্তি নিয়ে গামা ছিল সার্থকনামা। এখনও আমার হাতে পায়ে গামার অমিত বিক্রমের অস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই।

এ লেখার বিষয় কিন্তু সারমেয় চিকিৎসক নন। কুকুর কাহিনী লিখছি

বলে গোড়াতে একটু গামার কথা লিখলাম। এ লেখার বিষয় হচ্ছে সারমেয়রা যখন পরীক্ষক হয়ে আপনাকে ধাওয়া করে, সেই বিবরণ।

প্রথমে সম্প্রীতি দেবীর ঘটনাটাই ধরা যাক। বৃদ্ধার বয়স মধ্য-আশি। অধিকাংশ সময় আমেরিকা আর কানাডায় থাকেন। আমরা মাসিমা বলি, কারণ তাঁর কন্যা আমাদের পরিচিতা। মাসিমার পারিবারিক পরিচয় হচ্ছে তিনি মনীশ ঘটক, ঋত্বিক ঘটকের সহোদরা। মহাশ্বেতা দেবীর পিসিমা।

যেহেতু মাঝে মধ্যেই সম্প্রীতি দেবীকে প্লেনে চড়ে দেশ বিদেশ করতে হয়, সেহেতু বয়সের কারণে হুইল চেয়ারের সাহায্য নেন। এয়ারপোর্টে এরকমই বন্দোবস্ত করা থাকে। গতবছর তিনি কলকাতা থেকে নিউইয়র্ক কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছে হুইল চেয়ারে চড়েই কাস্টমস পার হচ্ছিলেন। মালপত্র নিয়ে সঙ্গে এয়ারপোর্টের কর্মী হুইল চেয়ার ঠেলছেন, হঠাৎ এক কুকুর এসে উপস্থিত। লাফ দিয়ে সোজা একেবারে বৃদ্ধার কোলে। অনিমেষ নয়নে তাঁকে দেখছে, তাঁর গা, গলা শুঁকছে। অন্য কোনও অশীতিপর বৃদ্ধা হলে কী হত কে জানে? মহাশ্বেতা দেবীর পিসি তো, জিন-ই আলাদা। ঘাবড়ে যাওয়া দূরে থাক, যেন বেশ মজাই পেলেন। ভাবখানা যেন — আহা! কার কুকুর গো? মাসিমার মুখও সে চেটেছিল শুনলাম। তিনি সস্নেহে চেয়ে আছেন দেখে কাস্টমস অফিসার এগিয়ে এসে বললেন — আপনি সঙ্গে কোনও ফল এনেছেন? মাসিমার সঙ্গে কোনওরকম ফল ছিল না। এত বছর যাওয়া আসা করেছেন, কাঁচা সবজি, কিংবা ফল যে ইউ এস কাস্টমস ঢুকতে দেয় না, সবই জানেন। অযথা আনবেন কেন? সে কথা বলতেও কাস্টমস ব্যাগ পরীক্ষা করে দেখল। কারণ কুকুরটা হাত ব্যাগের ওপরেই হামলে পড়েছিল। সে নাকি ফলের গন্ধের স্পেশালিস্ট। ড্রাগ ও অন্যান্য বেআইনি জিনিস শোঁকার কুকুর যেমন আছে, তেমনি ফুল, ফলের গন্ধ শুঁকে যাত্রীদের ব্যাগ, সুটকেস চিনিয়ে দেবে — তেমন কুকুরও এয়ারপোর্টে ঘুরে বেড়ায়। যে কোনও কারণেই হোক, ওই ফল বিশারদ সারমেয়টি সম্প্রীতি দেবীর হাত ব্যাগের গন্ধেই তাঁর কোলে চড়ে বসেছিল।

কাস্টমস অফিসার মাসিমার হাত ব্যাগের জিপার খুলে অল্প স্বল্প নেড়ে চেড়ে দেখলেন। ফলের আশা ত্যাগ করে আবার অন্যত্র গিয়ে কর্মে মন দিলেন। সম্প্রীতি দেবী প্রীত হয়ে হুইল্ চেয়ারে চড়ে কাস্টমসের বেড়া পার হয়ে গেলেন।

তিনি পরে এই ঘটনাটা বলার সময় দন্তবিহীন মুখে একগাল হেসে বলেছিলেন — কুকুরটার খুব বুদ্ধি, জানিস, ফলের গন্ধই তো পেয়েছিল। ব্যাগের একেবারে তলায় প্লাস্টিকের ঠোঙায় মুড়ে কতকগুলো নারকোল নাড়ু এনেছিলাম। কাস্টমস অতদূর হাটকায়নি। কিন্তু কুকুরটা ঠিক নারকোলের গন্ধ পেয়েছিল।

আমাদের কেনেডি এয়ারপোর্টে কুকুরের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে। কাস্টমস অফিসারের হাতে সঁপে দেওয়াই তাদের কাজ। তবে এখনও পর্যন্ত সুটকেস, ব্যাগ শুঁকে টুকে ছেড়ে দিয়েছে। পাটালি গুড়ের মধ্যে খেজুর ফলের গন্ধ আবিষ্কারের মতো স্পেশালিস্ট কুকুর এখনও মাঠে নামেনি বলে রক্ষে।

আমেরিকায় কাস্টমসের কুকুরদের প্রধান কাজ হচ্ছে ড্রাগ পাচার-কারীদের ধরা। এয়ারপোর্টে বিভিন্ন নামের কুকুর আলাদা, আলাদা বিভাগের জন্যে থাকে। ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারে শস্যকণা আর ফলমূলের গন্ধ চিনতে পারে জ্যাকপট নামে একটি কুকুর। বারকো হচ্ছে ড্রাগ পরীক্ষার জন্যে ট্রেনিং পাওয়া কুকুর। মোট পাঁচশ পনেরো বার এয়ারপোর্টে ড্রাগসুদ্ধু প্যাকেট আবিষ্কার করেছে। একবার বিস্কুটের প্যাকেটে ৭৫ মিলিয়ন ডলারের কোকেন খুঁজে বার করেছিল। শুধু এয়ারপোর্টেই নয়, পুলিশের সঙ্গে অনুসন্ধান বেরিয়েও গন্ধ বিশারদ কুকুররা অনেক চোরাই কারবার ধরে ফেলে। একবার একটা স্টেশন ওয়াগনে ঢুকে, তার ছাদের কাছে ঘুরে ঘুরে জেড নামে পুলিসের কুকুর নকল সিলিং খুঁজে দিয়েছিল। তার পেছনে কয়েক প্যাকেট মারিজুয়ানা লুকানো ছিল। হাইওয়েতে তরল দাহ্য পদার্থ নিয়ে বিরাট ট্রাক চলেছে। পুলিশের সন্দেহ থেকে কুকুর লাগানো হল। টাকার নামে সেই কুকুর ওই ট্রাকে মারিজুয়ানার গন্ধ পেয়ে প্যাকেট উদ্ধার করতে সাহায্য করল। এরকমই দক্ষ সব কুকুরের নাম 'ল', 'টিনটিন', 'ট্রেসার' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধারণ বিগল জাতীয় ছোট কুকুরদের এ কাজে লাগানো হয়। বিগল ব্রিগেড এ দেশের কাস্টমস বিভাগের মস্ত হাতিয়ার। চোরাই ড্রাগে ব্যবসা বন্ধ করতে প্রতি বছর এই কুকুরদের সাহায্যই কয়েক বিলিয়ন ডলারের ড্রাগ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ইমিগ্রেশন সার্ভিসের কুকুর বারকো অবশ্য বিগল নয়। সে হচ্ছে জার্মান

শেপার্ড। টেকসাসে এক ট্রাক বোঝাই বিস্কুটের প্যাকিং বাক্স থেকে ৭৫ মিলিয়ন ডলারের কোকেন খুঁজে বার করেছিল। তার আগে তরমুজ আর লেবুর বিশাল গাদার মধ্যে থেকে ৪৮ মিলিয়ন ডলারের কোকেন খুঁজে দিয়েছিল।

ওহায়ো রাজ্যে ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের একটি কুকুরের নাম রেড। গোল্ডেন রিট্রিভার। ৯১ সালে রেড ক্লিভল্যান্ড শহরের পোস্টাল ইন্সপেক্টরকে খুব সাহায্য করেছিল। ডাক মারফত পাঠানো একটি টেলিভিশন সেট ডেলিভারি দেওয়ার আগেই তার ভেতরে লুকনো খোপ থেকে চারশো হাজার ডলারের ক্র্যাক জাতীয় ড্রাগ পাওয়া গেল। কুকুরটাই গন্ধ শুঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

ইউ এস কাস্টমস সার্ভিসের কালো ল্যাব্রেডর কুকুর আয়ওয়ার-ও সাংঘাতিক ক্ষমতা ধরে। ফ্লোরিডার মায়ামি শহরে সমুদ্রের ধারে ডক অঞ্চলের ঘটনা। ৯১ সালে ডকের কাছাকাছি কয়েকটি সিমেন্টের দেওয়ালের মধ্যে থেকে ওই কুকুর ৩২ হাজার পাউন্ড কোকেনের সন্ধান দিয়েছিল। কংক্রিটের মধ্যে গাঁথা ওই চোরাই প্যাকেট-এর সূত্র ধরে কলম্বিয়ার কুখ্যাত ক্যালি কার্টেল নামে স্মাগলার দলের ১৭ জনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছিল। যদিও সময় লেগেছিল আরও চার বছর।

কাস্টমস সার্ভিসের দুটি গোল্ডেন রিট্রিভার কালহুয়া আর কে দু বছর আগে মায়ামিতে ৯,১১৭,৯৬০ অঙ্কের চোরাই ডলার উদ্ধার করেছে। মায়ামি থেকে কলম্বিয়ায় পাঠানো হচ্ছিল এরকম কিছু ক্রেটের মধ্যে থাকার কথা ছিল এয়ার কমপ্রেসর আর হাই-ফাই স্পিকারের বাক্স। তার সঙ্গে কুকুর খুঁজে দিল তাড়া তাড়া ডলারের নোট। ড্রাগ বিক্রির রোজগার।

আমেরিকায় মোট ৬টি সরকারি এজেন্সির নিজস্ব কে-নাইন প্রোগ্রাম বা ক্যানাইন প্রোগ্রাম আছে। (১) ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ৭২ সাল থেকে কে-নাইন এক্সপ্লোসিভস ডিটেকশন প্রোগ্রাম শুরু করেছে। ৩১টি এয়ারপোর্ট একশোটি কুকুর শুধু বিস্ফোরক শনাক্ত করার জন্যে আছে। (২) সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি পাঁচ বছর হল বেশ কিছু সংখ্যক ল্যাব্রেডর রিট্রিভারস্ আর জার্মান শেপার্ডকে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে অনুসন্ধানের কাজে লাগাচ্ছে। ওই কুকুরদের কাজ হল কোনও রাষ্ট্রীয় অতিথি, বা কূটনৈতিক মহলের লোকজন এসে পৌঁছনোর আগে ওই জায়গাগুলো পরীক্ষা করা।

অথবা আগাম নিরাপত্তার জন্যে এদের আনা হয়। এছাড়া সি আই এ-র নিজস্ব কুকুরগুলি বিস্ফোরক শনাক্ত করার কাজেও দক্ষ হয়। (৩) ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসের আছে ১৩৪টি কুকুর। মোট ১৭টি সেক্টরে এরা ড্রাগ ও বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশকারীদের ধরার কাজে সাহায্য করে। গতবছরে ওই কুকুরদের সাহায্যে ৩,৯৩৪টি চোরাই ড্রাগের কারবার ধরা পড়েছে। এছাড়া লুকিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে আসা তের হাজার দু'শ ছিয়াত্তর জনকে শনাক্ত করা গেছে। (৪) ব্যুরো অফ অ্যালকোহল, টোব্যাকো অ্যান্ড ফায়ার আর্মস-এর কালো ল্যাব্রেডর কুকুর চার্লি মোট কুড়ি রকমের বিস্ফোরক-এর গন্ধ চেনে। বন্দুক, রিভলভার, এমনকি একটি লুকনো বুলেটও খুঁজে বের করতে পারে। চিঠি বা প্যাকেজে বিস্ফোরক আছে কি না বুঝতে পারে। (৫) ইউ এস পোস্টাল ইন্সপেকশন সার্ভিস-এর অবশ্য নিজস্ব কে-নাইন টিম নেই। তবে মাদকদ্রব্য বহন করছে এমন সন্দেহ থাকলে, সেই সব প্যাকেজ পরীক্ষার জন্যে তারা অন্যান্য সরকারি এজেন্সির কুকুরদের সাহায্য নেয়। গত বছরে এভাবে দু হাজার ড্রাগ সংক্রান্ত গ্রেফতার সম্ভব হয়েছে। (৬) সিক্রেট সার্ভিস থেকে জানিয়েছে তারা অবশ্যই সুরক্ষার প্রয়োজনে কুকুরদের কাজে লাগায়। তবে কীভাবে শিক্ষা দেয়, কতগুলি কুকুর রাখে, কোথায় রাখে — কিছু জানাতে চায় না। সিক্রেট সার্ভিস মানেই তো গোপন ব্যাপার।

এছাড়া এফ বি আই, স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ইউ এস মার্শাল সার্ভিসও কুকুরের সাহায্যে অনুসন্ধান ও অন্যান্য কাজকর্ম চালায়। তবে তাদের নিজস্ব কুকুরের টিম নেই। অন্যান্য সরকারি এজেন্সি থেকে কুকুর নিয়ে কাজ করে।

আমেরিকায় চল্লিশের দশকে ছিল ওয়ার ডগ। যুদ্ধ শেষ হবার পরে তাদের লাগানো হয়েছিল সীমা সুরক্ষার কাজে। পঞ্চাশের দশকে ইউ এস বর্ডার পেট্রোলে যুদ্ধোত্তর কুকুরবাহিনী পাহারাদারির কাজ করত।

এখন আমেরিকায় মোট সাতশো কুকুর এই কাজ করছে। সরকারের কুকুর বলে এদের জি-ডগ অর্থাৎ গভর্নমেন্টস ডগ বলা হয়। কাগজ কলমে লেখা হয় — ফেডারেল সিভিল সার্ভেন্ট। প্রত্যেক বছর এরা শুধু ড্রাগ আর চোরাই ডলার উদ্ধার করেই সরকার কত সাহায্য করে। ৯৪ সালের ড্রাগের চোরাইকারীদের ৩৪ মিলিয়ন ডলার কুকুরের জন্যেই বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

ভার্জিনিয়া রাজ্যের ফ্রন্ট শহরে কাস্টমস-এর কুকুরদের ট্রেনিং সেন্টার

খোলা হয়েছে। আমেরিকায় ওই সাতশো কুকুরকে প্রতিপালন করতে সরকারের বার্ষিক খরচ হয় কুকুর প্রতি প্রায় দশ হাজার ডলার। কাস্টমসের কুকুররা ক্রমশ ক্রমশ যেরকম ট্রেনিং পাচ্ছে, ভবিষ্যতে মানুষের কাজই কমে যাবে হয়তো। স্মাগলারদের পেটে গন্ধ শুঁকে শুঁকে পাকস্থলীর মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রকের মোড়কে ভরা কোকেন ধরিয়ে দিচ্ছে।

অন্য কাজেও জি-ডগদের যোগ্যতা কিছু কম নয়। তারা উইপোকার সন্ধান পায়। শুঁয়োপোকার ডিম চেনে। একবারে গুটলি পাকানো, কাগজে মোড়া পাঁচ ডলারের নোট চিনে নিতে পারে। দশ ফিট জলের নীচে কোনও মানুষের দেহ ডুবে থাকলেও ওপর থেকে বুঝতে পারে। তারা মাটির নীচে পাইপ লাইন ফুটো হলে ধরতে পারে। ঠিক জায়গায় লিক খুঁজে বার করবে। কোথাও বিষাক্ত তরল, রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে পড়লে তারা বিস্তৃতির পরিমাপ চিহ্নিত করতে পারে। এমনকি গোরুদের প্রজননের সময় পর্যন্ত এই কুকুরদের নখদর্পণে। পশু পালন বিভাগেও তারা পরীক্ষকের কাজ করছে। মানুষের ক্ষেত্রে তো করছেই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবে বোমা শোঁকা কুকুররা কম দায়িত্ব পালন করেছে? সুরক্ষা মানেই সারমেয়।

এজন্যেই এদের এমন কদর। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার তাদের সুভেনির পোস্ট কার্ড ছাপল চারটি প্রিয় চতুষ্পদের ছবি দিয়ে। বিশাল ধানখেতের মধ্যে ট্র্যাক্টরে চড়ে বসে আছ মলি, কুইনসি, পাশা আর অ্যাবট নামে চারটি বিগল। তিরিশটি বিগল কুকুরের টিম কৃষিবিভাগে সরকারি কাজ করে। তারাই হচ্ছে—বিগল ব্রিগেড।

জি-ডগদের জীবনের ঝুঁকি বলতে, প্রায়ই তাদের মেরে ফেলার চেষ্টা চলে। কাস্টমসের দুটো কুকুরকে কারা গতবছর বিষ খাইয়ে মেরেছে। ইমিগ্রেশন বিভাগ জানিয়েছে — বেশ কয়েকবার জি-কুকুরদের খুন করার জন্যে দুর্বৃত্তরা ভাড়াটে খুনি লাগিয়েছিল।

দেশের জন্যে কাজ করছে বলে জি-ডগদের ভারী মান সম্মান। সবুজ রঙের ইউনিফর্ম পরা জ্যাকপটের ছবি আমেরিকার স্কুলে ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের উপহার দেওয়া হয়। অবশ্য চিরকালই সে এত সমাদর পায়নি। ফিলাডেলফিয়ার এক অ্যানিম্যাল শেলটার থেকে উদ্ধার করার পরে ওই ছোট্ট বিগলকে ট্রেনিং দিয়ে এমন যোগ্য করে তোলা হয়েছে। ফলের গন্ধ চেনার দরুণ ক্ষমতা। কাস্টমসে কতবার এর তার ব্যাগ থেকে শুঁটকো

আপেল, হেজে যাওয়া কমলালেবু নয়তো আম উদ্ধার করেছে। অস্ট্রেলিয়ান ফল কিউই-র গন্ধ টের পায় পঁচিশ ফুট দূর থেকে। তবে একেক সময় একটু বিভ্রান্তও হয়ে পড়ে। ফলের গন্ধ পেয়ে যাত্রীকে ধরিয়ে দিল। শেষে দেখা গেল তাঁর ব্যাগে ওই ফলের এসেন্স দেওয়া শ্যাম্পু কিংবা লোশনের শিশি আছে। তখন জ্যাকপট তার প্রত্যাশিত মাংসের ছোট্ট জলখাবারটি পাবে না। এমনিতে প্রত্যেকবার শনাক্ত করার কাজে সফল হলে কাস্টমসের কুকুরদের একটু স্ন্যাকস দেওয়া হয়।

আমেরিকায় বিদেশি ফল নিয়ে এত কড়াকড়ি কেন? কারণ, ফলের মাছির আতঙ্ক। একটি বিদেশি ফলের সঙ্গে যদি একটি মাছি এসে জোটে, তবে নাকি এমন বংশবৃদ্ধি করবে যে ক্রমশ আমেরিকার ফলের বাগান ছেয়ে যাবে। একবার ক্যালিফোর্নিয়ায় বিদেশি ফ্রুট ফ্লাই হানা দিয়ে কী কাণ্ড বাধাল। চাষিদের হাহাকার, সেনেটে, কংগ্রেসে তোলপাড়। তারপর থেকে কড়াকড়ি আরও বেড়েছে। তবে কি বিদেশি ফল আমেরিকায় আসে না? হরদম আসছে। কিন্তু সে তো আমদানি করা মাল। বিশেষ পদ্ধতিতে সুরক্ষিত হয়ে আসছে তার ওপর মার্কিন বন্দরে ভিড়লেই হাজার রকম শোধন পদ্ধতি। ফলের গা ঘেঁষে ওড়াউড়ি করতে করতে কারুর ঢুকে পড়ার সাধ্য নেই। কিন্তু আমরা যদি এক বস্তা আম, কাঁঠাল নিয়ে প্লেন থেকে নামি, ফলের মাছি ফলো করে আসেনি কে বিশ্বাস করবে? এ জন্যেই যাত্রীদের ওপর এত খবরদারি। আম এনে অস্বীকার করি যদি, আর ওই গন্ধেশ্বর কুকুর যদি বমাল উদ্ধার করে, তবে নিষিদ্ধ জিনিস আনা এবং মিথ্যে ভাষণের অপরাধে এয়ারপোর্টেই আড়াইশো ডলার জরিমানা দিতে হবে। কারণ ফ্রুট ফ্লাই আমেরিকার ফলের বাগানে ঢুকে বংশ বিস্তার করলে কৃষিবিভাগের একশো মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অবশ্য আগে পটল আর পান এনেছেন বহুলোক। তখন তো ওই কুকুর পরীক্ষক ছিল না। ইদানীং এখানে তো পাওয়াও যাচ্ছে সব কিছু। তাই কেউ আর ঝামেলায় যেতে চায় না। এক কিলো পটলের জন্যে আড়াইশো ডলার গুনাগার পোষায় নাকি?

আমেরিকার তেরোটি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে সরকারি কৃষিদপ্তরের এরকম তিরিশটি কুকুর, মানুষ জুটি আছে। তারা দু'জনে মিলে যাত্রীদের পরীক্ষা করে। দু'জনেই সরকারি চাকুরে। দু'জনেরই ইউনিফর্ম আছে। সিভিল সার্ভিস করে বলে কুকুররা থাকার ঘর পায়। মাইনের বদলে খাওয়া পায়।

চিকিৎসা হয়। তার ওপর খুব আদর যত্নও পায়। ঘ্রাণশক্তির পুরস্কার হিসেবে ঘন ঘন জলখাবার তো আছে। তবে তার মাত্রই সামান্যই। নয়তো পেট খারাপ হতে কতক্ষণ? এদেশে সাপ ধরা কুকুরও আছে। জ্যাক রাসেলস টেরিয়ার জাতের হিংস্র প্রকৃতির কুকুরকে সাপ ধরার ট্রেনিং দেওয়া হয়। আমেরিকার অ্যানিম্যাল ড্যামেজ কন্ট্রোল ডিভিশন কৃষি দপ্তরের অঙ্গ। ৯৩ সালে গুয়ামে ব্রাউন ট্রি স্নেক বেজায় উৎপাত শুরু করেছিল। তখন মার্কিন কৃষিদপ্তর সাপ ধরা কুকুরের জন্যে ট্রেনারদের সাহায্য চাইলেন। সরকারি নির্দেশ শুনে আটজন ট্রেনার জ্যাক রাসেল টেরিয়ারদের নিয়ে সাপ ধরার শিক্ষা দিতে শুরু করলেন।

এখন গুয়াম দ্বীপের জাহাজঘাটে আর এয়ারপোর্টে আটটি জ্যাক রাসেলস্ টেরিয়ার পাহারা দেয়। ওই ব্রাউন ট্রি স্নেক কীভাবে একবার গুয়ামে এসে পড়ে বংশ বিস্তার করেছিল। তারা ক্রমাগত পাখি ধরে ধরে খেয়েছে। পাখির বংশ নির্মূল করে ছেড়েছে। তাছাড়া বছরে অন্তত পঞ্চাশটি শিশুকে কামড়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। সাপেদের অত্যাচার বন্ধ করতেই টেরিয়ারদের পাঠানো হল। আমেরিকার কে-নাইন টিম বলে কথা। গত বছরে প্রথম চার মাসে তারা ১৫১টি ব্রাউন ট্রি স্নেক ধরল। পরের চার মাসে মহা উৎসাহে ৫১৭টি। বছরের শেষে সাপের বংশ প্রায় উচ্ছেদ হবার উপক্রম। 'ফাইন্ড দ্য ভাইপার' নামে খেলা শেখানের পরে আমেরিকায় ওদের প্রধান ট্রেনার একটু স্ন্যাকস খেতে দিতেন। ওই পুরস্কার আর কি! কিন্তু গুয়ামে গিয়ে তারা আরও উপরি পাচ্ছে। সাপ ধরছে আর খেয়ে নিচ্ছে। ফাইন্ড দ্য ভাইপার খেলার আনন্দের শেষে ইট দ্য ভাইপারের সিদ্ধান্ত কুকুরগুলোই নিচ্ছে। যদিও ছোট্ট অবস্থায় বেশিরভাগ কুকুরকেই শেলটার থেকে আনা হয়, তবু স্বভাবধর্ম অনুযায়ী কে-নাইন টিমের কুকরদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। জ্যাক রাসেল টেরিয়ারদের স্বভাবে আগ্রাসীভাব বেশি থাকায় তাদেরই সর্প নিধন যজ্ঞে পাঠানো হয়েছে। নতুন কোনও বিদেশি সাপ আর গুয়াম দ্বীপে ঢুকতে পারবে কি না সন্দেহ!

ব্লাড হাউন্ডদের রাখা হয় খুনের আসামী, পলতকা দুর্বৃত্তদের খোঁজার জন্যে। নিরুদ্দিষ্ট লোক মারা গেছে সন্দেহ হলে ব্লাড হাউন্ড নিয়ে মৃতদেহ খোঁজা হয়। মানুষের গন্ধ পাঁউ-এর কাজে তাদের সহজাত ক্ষমতা। অসম্ভব ধৈর্য আর উপর্যুপরি খুঁজে বেড়ানোই ব্লাড হাউন্ডের নিজস্ব স্বভাব।

বিস্ফোরক, ড্রাগ ইত্যাদি শনাক্ত করার জন্যে দরকার বড়সড় মাপের কুকুর। বিশেষ করে দৌড় ঝাঁপের প্রবণতা থাকতে হবে। কারণ লাগেজ কনভেয়ারে নাচতে নাচতে আসা বড় বড় সুটকেসের ওপর লাফিয়ে বেড়াতে হবে। উঁচু উঁচু কাঠের ক্রেটের মাথায় চড়ে বসতে হবে। সবচেয়ে দরকার হচ্ছে বিপজ্জনক উচ্চতায় পৌঁছনো। বোমা তো কত জায়গাতেই লুকিয়ে রাখা সম্ভব। সর্বত্রই এদের হানা দিতে হয় বলে তাগড়াই চেহারার কুকুরদের বেছে নেওয়া হয়।

রিট্রিভারের মধ্যে ল্যাব্রেডর আর গোল্ডেন রিট্রিভারের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল বলে তাদের সরাসরি গন্ধ শোঁকার কাজেই নেওয়া হয়। কিন্তু সুরক্ষার কাজে তাদের বদলে জার্মান শেপার্ড বা অ্যালসেশিয়ানদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যে জাতের মধ্যে আগ্রাসী মনোভাব এবং শিকারের প্রবৃত্তি তুলনামূলক-ভাবে বেশি, সেই জাতের কুকুরদের অপেক্ষাকৃত বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্যে বেছে নেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের আনা হয় কোনও অ্যানিম্যাল শেলটার নয়তো গাইড ডগ প্রোগ্রাম থেকে বাতিল হওয়ার পর। সব কুকুরকে দিয়ে সবরকম কাজ হয় না। গাইড ডগ প্রোগ্রামের সময় তা বোঝা যায়। তখন কুকুরের মেজাজ বুঝে সরকারি ট্রেনাররা তাদের এক একরকম শিক্ষা দেন। তারপর কে-নাইন টিমে ঢোকানো হয়।

কীভাবে এদের ট্রেনিং দেওয়া হয়? পুরস্কারই বা কী? কাস্টমস ডগকে ট্রেনিং দেওয়ার সময় পুরস্কার হিসেবে মোড়ানো তোয়ালে দেখিয়ে খেলানো হয়। মোট বারো সপ্তাহের ট্রেনিং পর্বের প্রথম ভাগে কুকুরদের নকল মাদকদ্রব্যের গন্ধ মাখানো তোয়ালে দিয়ে খেলানো হয়। তারপর তোয়ালে লুকিয়ে ফেলে খুঁজতে পাঠানো। কুকুর খুঁজে আনলে আবার ট্রেনারের সঙ্গে তোয়ালে নিয়ে টানাটানির পরে চিবনোর জন্যে তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় ট্রেনারের সঙ্গে যুদ্ধ, লাফালাফি, ছিনিয়ে নেওয়া, চিবিয়ে ফেলা ইত্যাদি করে কুকুর ড্রাগের গন্ধ আবিষ্কারে দক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু ট্রেনিং-এর শেষ পর্বে, যখন সত্যি সত্যি ড্রাগ তোয়ালে ব্যবহার করা হয়, তখন কিন্তু কুকুর খুঁজে আনার পরে সেটি আর তাকে পুরস্কার দেওয়া হয় না। তার বদলে একই রকম দেখতে অন্য তোয়ালে নিয়ে খেলা আর পুরস্কার পর্ব শেষ হয়। এ ভাবেই কাস্টমসের কুকুর কোকেন, হেরোইন শনাক্ত করতে শেখে।

বিগল হচ্ছে সবচেয়ে ভদ্র, শিষ্ট কুকুর। এয়ারপোর্টে হাজার হাজার লোকজনের মধ্যে তাকে কাজ করতে হয়। গন্ধ শোঁকা আর নাছোড়বান্দা হয়ে বাক্স, পেঁটরার চারপাশে ঘোরার জন্যে তো হিংস্র কুকুরের দরকার নেই। সম্প্রীতি দেবীর ব্যাগে নারকোল নাড়ুর গন্ধ পেয়েও তাঁর কোলে বসে মুখ চেটেছিল। কোনও রকম অসভ্যতা করেনি। পরে তিনি বমাল হুইল চেয়ারে চড়ে কাস্টমসের চৌহদ্দি পেরিয়ে যাচ্ছেন দেখেও ধাওয়া করেনি। তার যা কাজ সে করেছে। সাহেব যদি নাড়ু চিনতে না পারে তো সে তার অজ্ঞতা। কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে। অবশ্য আইনত নাড়ু আটকানো যায় না। ওই গুড়েই যা একবার নাড়ু আটকে যায়। ইউ এস কাস্টমস ফল, মূল আটকাতে পারে, কিন্তু চকোলেট আটকাতে পারে না। আমরা অবলীলাক্রমে মিল্ক ক্যান্ডি বলে নতুন গুড়ের তালশাস সন্দেশ আনি। মোলাসেস ক্যান্ডি বলে পাটালি। সুতরাং কোকোনাট লজেন্স বলে নাড়ুও পার করা যেত। দরকার হয়নি বলে মাসিমা কথা বাড়াননি।

সরকারি জি-ডগ-দের নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা বলেন বিগল শুধু বন্ধুই নয়, একেবারে সহকর্মীর ভূমিকা পালন করে। দু'জনের সমান সমান দায়িত্ব। বরং মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য করে। খেটে মরে। কিন্তু বকর বকর করে না।

শুনেছি কুকুরের নাকি অহংবোধ নেই। আপনি লুসি বলে ডাকলেই সে কান খাড়া করে শোনে, ছুটে আসে, তার মানে এই নয় যে সে নিজেকে লুসি বলে জানে। সে নাকি সহজাত প্রবৃত্তি থেকে শব্দের উৎস খুঁজতে ফিরে তাকায়, ছুটে আসে। লুসি মানে সাড়া দিতে হবে। কিন্তু আমিই লুসি — এই রকম দাবি নাকি কুকুরের নেই। কিন্তু শিম্পাঞ্জি সেদিক থেকে ভীষণ আত্ম সচেতন। পশুদের বোধ, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে এই সব তথ্য পাওয়া যায়। একবার নিজেকে চেনার পরীক্ষায় শিম্পাঞ্জি খুব আত্মজ্ঞান দেখিয়েছিল। তার কপালে মস্ত ফোঁটা দিয়ে আয়নার সামনে পাঠানো হল। শিম্পাঞ্জি এক পলক নিজেকে নিরীক্ষণ করেই ঝটপট ফোঁটা মুছে দিল। তার মানে এ আমি তো আমি নই! আবার টিপ পরানো হল। আবার বিরক্ত হয়ে মুছে দিল। অর্থাৎ শিম্পাঞ্জি নিজের চেহারা চেহারা চেনে। টিপ পরে অন্যরকম হতে রাজি নয়।

আর ওই একই পরীক্ষায় কুকুর অম্লান বদনে টিপ পরে বসে থাকল।

আয়নায় নিজেকে দেখে তার কোনও ভাবান্তর হল না। নিজের প্রতিবিম্ব সম্পর্কে তার কোনও বদ্ধমূল ধারণা নেই বলে, অস্থির হয় না। সারমেয় পরীক্ষক কি তবে আমাদের শিক্ষক? সারমেয় চিকিৎসক গীতা ত্রিবেদী কোথায় আছেন? কিছু বলুন।

পতঙ্গের প্রেম সঙ্গীত

ভাবছেন বছরের গোড়াতেই মামুলি উপমা দিয়ে ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী লিখতে বসেছি? সেই পতঙ্গ আর মোমবাতি, 'পরওয়ানা' আর 'শম্মা'র জ্বালা পোড়ার ফিরিস্তি? উপসংহারে কিঞ্চিৎ দার্শনিকতার বার্নল অয়েন্টমেন্ট? ধুর! পোকাদের জহরব্রত পালনের কোনও লক্ষণই দেখতে পাই না। লোডশেডিং-এর দু'দশক ধরে আপনিও কি প্রতি রাতে পতঙ্গের আত্মহত্যা দেখেছেন? আপনার টেবিলের ওপর একটু হেলে দাঁড়ানো রোগা পটকা মোমাবাতিকে ঘিরে, শয়ে শয়ে তাদের ধেয়ে আসা (কিতনি পরওয়ানে জ্বলি এক শম্মাকে লিয়ে ... জেন্ডারের গণ্ডগোল ক্ষমা করবেন) এবং পাখায় পাখায় প্রজ্বলিত অগ্নি নিয়ে ভস্মীভূত হওয়া — এ ট্র্যাজেডি রোজ সন্ধেবেলায় দেখতেন?

আমি নিশ্চিত যে আত্মাহুতি দেওয়ার বদলে কীট পতঙ্গের অন্য অনেক কাজ থাকে। মশা, মাছির প্রবল কর্মব্যস্ততার কথা চিন্তা করুন। পুরনো শত্রু ডি. ডি. টি, মশারি, ধুনো ইত্যাদিদের শায়েস্তা করে মশারা আপাতত অন্যান্য সেমিনারে মেতেছে। 'কচ্ছপ ধূপ', 'গুড নাইট' প্রতিরোধ প্রকল্প নিয়ে কী প্রচণ্ড খাটাখাটুনি করছে। মশা পতঙ্গ যাবে আগুনের দিকে রঙ্গে ধাইতে? হুঁঃ, তাহলে আর ভাবনা ছিল না। মশা, মাছির কথা বাদ দিন। সাধারণ পোকা-মাকড়রাও দহনযোগ্য হতে চায় না। তারা তাদের 'প্রায়রিটি' বোঝে। শুধু ওই কালীপুজোর সময়ই দু/চার রাত কোনও কোনও দল একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। পতঙ্গের ফলিডল অধ্যায়...।

কিন্তু আমি লিখছি পতঙ্গের পূর্বরাগের পজিটিভ সাইড অর্থাৎ মধুময়

দিকটি নিয়ে। পোকামাকড়ের জীবনে সঙ্গীতের সঙ্গে প্রেম নিবেদনের যে কী নিবিড় সংযোগ থাকে, সে কথা জানলে মানুষ আরও অনুপ্রাণিত হবে। সব গানের ইস্কুলগুলো ছাত্রে ছাত্রে ভরে যাবে। সরব সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে চির আখাঙ্ক্ষিত প্রেমের ভুবনে গিয়ে পৌঁছনোর ট্রেনিং অবশ্য আপনি ফড়িংদের কাছেও পেতে পারেন। কিংবা ঝিঁঝিঁ পোকার ক্যাম্পে। সারং নয়তো ঝিঁঝিট — যে রাগ পছন্দ, তালিম নিয়ে নেবেন।

উচ্চিংড়ের ডাক যে আসলে অসাধারণ এক প্রেম সঙ্গীতের কোরাস — সে খবর জেনে, তাদের উচ্চাঙ্গের নিবেদন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল না হয়ে পারা যায় না। সঙ্গীকে আলিঙ্গনের জন্যে উচ্চাঙ্গের পতঙ্গ সঙ্গীত অথবা সঙ্গীর 'প্রতি অঙ্গ লাগি' পতঙ্গের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত — বিশেষণ যে কোন্ দিকে লাগাই — বিনা প্রয়াসে যেন অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তবু তো গঙ্গা ফড়িংকে আনিনি।

প্রকৃতির রাজ্যে এত যে পোকামাকড়ের ডাক কানে আসে, অন্ধকার নামলে জোনাকির আলোকসম্পাত দেখি, এ সবই নাকি তাদের প্রেমের সংকেত। আর এ কাজে তারা সমবেত প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী। পুরুষ কীটপতঙ্গরা দঙ্গল বেঁধে বসে, সুরে সুর মিলিয়ে, হয়তো বা শুঁড়ে শুঁড় মিলিয়ে প্রেমের গান গায়। একমাত্র উদ্দেশ্য — স্ত্রী-পতঙ্গদের আকর্ষণ করা। সুরের মায়াজালে বন্দি করা। দলে দলে পুরুষ পতঙ্গ কনসার্ট ধরেছে কিংবা একসঙ্গে মিলে শরীর জ্বালিয়ে আলোর ফোকাস মারছে মানেই জানবেন — ধারে কাছে পতঙ্গিনী বাহিনী রঙ্গ করছে। কিন্তু ধরা দিচ্ছে না। সেই রঙ্গিনীদের মন ভোলানোর জন্যেই এমন সঙ্গীত সম্মেলন।

এই যে ঐকতান সৃষ্টি, সুরে সুর মিলিয়ে একটানা ডাক ছেড়ে যাওয়া, বিনা রিহার্সালে পতঙ্গরা শেখে কি ভাবে? একসময় জীব-বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল — পোকামাকড়দের মধ্যে নিশ্চয়ই ভারী সমঝোতা থাকে। একক ধ্বনি, অথবা একটি দুটি জোনাকির শরীর থেকে বিচ্ছুরিত মৃদু আলো বনে জঙ্গলে কোনও সংকেত সৃষ্টি করতে পারে না। নিমেষে হারিয়ে যায়। সঙ্কেত স্পষ্ট না হলে অপর পক্ষের কাছে খবর পৌঁছবে কেমন করে? সেইজন্যেই পতঙ্গকুলের তারস্বরে সমবেত সঙ্গীত। মিছিল করে জোনাকিরা তাই আলো জ্বালায়, নেভায়। সকলেই মশালচী। প্রেমের পথ আলোকিত করে থাকে। অর্থাৎ ভালবাসার জন্যে পতঙ্গরা সংঘবদ্ধভাবে আবেদন জানায়।

কিন্তু এখন আবার জীব-বিজ্ঞানীদের অন্য ধারণা হচ্ছে। 'নেচার' নামে একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে — পুরুষ পতঙ্গরা মোটেই মিলেমিশে প্রেমের গান গায় না বা আলোর সংকেত পাঠায় না। আসলে সবটাই হচ্ছে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার ব্যাপার। একে অন্যকে ছাপিয়ে যাবে বলে ক্রমান্বয়ে ডাকতে থাকে। সেই কারণেই জোনাকিরা ক্ষণে ক্ষণে আলো জ্বালায়।

ফড়িংরা ভীষণ প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন প্রেমিক। তারা নৈশ আবেদনের সময় কেবল আগে আগে সুর ধরতে থাকে। একসঙ্গে ধরা, ছাড়ার কোনও মতলবই নেই। যত আগে গলা শুনিয়ে দিতে পারে, সেই চেষ্টা। ধরুন, শ'খানেক ফড়িং ঝোপে ঝাড়ে গান ধরেছে। প্রত্যেকে গানের লাইনে লাইনে অন্যকে পেছনে ফেলে যাবার চেষ্টা করছে। তাহলে সে কোরাস কেমন শোনাবে? আসলে আমরা ফড়িংদের ভালো গান তো শুনিনি।

টেকসাস ইউনিভার্সিটির অস্টিন ক্যামপাসে পতঙ্গদের প্রেমসঙ্গীত নিয়ে কত গবেষণা হয়ে গেল। জীবজন্তুর ব্যবহার সম্পর্কে যাঁরা বিস্তর পড়াশোনা করে ডক্টরেট হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন — নতুন করে জানা গেল যে পতঙ্গরা সুর মেলাতে চায় না। এতকাল আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম — প্রেম নিবেদনের সময় কোরাস গান হয় কী করে? তার জন্যে কত যুক্তি, কারণ, দেখাতে হয়েছিল। পতঙ্গদের মধ্যে হিংসে থাকে না। কেমন দল বেঁধে মনের ভাব প্রকাশ করে — ইত্যাদি ইত্যাদি...। এখন বুঝেছি, ও সব কথা প্রমাণ করার কোনও দরকার নেই। দায়ও নেই। কারণ পতঙ্গরা কোরাস গায়, অন্যের গান ছাপিয়ে নিজের গান শোনানোর জন্যে। সেটাই কোলাহলে দাঁড়িয়ে যায়।

পানামায় 'স্মিথসোনিয়ান ট্রপিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর জীব-বিজ্ঞানীরা এই সদ্য আবিষ্কৃত সংবাদে খুবই উৎসাহিত হয়েছেন। পতঙ্গদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা থেকেই ব্যাঙেদের কোরাসের রহস্যও উদ্ঘাটিত হয়েছে। কেন যে এক ব্যাং থেকে শত ব্যাং ডাকে, এ গিয়ে পানামার জীববিদ্যা বিশেষজ্ঞরা বহু গবেষণায় সময় কাটিয়েছেন। পূর্বরাগের আবেগে সম্মেলক সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে ভেবে তাঁরা ব্যাঙেদের উদারতায় আশ্চর্যও হয়েছিলেন। কিন্তু এখন টেকসাসের খবরে তাঁরা ক্রমশ নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছেন যে — ব্যাঙেদের মধ্যে প্রেম নিবেদনের ভীষণ প্রতিযোগিতা থেকেই ওইরকম হট্টগোল সৃষ্টি হয়। কে বা আগে গান করিবেক দান, তারি লাগি হুড়োহুড়ি।

আমার অনুমানের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ কীভাবে যে জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার মিলে যায়। এঁরাও আগে ঠিক সেই কথা ভেবেছিলেন যে, পতঙ্গদের কোরাসের পেছনে গলার জোরে পাড়া মাত করার উদ্দেশ্যই প্রধান ছিল। নিঝুম নিশুতি রাতে একটি উচ্চিংড়ের গান কতদূর পৌঁছতে পারে? নায়িকা তো সংবাদই পাবে না। দ্বিতীয়ত -- একশো উচ্চিংড়ে যদি আপন মনে নিজের পছন্দমতো আলাদা আলাদা সুর ভাঁজতে আরম্ভ করে, সে তো আরও বিভ্রান্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ঐকতানের বদলে সে হবে বিকট বাদ্য বাদন। পতঙ্গিনীরা শব্দদূষণেই পালিয়ে যাবে। ভেবে দেখুন বসন্তের বিকেলে লেডি ব্রেবোর্নের উলটো দিকে পার্ক সার্কাস ময়দানে বসে শ'য়ে শ'য়ে অনুরাগী হৃদয় আলাদা করে গান ধরেছে — "অজ বিরজ মে হোলি রে রসিয়া... দেখা পেলেম ফাল্গুনে ... কৃষ্ণচূড়ার আগুন তুমি ফাগুন ভরা গানে ... যদি আবার কোনও বসন্ত দিন আসে... আসিবে ফাল্গুন পুন... রঙ্গ বরসে...।" কী দাঁড়াবে ব্যাপারটা? বসন্তে মহামারী হয়ে যাবে না? তার চেয়ে যদি একটি মাত্র গান বেছে নিয়ে সকলে গলা মিলিয়ে প্রতি বিকেলে গাওয়া যায় — ইমপ্যাক্ট গভীর হতে বাধ্য!

সম্ভবত এই জন্যেই পতঙ্গরাও সুর মিলিয়েছিল বলে বিজ্ঞানীদের প্রথমে ধারণা হয়েছিল। কারণ, তাদের গানের প্রভাব বিস্তারিত না হলে, উদ্দেশ্য আক্ষরিক অর্থেই 'মাঠে' মারা যেত। তাই একটানা সোচ্চার ধ্বনি শুনিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব আর আবেগের প্রচার চালাত। জোনাকিদের ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা একই কথা ভেবেছিলেন। আলোর জেল্লা বাড়ানোর জন্যে তারা দল বেঁধে সংকেত পাঠাত।

অথচ নতুন আবিষ্কার হল — ভালবাসার জন্যে অন্তত ফড়িংদের তো কোনওই সম্মিলিত উদ্যোগ থাকে না। পুরুষ ফড়িংদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পরে দুজন বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। একজন হলেন ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পতঙ্গ-আচরণ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ডঃ মাইকেল ডি. গ্রিন ফিল্ড। অন্যজন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞানী ইগর রয়সেন। এঁরা যৌথভাবে কাজ করেছেন। ফড়িংদের মিলন-আকাঙ্ক্ষা ও সমবেত সঙ্গীতের তিথি, ক্ষণ ইত্যাদি বিচার করে জানিয়েছেন যে — প্রবল প্রতিযোগিতা থেকে তাদের প্রেম গীতির অনুষ্ঠান শুরু হয়। সময়ও ওইভাবেই নির্ধারিত হয়। পর্যবেক্ষণের সময় দেখা গেছে পুরুষ ফড়িংরা আসলে গান টান

গায় না। কম্পিত হৃদয়ে সামনের ছোট্ট পাখা দুটি খঞ্জনির স্টাইলে বাজাতে থাকে। তাই থেকেই একটির পর একটি সুর ওঠে। বেশ কয়েক মিনিট ধরে পাখার বাদ্যি চালিয়ে যায় বলে, প্রতি সেকেণ্ডে অন্তত দু/তিবার একরকম শব্দ শোনা যায়। পাখার খঞ্জনি বাজিয়ে বাজিয়েই ফড়িংদের আবেদন নিবেদন চলতে থাকে।

ওই দুই বিজ্ঞানী মিলে বেশ মনোযোগ দিয়ে ফড়িংদের আবহসঙ্গীত শুনে রেকর্ড করে নিয়েছিলেন। তারপর সেই টেপ চালিয়েছিলেন পানামার এক মাঠে। দেখছিলেন, আগের রেকর্ডের সঙ্গে নতুন ফড়িংদের সুর মেলানোর কোনও প্রবণতা থাকে কি না। আমরা যেমন জানা গানের রেকর্ড শুনলে গলা মেলাতে চেষ্টা করি, সেইরকম ভাবে ফড়িংরাও তাদের জাতভাইদের খঞ্জনি ধ্বনির সঙ্গে পাখা বাজাতে থাকে কি না, বিজ্ঞানীরা সেটাই পরীক্ষা করতে চাইছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পানামার ফড়িংরা মোটেই ওই বাজনার তালে তালে পাখার করতাল বাজাল না। কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে থাকার পর হঠাৎ ঐকতান আরম্ভ করল আর সমানে ওই রেকর্ড করা শব্দগুলোকে ছাপিয়ে আগে আগে পাখা বাজাতে লাগল। যেন মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে নিল, কোনওমতেই রেকর্ডের খঞ্জনি শুনবে না। এমনভাবে নিজেদের ফাংশন শুরু করে দিল, যে ঠিক যেন হিসেব করে কয়েক সেকেণ্ড আগে আগে পাখা বাজিয়ে দিচ্ছে। ফলে ক্রমশ দেখা গেল, মাইকের সঙ্গে অমায়িকদের বেজায় তফাত হয়ে যাচ্ছে। পানামার মাঠে জীবন্ত পুরুষ ফড়িং রেকর্ডের বাজনা শুনে প্রেরণা পেলেও, নিজেদের বাজনা ছাপিয়ে কাউকে উঠতে দিল না। আবার নিজেদের মধ্যেও আগে আগে পাখা বাজিয়ে দিয়ে তুমুল রেষারেষির পরিচয় দিল। বিজ্ঞানীদ্বয় নিঃসংশয় হলেন। ফড়িংদের চরিত্র বোঝা গেল। সকলেই কোরাসে লিড সিঙ্গার হতে চায়। এবং একটু আগে আগে সুর ধরে নেয়।

কিন্তু মেয়ে ফড়িংরা কীভাবে প্রত্যুত্তর দেয়। তারা কি ছন্দোবন্ধ সেই সমবেত বাজনা শুনে আকৃষ্ট হয়? না কি, যে ফড়িং আগে আগে হুড়মুড়িয়ে করতাল পেটায় তারই দিকে উড়ে যায়? ব্যস্তবাগীশ ফড়িংদের প্রেমের বাজার দর খুব বেশি নাকি? বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এজন্যে গবেষণাগারে বেশ কিছু মেয়ে ফড়িং জুটিয়ে আনতে হয়েছিল। দুটি স্পিকারে ফড়িংদের খঞ্জনির টেপ বাজছে। একটি প্রথম টেপ। দ্বিতীয়টি তারই অনুপ্রেরণায় পানামার মেঠো ফড়িংদের ঝটিকা বাদ্য। ধরতাই-এর মধ্যে

কতটুকুই বা সময়ের তফাত ছিল। তবু, কী আশ্চর্য, মেয়ে ফড়িং-এর দল সেই ঝটিকা বাদ্য শুনেই উশখুশ করতে লাগল। স্পিকারের গায়ে নাম ঠেকিয়ে, পাখা ঘসে সে কী উচ্ছ্বাসের প্রকাশ। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন — কেন পুরুষ ফড়িংরা প্রেমের গানের জন্যে এত দ্রুতলয় পছন্দ করে।

পুরুষ ফড়িংরা যে কোনও বিলম্বিত লয়ের পাখার বাজনাকে অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারে। রেকর্ড করা 'ফড়িংদের খঞ্জনি' শুনলেই তারা নিজেদের স্পিড বাড়িয়ে দেয়। অদৃশ্য প্রতিযোগীকে হটিয়ে দিতে একেবারে বদ্ধপরিকর। কিন্তু যখন প্রকৃতির কোলে বসে তারা আন্তরিকভাবে প্রেমের বাজনা বাজায়, তখন তাদের কত রকম লয়ই শোনা যায়। যে ফড়িং রেকর্ডের খঞ্জনি শুনে খেপে গিয়ে দুরন্ত বাজনা বাজিয়েছিল, সেই হয়তো উন্মনা প্রহরে ধীরে ধীরে পাখা মেলাচ্ছে। আবার পরমুহূর্তে ঝোপের আড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বীর সাড়া পেয়ে লয় বাড়িয়ে দিচ্ছে। দল বাড়ছে টের পেয়েই দ্রুত লয় থেকে প্রলয়! বনে জঙ্গলে নেহাত প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরকার না হলে ফড়িং অযথা তাল বাড়ায় না। তবে জীব বিজ্ঞানীরা বলেছেন — পুরুষ ফড়িংদের মধ্যে যে যত দ্রুত বাজনা বাজাতে পারে, দলের আগে নিজের খঞ্জনি শোনাতে পারে, মেয়ে-ফড়িংরা তাকেই বেশি পছন্দ করে। তোমার প্রথম গান প্রথম তারার মতো ছুঁয়েছিল মনের আকাশ...। গানে প্রথম হলে বড় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

তবে পুরনো থিওরিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফড়িংরা সম্মেলক সঙ্গীতে সংহতির জন্যে যোগ দেয় না বটে, ঝিঁঝিঁ পোকারা কিন্তু সেই অর্থে পরসঙ্গীত অসহিষ্ণু নয়। জীব বিজ্ঞানীরা কোনও পর্যবেক্ষণই তো বাদ দেন না। তাঁরা একদল অনভিজ্ঞ মানুষকে ঝিঁঝিঁ পোকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ডেকে এনেছিলেন। অনভিজ্ঞ অর্থে, যাঁরা জীব বিদ্যা অধ্যায়ন করেননি, সেইরকম মানুষজন আর কী! গাইয়ে ঝিঁঝিঁদের দুই দলে ভাগ করে দিয়ে বাগানের মধ্যে জলসা বসানো হয়েছিল। একদল হচ্ছে বধির পোকা, তবে মূক নয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণার প্রয়োজনে বেশ কিছু ঝিঁঝিঁ শিল্পীর শ্রবণক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছেন। এর ফলে তারা নিজেরা ডাকাডাকি করলেও, অন্যের ডাক শুনতে পাবে না। ওদিকে বাকি শিল্পীরা সবাই কান বাঁচিয়ে প্রেমের গান গাইতে এসেছে। তো সেই উল্লসিত ঝিল্লি মহোৎসবে কী হল শুনুন। নিঝুম সন্ধ্যায় শ্রোতারা বধির ঝিঁঝিঁদের ঐক্যতানে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। কে কার করকরানি শোনে? বেচারিদের তো শোনার ক্ষমতাই নেই। তারা ভর সন্ধেয় নিঃঝুম পরিবেশ

পেয়ে তারস্বরে ডাক ছাড়ছে। ঝিঁঝিঁদের প্রচণ্ড হল্লা। একটু অনুশীলন তো দূরের কথা, শুনতে না পাওয়ার দরুন সুর মেলানো কোনও উপায়ই নেই। কনসার্টের বদলে বিজ্ঞানীদের চক্রান্তে ঝিঁঝিঁদের নিয়ে কী করুণ ইনসাল্ট। তারও কি সহজে থামে? কে থেমেছে, কে থামেনি, বুঝতেই তো পারছে না। অনেক কষ্টে বধির ঝিঁঝিঁদের প্রেম সঙ্গীত পরিবেশন থেকে নিরস্ত করা গেল।

আর অন্য দল? শ্রবণ শক্তি থাকার জন্যে তারা বটে অর্কেস্ট্রা বাজালে! ঝিঁঝিঁদের খঞ্জনি, করতাল ঝাঁঝর মিলে সে কী অনবদ্য প্রণয় সঙ্গীত! জীব বিদ্যায় অনভিজ্ঞ হওয়ার সত্ত্বেও সে আসরে আমার ডাক পড়েনি। না হলে কোনও কোনও বিজ্ঞানীদের সমর্থনেই বলতে পারতাম — জীব জগতেও সঙ্গীতের জন্যে সমঝোতা থাকে। ফড়িং-এর রেষারেষির বাজনা, উচ্চিংড়ের কালোয়াতি, ঝিঁঝিঁর ধাতব শব্দ অথবা মৌমাছির গুঞ্জরণ কি সম্মিলিত পতঙ্গ সঙ্গীত নয়? রীতিমত রেওয়াজি অনুষ্ঠান বলে মনে হয় না? উপযুক্ত মুহূর্তে এলেই কীভাবে সমস্বরে সুর মেলাতে বসে। প্রেম, প্রকৃতি, পূজা — যে কোনও ভাবনার প্রি-লিউড সৃষ্টিতে পতঙ্গের পাখোয়াজ বাজছে। মৌমাছি উড়ে যাচি ফুলে দখিনা, পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা...।

হারানো সুর

ঠাকুমাকে বাচ্চুদা বলেছিল ইংরেজি সিনেমা দেখাবে। ঠাকুমার বেশ আপত্তি। মাথা নেড়ে বলেছিলেন—"দূর! খালি হাউ হাউ চিৎকার! মেয়েগুলোর তো লজ্জা বলেও কিছু নেই! আমি যাব না।" বাচ্চুদাও ছাড়বে না। ডাক্তারি পাস করে ইংল্যান্ড চলে যাচ্ছে। যাবার আগে বাড়ি সুদ্ধ সবাইকে সিনেমা দেখাবে। এমনকি আমাদের কাজের লোক রাসমণি আর শ্যামাদাসীর জন্যেও টিকিট কেটেছে। ঠাকুমার তাতে আরও রাগ। এমনিতে ঠাকুরের বইটই হলে নিজেই ওদের মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে যান। রাসমণি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। মলিনাদেবী যতবার নি..মা..ই নি..মা..ই করে কাঁদছিলেন, রাসমণি ততবার থান কাপড়ে চোখ মুছেছে। আমি তো পাশে বসেই দেখেছি।

শ্যামাদাসী "সাধক রামপ্রসাদ" দেখেছে। রাত্তির বেলা শুতে যাওয়ার আগে আমার বেড়াবিনুনি বেঁধে দিতে দিতে নাকি সুরে সে কী গান! ওরে মুক্ত কেশীরে, তোর শক্ত বেড়া রে...।

রাসমণি অবশ্য "জয় মাকালী বোর্ডিং"ও দেখেছে। কালীঠাকুরের বই ভেবে ঠাকুমার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। সুতরাং সিনেমা যে ওরা দ্যাখে না, তা নয়। কিন্তু ওদের ইংরেজি বই দেখানোর জন্যে বাচ্চুদার আদিখ্যেতা ঠাকুমার পছন্দ হচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত সকলেই গেলাম। বাচ্চুদা ঠাকুমাকে বলেছিল ছবিটার নাম "লস্ট টিউন"। ঠাকুমা হলে গিয়ে দেখলেন উত্তম-সুচিত্রার "হারানো সুর" আমরা আগেই জানতাম ঠাকুমাকে নিয়ে একটু মজা করা হল। ইংরেজি বই

দেখতে হবে শুনে বাড়িতে রাসমণি বেশ মুষড়ে পড়েছল। শ্যামাদাসীও "অম্বলের" ছুতো দেখিয়ে জোয়ান চিবিয়ে সিঁড়ির তলায় শুতে যাচ্ছিল। বাচ্চুদা অ্যালুড্রক্স খাইয়ে ধরে এনেছে। বাংলা বই হচ্ছে দেখে দুজনের এক গাল হাসি। ইন্টারমিশনে দেখলাম শ্যামাদাসী রাসমণিকে লেকচার দিচ্ছে — "দ্যাখ পাগলছাগলের জন্যে ও বউটার কত মায়া!"

আসলে রাসমণি তার পাগল বরের হাতে পিটুনি খেয়ে মেদিনীপুর থেকে পালিয়ে এসেছিল। বহুকাল আমাদের বাড়িতে আছে। "হারানো সুরের" উপপাদ্য শুনে কচর মচর করে পান চিবোচ্ছিল।

এত বছর পরেও কথাগুলো মনে পড়ে। ভবানীপুরের সিনেমা হলে বসে "লস্ট টিউন" দেখা, বাংলা বই শুনে ঠাকুমার সোয়াস্তি, আমাদের হাসাহাসি, শ্যামাদাসী আর রাসমণির মুহুর্মুহু হাসিকান্না — কিছুই ভুলিনি। আজকের লেখাটা শুরু করার আগে ওপরে নাম ঠুকে দিলাম "হারানো সুর"। ওই দু/চারটে প্রেমকাহিনী আর কি? ভারত প্রেমকথার বদলে মার্কিন পুনর্মিলন কথা।

আমাদের কাছাকাছি একটি শহরের নাম মন্টক্লেয়ার। সেখানকার হাইস্কুলে পড়ত জেনি কোবেল। আর নিউজার্সির দক্ষিণ অঞ্চলে প্রিন্সটন ইউনির্ভাসিটিতে পড়ত মাইক মিলান। প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। জেনি তখন টুয়েলভথ গ্রেডের ছাত্রী। এক বন্ধুর সূত্র মাইকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দুজনে ডেট করতে শুরু করেছিল। মাইক প্রিন্সটন থেকে পাস কয়ে ওয়াশিংটনে চাকরি নিল। জেনি কলেজের পড়া শেষ না করেই ওয়াশিংটনে চলে গেল। এক বছর মাইকের সঙ্গে থাকার পর সম্পর্ক ভেঙে গেল। ওই বয়সে বিয়ের ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ হয়নি। দুজনের যে যার মতো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগ ছিল না। দেখা-সাক্ষাতেরও প্রশ্ন নেই। তবে দুজনেই তাদের বাবা, মায়ের কাছ থেকে মাঝে মাঝে খবরাখবর পেত। ক্রিসমাসের সময় কার্ড পাঠাত।

জেনি একদিন মাইককে তার বিয়ের চিঠি পাঠাল। কিছুদিন পরে মাইকের বিয়ের কার্ড পেল। সে বছর থেকে ক্রিসমাস কার্ড পাঠানো বন্ধ হল। '৮২ সাল থেকে আর কোনও যোগাযোগই ছিল না। দুজনেই বিবাহিত। কেউ কারও খবর নেওয়ার চেষ্টা করেনি।

চার বছর পর জেনির বিয়ে ভেঙে গেল। ইতিমধ্যে মাইকেরও ডিভোর্স

হয়েছে। বাবা, মা'র কাছ থেকে জেনির খোঁজ খবর নিয়ে মাইক তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইল। নিউজার্সি থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে একবার জেনির বাড়ি থাকবে কথা ছিল। কিন্তু সেখানে তে-রাত্তির কেটে গেল। পুরনো কথা আর ফুরোয় না।

তারপর, আবার আসিব ফিরে কথা দিয়ে মাইক চলে গেল। জেনি বুঝতে পারছিল এ দেখাই শেষ দেখা নয়। মাইক নব প্রেমিকের বেশে ফিরে এসেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন করে তো আর চিনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেখান থেকে তারা দূরে সরে গিয়েছিল, সেখানে থেকেই আবার কাছাকাছি আসবে। তবে সময় দিতে হবে। এত বছর দেখা হয়নি। মানুষের তো পরিবর্তনও হয়। বিয়ে করে একসঙ্গে থাকার জন্যে মানসিকতার মিল থাকা দরকার। জেনি তাই অপেক্ষা করতে চাইছিল। তিন বছর দেখাশোনার পরে ওরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিল। জেনি আর মাইক এখন ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্টা বারবারায় থাকে। ওদের মেয়ের নাম ন্যাটালি। মাইকের ধারণা বাবা, মা'র কাছে জেনির খোঁজে খবর না পেলেও জেনিকে সে ঠিকই একদিন খুঁজে বার করত। প্রথম বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকে জেনির কথাই তার বার বার মনে হয়েছে। জেনির বিয়ে ভেঙে গেছে জেনে, তখন সে দেখা করতে চেয়েছে। জেনির ধারণা তাদের ফল্গুধারার মতো প্রেম হামেহাল তলে তলে বয়ে যাচ্ছিল। একটু হৃদয় খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়েছে। এত বছর পরে মাইক যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেল, জেনির হর্ষ, পুলক, স্বেদ, কম্প তো হয়েছিল। এমনকি ফোনে মাইকের অমায়িক কণ্ঠস্বর শুনেই বুকের মধ্যে দুন্দুভি বেজেছিল ডিম ডিম রবে। রাতে ঘুম হচ্ছিল না। জেনির ভাষায় একেবারে সেই প্রথম প্রেমের মতো ঘোর লাগা ভাব। যাইহোক অমর প্রেমকথা (নাম্বার ওয়ান) শেষ হল।

এবার দু'নম্বর গল্প। পটভূমি টেকসাস। সময় উনিশশো পঞ্চান্ন। ছেলেটির নাম স্টুয়ার্ট। মেয়েটির নাম প্যাট্রিশা। দু'জনেরই তখন চোদ্দো বছর বয়স। চার বছর ধরে মেলামেশার পর আঠারোয় পৌঁছে প্রায় বিয়ে করে ফেলছিল। কী খিটিমিটি লাগতে সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেল। ব্যস! স্টুয়ার্ট চলে এল নিউইয়র্কে। অভিনয় শেখার জন্যে নিউইয়র্ক ইউনির্ভাসিটিতে ভর্তি হল। প্যাট্রিশার তখন হিপিদের হাওয়া লেগেছে। ষাটের দশকের উন্মাদনায় ভেসে সে চলে গেল স্যানফ্র্যানসিসকো। দুটি পাখি দুটি তীরে, মাঝে তিন হাজার মাইলের দূরত্ব।

স্টুয়ার্ট কলেজ পাশ করে অভিনয় আর পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টেলিভিশনেও কাজ পায়। দু'বার বিয়ে হল আর ভাঙল। ওদিকে প্যাট্রিশারও দু'বার ডিভোর্স হয়েছে। সে টেকসাসে ফিরে গেছে। ডালাসের জেলখানায় প্যারোল অফিসারের চাকরি করে। স্টুয়ার্ট থাকে লস অ্যাঞ্জেলেসে। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়। এই যোগাযোগের ব্যাপারটা অবশ্য বরাবরই থেকে গেছে। স্টুয়ার্ট কখনও জিজ্ঞেস করত — "আমি তো বিয়ে করেছি। তুমি?" মনে মনে আশা করত প্যাট্রিশা বলবে — "না, এখনও করিনি।" প্যাট্রিশাও একই কথা ভাবত।

সেই চোদ্দো বছরের প্রথম প্রেমের পর প্রায় ত্রিশ বছর এভাবে কাটল। অবশেষে শুভক্ষণে স্টুয়ার্ট ডালাসে গিয়ে দেখা করল। ঠিক দেখা করতেই যে গিয়েছিল, তা নয়। টেলিভিশনের কাজে হিউস্টন যাওয়ার পথে এক পলকের একটু দেখার সুযোগ পেল।

তারপর আর দেরি নয়। বিয়ে হয়ে গেল। সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনে এখন তারা ভালই আছে। থাকে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার গ্যাঞ্জেস শহরে। প্রেমযমুনার বদলে প্রেমগঙ্গার তীরে। স্টুয়ার্ট বলে — ভাগ্যিস, প্রথমবারই আমরা বিয়ে করে ফেলিনি। অল্পবয়সের বিয়ে ধোপে টিকত না। মাঝে অনেক বছর কেটে গেছে। দুজনেই নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি। এখন পরিণত মন নিয়ে বুঝতে পেরেছি দুজনেই দুজনের উপযুক্ত সঙ্গী হয়েছি। আর নতুন করে পরস্পরকে 'ইমপ্রেস' করার চেষ্টা করতে হয়নি। কোথাও যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল।

প্যাট্রিশা বলে — প্রথম জীবনেও এই বোঝাপড়া হতে পারত। তাহলে মাঝে এই ত্রিশ বছর নষ্ট হত না। আসলে তখন আমাদের জিপসিদের মতো মুক্ত জীবনের নেশা ধরেছিল। ঘর বাঁধার মতো কোনও বন্ধন অনুভব করিনি। কে জানে? হয়তো এইই ভালো হয়েছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রায়রিটি' বুঝতে শিখেছি। তার দরকার ছিল।

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ মাঝে ফুল কুড়িয়ে পাওয়ার আরও গল্প আছে। এবার সেই তিন নম্বর।

নিউইয়র্কের এক পত্রিকার সম্পাদিকা জোন ক্রোন তাঁর হাইস্কুলের প্রেমিকাকে পুনরাবিষ্কার করলেন রি-ইউনিয়নে গিয়ে। সেবার ছিল পঁচিশ বছর আগে পাস করা ছেলে মেয়েদের রি-ইউনিয়ন। সেখানে জনের সঙ্গে

জোনের দেখা হল। দুজনে কোণে বসে খুব গল্প করলেন। কিছুক্ষণ নাচলেন। দুজনেই বিবাহিত। ঘর, সংসার ছেলে মেয়ে আছে। কিন্তু কী যে প্রেমের জোয়ার এল, ঘর সংসার ভেসে গেল। জোন তাঁর স্বামীকে ছাড়লেন। জন ছাড়লেন তাঁর বউকে। দু'বাড়িতেই অশান্তি করে নিজেরা শান্তিনিকেতন খুঁজছেন। দু'বছর পর জন আর জোনের বিয়ে হল।

সম্পাদিকা জোন ক্রোনের বক্তব্য — এভাবেই সমবয়সি বয়স্ক লোকেদের মধ্যে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। সবাই যদি পুরানো প্রেমিক প্রেমিকাকে খুঁজে পায়, তবেই বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে কাছাকাছি বয়সি মহিলার বিয়ে হওয়া সম্ভব। নয়তো পুরুষদের তরুণী ভার্যা খোঁজার প্রবণতা ঠেকানো যাবে না।

যাইহোক, জোন অন্তত একজনকে ঠেকাতে পেরেছেন। সে 'জন' ও প্রেমের ভাব জানেন। বলেছেন — যত বয়সেই আবার দেখা হোক, বাল্যপ্রেমের আবেগ ফিরে ফিরে আসে।

হায় শৈবলিনী! হায় প্রতাপ! বৃথা ডুবিয়া মরিলি! দেখা যাচ্ছে, পুরাতন প্রেম সব সময় নবপ্রেমজালে ঢাকা পড়ে না। বহু বছরের মাকড়শার জাল সুদ্ধ ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে আসে। তখন উর্ণনাভের আড়ালেই পুর্ণকুম্ভ। তাই তুমি ওগো রা... নি...।

ডেভিড নামে এক প্রেমিক সেরকমই বলতে চাইছেন। তিনি গল্প লেখেন। থাকেন লস অ্যাঞ্জেলেসে। সেই চৌষট্টি সালে কলেজে ঢুকেই ডেভিড প্রেমে পড়েছিলেন। মেয়েটির নাম জুলি। ঘন ঘন দেখা হচ্ছে। সাহস করে ডেভিড একদিন জুলিকে তাঁর বন্ধুর ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেলেন। কিন্তু জুলির অনিচ্ছে বুঝে তেমন ঘনিষ্ঠ হওয়া গেল না। জুলি যেন একটু দূরত্ব রাখতে চায়। ডেভিড তাই মেনে নিলেন। কিন্তু বন্ধুত্ব বজায় থাকল। এক সময় ডেভিড চলে গেলেন তাইওয়ানে। জুলি ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে। কুড়ি বছর কেটে গেল। দুজনেই অন্য লোককে বিয়ে করেছেন। কিন্তু ক্ষীণ একটা যোগসূত্র রয়ে গেছে। মাঝে ডেভিডের বউ তাঁকে ছেড়ে দিলেন। জুলির বিয়েও নড়বড় করছে। হঠাৎ নব্বই সালে দু'জনে আবার দেখা হল। "জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার। তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার...।"

এদের অবশ্য রাজপথে দেখা হল। এবং বারংবার দেখা হল। জুলির

বাড়িতে গিয়ে ডেভিড বললেন — "তোমাকে এখনও ভালবাসি। আমার চোখে আজও তুমি সেই অষ্টাদশী। আর দূরে রেখো না।"

চুয়াল্লিশ বছর বয়সে নিজেকে অষ্টাদশী শুনলে কে না খুশি? জুলি আর দূরে থাকতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বিয়েও হয়ে গেল। দশ বছরে সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে বলে দুজনেই জানিয়েছেন। আর চিড় খাবে বলে মনে হচ্ছে না। একটি মেয়েকে অ্যাডপ্ট করেছেন। আগের পক্ষের দু/চারজন ছেলে মেয়েও আসে যায়। ডেভিডের বিশ্বাস ভগবানের আশীর্বাদেই দুজন দুজনকে ফিরে পেয়েছেন।

জুলি খুশি। কারণ ডেভিডের কাছে তিনি আঠারোয় আটকে আছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ডেভিড তাঁকে সত্যি সত্যি ওই বয়সে দেখেছিলেন। এখন কাউকে বিয়ে করতে গেলে জুলি কি আর ওই বয়সের রূপলাবণ্য দেখাতে পারতেন?

এবার চার নম্বর লস্ট টিউন। লাস্ট টিউনও বলা যায়। কারণ শেষ গল্প। নায়ক হচ্ছে মনের ডাক্তার। নাম ডঃ জিমি হাই। সেই ষাট সালে প্রথম বার প্রেমে পড়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স সবে ষোলো। আর, স্কুলে এক ক্লাস নীচে পড়া মেয়েটির নাম মিশেল। তার বয়স পনেরো। তো মিশেলের সঙ্গে মিশে জিম এত অভিভূত যে ভবিষ্যতে বিয়ে করবেন বলেই ভেবে নিলেন। কিন্তু তখন তো ঢের পড়াশোনা বাকি। জিম ডাক্তারি পড়তে ঢুকলেন। মেডিকেল স্কুল, ইনটারশিপ, রেসিডেন্সি, ফেলোশিপ মিলিয়ে আট বছরের ধাক্কা। জিম চাইলেন মিশেল যদি সে সময় তাঁর সঙ্গে এসে থাকে। মিশেল রাজি হলেন না। সদা ব্যস্ত ডাক্তারি ছাত্রের সঙ্গে বছরের পর বছর থাকা সোজা কথা নয়। সম্পর্কের স্থায়িত্বই বা কতটুকু?

দুজনের দেখাশোনা বন্ধ হয়ে গেল। বহু বছর কেউ কারও খবর জানেন না। মিশেল ইন্ডিয়ানা থেকে শিকাগো চলে গেছেন। বিয়ে করেছেন। জিম সায়ইক্রিয়াট্রিস্ট হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে প্র্যাকটিস করেন। তিনিও বিয়ে করেছেন। কিন্তু বউ-এর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। যা হয়, ডিভোর্স হয়ে গেল। জিম কার কাছে শুনলেন মিশেল শিকাগোয় থাকেন। তাঁর স্বামী গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। জিম যখন একটি মেডিকেল কনফারেন্সের জন্যে শিকাগো গেলেন, ফোন করে মিশেলের সঙ্গে দেখা করলেন।

তারপর ন'মাস ধরে দুজনে ফোনাফুনি চলল। ফোনেই নতুন করে প্রেম নিবেদন এবং গ্রহণ। জিম বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মিশেল তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে গেলেন। বিয়ে হয়ে গেল।

এঁরা কিন্তু একবারও বলছেন না যে হারানো প্রেম মানেই আসল প্রেম। মিশেলের বক্তব্য — আমার স্বামী নেই বলে নতুন করে সংসার শুরু করেছি। ডাক্তার জিম-হাই-এর বক্তব্য — আসলে মনমতো বউ পাওয়া অত সোজা নয়। এক বউ এর সঙ্গে বনল না বলে আবার বউ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম আর পছন্দের মানুষ পেয়ে গেলাম, এত সহজ ব্যাপার। সেদিক থেকে বলব, দ্বিতীয় বিয়ের সময় পুরনো চেনজানা কারও সঙ্গে ডেট করা ভালো। অনেক কিছু কমন থাকে। পুরানো স্মৃতি থাকে। দুজনের দোষগুণও কিছুটা জানা থাকে। তার ওপর ভিত্তি করে মানিয়ে নেওয়া যায়। আমাদের কি এখন আর ঝগড়াঝাঁটি হয় না? ঠিক কমবয়সে যা নিয়ে তর্ক লাগত, এখনও সেরকম হয়। কিন্তু এখন আমরা পোড় খাওয়া লোক। মাথা গরম করতে চাই না। ঠাণ্ডা মাথায় মিটিয়ে নিতে চেষ্টা করি। কারণ, ম্যাচিওরিটি এসেছে। জানি, তুচ্ছ কারণে নিজের 'ইগো'কে বাড়িয়ে লাভ নেই। এবার আর বিয়ে ভাঙার ঝুঁকি নেওয়া চলে না। আসলে বিয়ে মানেই সারা জীবন ধরে মানিয়ে গুনিয়ে চলা। সে প্রথম বিয়েই হোক, কি দ্বিতীয় বিয়েই হোক। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কিংবা প্রত্যেক বিষয়েই মতের মিল হবে — এতখানি আশা করা যায় না।

মনোবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ তো। সকলের জন্যেই লেকচার দিয়েছেন। অন্য মনোবিজ্ঞানীরাও সুর মিলিয়েছেন। এঁরা বলেছেন — কেন লোকে পুরনো প্রেমিক প্রেমিকাকে খোঁজার চেষ্টা করে? কেনই বা বহু বছর পরে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে চায়? এর কারণ এমনও হতে পারে, তারা প্রথম জীবনে নানা পরিস্থিতির জন্যে সম্পর্ক ধরে রাখতে পারেনি। পরে টের পেয়েছে ভালাবাসা মরে নাই, মরে নাই। দিল হুম হুম করে। মনে হয় জীবনে এক অসম্পূর্ণ অধ্যায় রয়ে গেছে। কথা দিয়ে কথা রাখা হয়নি। যদি আর একবার দেখা হয়, কথা হয়...।

দ্বিতীয় কথা — চেনা মানুষের কাছে ফিরে যাওয়ার স্বস্তি। অচেনা লোকের খপ্পরে পড়ে আবার তুলকালাম লাগবে ভেবে ভয় হয়। তার চেয়ে চিরচেনাকে অচিরে ধরে আনা যাক।

অবশ্য এ হচ্ছে একদল প্রেম-বিশারদের ব্যাখ্যা। অন্য দল বলছেন — পুরনো প্রেম মানেই যে একেবারে নির্বিচার, নির্বিবাদ সহাবস্থান, তা মোটেই নয়। আবারও মতান্তর হতে পারে। একবার সম্পর্ক ছেদ হয়েছিল মানে কিছু বিভেদ তো আগে থাকতেই ছিল। তারপর এত বছরের ব্যবধানে সেই অমিল

আরও বেড়েছে কি না কে বলতে পারো? বেশি বয়সে মানুষের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, নীরব জেদ, কিছুটা স্বার্থপরতা আসে। কমবয়সের আবেগে সে যা ছাড়তে রাজি থাকে, পরে সেই উচ্ছ্বাস বা ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব না থাকতেও পারে। তার এতদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসুক, অনেকেই তা চায় না। দুজনের মূল্যবোধও হয়তো অন্যরকম। সুতরাং হাইস্কুলের সুইট-হার্ট ছিল মানেই সে এখনও মোহের ঘোরে আছে আর সব হুজুগে তাল দিচ্ছে — আশা করাই ভুল। দৈনন্দিন জীবন লাগাতার আপসের নাম বিয়ে। সে পুরনো প্রেম হলেও যা, নবপ্রেমেও তাই।

ডঃ রিচার্ড অ্যাটকিন নামে এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কিন্তু খুব আশা দিয়েছেন। বলছেন — প্রেমের নবীকরণ এক অভিজ্ঞতা। মধ্যবয়সে মানুষ হারানো অনুসঙ্গ খোঁজে। সে এমন এক সম্পর্ক গড়তে চায়, যার স্থায়িত্ব আছে। যে ভালবাসায় ধৈর্য, ক্ষমা আর বিশ্বাস আছে, সেই গভীর সম্পর্কের প্রত্যাশায় হারানো বন্ধুকে খোঁজে। ভাবে এত বছরের চেনাশোনায় একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েই আছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কারও কারও আত্মবিশ্বাস কমে আসে। অর্থাৎ "সেলফ-এস্টিম" কমে যেতে পারে। যৌবন চলে গেছে ভেবে নিজের কাছেই যেমন নিজেকে মূল্যহীন মনে হচ্ছে। নারী, পুরুষ দুজনের ক্ষেত্রেই তা ঘটে। এরকম পরিস্থিতিতে সে যদি তার প্রথম যৌবনের সঙ্গী বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহচর্য ফিরে পায়, মনে স্বস্তি অনুভব করে। আর নিজের রূপ, যৌবন, কর্মক্ষমতা বা সাফল্যের প্রমাণ দিয়ে যোগ্যতার পরীক্ষার প্রশ্ন নেই। এবার অন্য খেলা। পরিণত অনুভূতি দিয়ে পরস্পরকে বুঝে নেওয়া।

এই নবগ্রহণ প্রসঙ্গে এক মহিলা বলেছেন পুরনো সম্পর্কের মাধুর্যই আলাদা! গানে গানেই সময় কেটে যায়। আমি যত পুরনো গান জানি, সেও সেগুলো জানে। এই এক লাইন গেয়ে উঠলাম, তো সেও সঙ্গে সঙ্গে গলা ছাড়ল। পৃথিবী সব সুর আমাদের মনে...

আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ আর গৌরী ঘোষের প্রসঙ্গে সাংবাদিক কবি অমিতাভ চৌধুরী বলেছিলেন — "পার্থ গৌরীর গলায় গলায় ভাব।" সেই কথাটাই মনে পড়ছে। যদিও প্রেমে নবায়নের জন্যে তাঁদের আর 'নবগ্রহের' দরকার হয়নি। চিরকালই দুজনে গলায় গলা মিলিয়ে যাচ্ছেন। কবিতা থেকে কবিতায়।

হারানো সুরের মহিমা তো লিখলাম। খবরের কাগজে "রি-ইউনিয়নের" ঘোষণা দেখলেই দিনটিনগুলো খোয়াল রাখবেন! আমাদের এখানে "বঙ্গসম্মেলনে" তো এখন পুনর্মিলন উৎসবের ধুম পড়ে গেছে। "প্রেসিডেন্সি কলেজ অ্যালামনাই মিট", "যাদবপুর", "বাঁকুড় কলেজ সম্মিলনী" — মহাসুযোগ! কে কার সঙ্গে চাপা সুরে "আজ দুজনার দুটি পথ" ধরেছে, সেই লস্ট টিউনের খোঁজ নিতে যাব।

নববর্ষে মালিশ উপহার

গত কয়েকবছর ধরে ক্রিসমাসে মেয়ের কাছ থেকে 'মালিশ' উপহার পাচ্ছি। অনেকদিন থেকেই ওকে শৌখিন জিনিসপত্র কিনে দিতে বারণ করি। এত কিছু ব্যবহারও করি না। শুধু শুধু অপচয়। মেয়ে তাই ঠিক করেছে এমন উপহার দেবে, যা পড়ে থাকবে না, মাঝে মাঝে নিউইয়র্কে ব্রড-ওয়ে শো দেখাতে নিয়ে যায়। আর মালিশের গিফ্‌ট-সার্টিফিকেট দেয়। আমার নাকি সেটাই সবচেয়ে দকার। এই যে শীত পড়লেই একবার জ্বরে পড়ি, কোনওবার টনসিল চাগাড় দেয়, কোনওবার সর্দিতে হাঁসফাঁস, তো এরকম ম্যাজমেজে শরীরকে চাঙ্গা করতে মাসাজ সেন্টারে গেলেই নাকি হাতে হাতে ফল পাওয়া যাবে। থেরাপিস্টের হাতের কেরামতিতেই কেল্লা ফতে।

কিন্তু একঘণ্টার জন্যে একশো ডলার দিয়ে সুইডিশ্‌ মাসাজ নিতে আমার গা করকর করে। নিজের পয়সায় যাব না বুঝে, মেয়ে তাই বছরে তিন-চারটে করে গিফ্‌ট সার্টিফিকেট উপহার দিচ্ছে। অতএব জন্মদিন, বিয়ের তারিখ, মাদার্স্‌ ডে, ক্রিসমাস, যখনই সেই সার্টিফিকের্ট হাতে পাচ্ছি, খুব কষে তেলমালিশ করিয়ে আসছি।

মাসাজ সেন্টারে কাস্টমারদের কী খাতির! প্রথমেই কফি আর চকোলেট, বিস্কুট সাজিয়ে দেবে। তারপর মাসাজ থেরাপিস্ট এসে মিষ্টি হেসে একটা ছোট্ট ঘরে ডেকে নিয়ে যাবে। সেই মালিশঘরের সরু বিছানায় বালিশ পেতে শুইয়ে মহাসমারোহে শুরু হবে তার দলাই-মলাই।

ঘর প্রায় অন্ধকার। দূরে সুগন্ধী মোমবাতি জ্বলছে। রেডিওতে রিমঝিম বাজনা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। কপালের ওপর টুপটুপ করে আয়ুর্বেদিক তেলের ফোঁটা পড়ছে। মগজধোলাই দিয়েই মালিশের শুভারম্ভ। কিন্তু

প্রথমবার একজন জাঁদরেল মহিলা আমার চুলের মুঠি ধরে এমন মোচড় মারছিল যে, বাধ্য হয়ে থামাতে হল। তারপর থেকে দেখেছি থেরাপিস্টরা আগেই জিজ্ঞেস করে — তুমি কীরকম চাপ পছন্দ কর? জব্বর? মাঝারি? না, মৃদু চাপ?

জব্বর যে কী জিনিস, সে ও প্রথমবার জাঁদরেল মালিশওয়ালির হাতের ভীম রদ্দা খেয়েই বুঝেছিলাম। কিন্তু পয়সা দিয়ে মৃদুচাপ-ই বা চাইব কেন? জাদুর গায়ে হাত বোলানোর জন্যে টাকা দেব? আমি মাঝারি মানুষ, মাঝারি চাপ নেব। সেই থেকে ওদের বলে দিই — পুট মিডিয়াম প্রেসার। তারপর মটকা মেরে পড়ে থাকি। মাঝে একজন বক্তিয়ার থেরাপিস্টের পাল্লায় পড়েছিলাম। সে মহিলা নাকি 'যোগা' শিখে এমন ক্ষমতা পেয়েছে যে, শুধু মালিশ করেই সাইনাস, ব্রঙ্কাইটিস, পেটের গ্যাস, হাঁটুর আড়ষ্ট ব্যথা, সবকিছু কমিয়ে দিতে পারে। এমনকি শরীরের কোথাও যদি শিরা-উপশিরা জট পাকিয়ে কুণ্ডলি হয়ে থাকে, সেই বিষগেরোও খুলে দিতে পারে। আমার সেদিন একটু সর্দিসর্দি ভাব ছিল। ওকে বললাম — এই কনজেস্‌টেড ভাবটা সারাতে পারবে?

ওরে বাবা! চ্যালেঞ্জ পেয়ে সে দু'হাতের চেটোয় চপচপে করে ইউক্যালিপটাস্ অয়েল মেখে নিল। তারপর রুটির আটা মাখার মতো করে আমার কপাল থেকে গলা পর্যন্ত এমন চটকাতে লাগল যে মালিশের দফারফা। আর মাঝে মাঝেই বলে উঠছে — "সি, দ্য ব্যাড পার্টিকল্‌স্ আর কামিং আউট।...

শরীরের দূষিত অণুপরমাণু, না কুপিত বায়ু — কী যে সে বাইরে টেনে আনছিল জানি না। কিন্তু আমাকে কুপিত করে সে কাস্টমার হারাল। আর কোনওদিন তার কাছে যাইনি। দু'টি চেনা মাসাজ থেরাপিস্টের সঙ্গেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিই। এদের মুখে বাত নেই। নীরবে তৈলমর্দন করে যায়। সময় ফুরিয়ে গেলে ঘরের আলো জ্বেলে, এক গ্লাস জল খাইয়ে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যায়।

এদেশে মাসাজ ব্যাপারটাকে এখন আর 'হেলথ স্পা'তে গিয়ে শুধু শারীরিক আরাম হিসেবে দেখা হয় না। ক্রমশই মালিশের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা শোনা যাচ্ছে। মালিশ এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যে, ছোট ছোট শহরে বিউটি স্যালন থেকে শুরু করে বড় বড় শহরের হোটেলে, ক্রুজশিপে

যাত্রীবাহী জাহাজের হেল্‌থ-স্পা, বিউটি স্যালনেও মাসাজের ব্যবসা থাকছে। আজ থেকে আট-দশ বছর আগে এদেশে ৮% লোক দু-একবার মাসাজ করাত। এখন প্রায় ২৫% লোক বছরে দু-তিনবার মাসাজ সেন্টারে যাচ্ছে। সাধারণত দেখা যায় পঞ্চান্ন বছর থেকে চৌষট্টি বছর বয়সি লোকেরাই (নারী-পুরুষ মিলিয়ে) মাসাজ পছন্দ করে। আগে ছিল দলাই-মলাই করে শরীরের কিছুক্ষণের জন্যে আরাম দিয়ে ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে উপযুক্ত মালিশ শুধু শরীরের নয়, মনেরও ক্লান্তি দূর করে। মানসিক স্বস্তি, উদ্বেগমুক্তভাব এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চারের ক্ষেত্রেও নাকি মালিশের কিছু ভূমিকা আছে।

মনোবিজ্ঞানীদের কারও কারও মতে, আধুনিক জীবনযাত্রায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। তারা মনে মনে সেই বিচ্ছিন্নতাকে অনুভব করে। আমরা বাংলায় যাকে বলি স্পর্শের কাঙাল, অনেকটা সেরকম অবস্থার কথাই বোধহয় এঁরা বলতে চাইছেন। আগেকার দিনের মানুষজন অনেকটাই কাছাকাছি থাকত। হাতের ছোঁয়ার মাধ্যমেই স্নেহ, প্রেম ভালোবাসার প্রকাশ এবং সেবা-যত্ন, পরিচর্যায় সন্তুষ্টি অনুভব করা যেত। শুধু রোগশয্যায় নয়, সামান্য মনখারাপ হলেও প্রিয়জনের স্পর্শই ছিল আজকের ভাষায় 'টাচ থেরাপি'। এই ঘোড়দৌড়ের যুগে, একটি পরিবারের মধ্যে অত সান্নিধ্যের অবকাশ নেই। অথচ শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে মানুষ এখনও সেই স্পর্শ আশা করে। নিজের লোকের যদি গায়ে মাথায় হাত বুলোনোর সময় না থাকে, গা-হাত টেপানোর জন্যে বাড়িতে কুচোকাচা কিংবা কাজের লোক না থাকে, তখনই পেশাদারী মালিশওয়ালা বা ওয়ালির প্রয়োজন পড়ে। এভাবেই ক্রমশ মাসাজের চাহিদা বেড়ে চলেছে। শুধু আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পেশাদারি মালিশবিশেষজ্ঞ বা মাসাজ থেরাপিস্টরা ভালো উপার্জন করছে।

টিফ্যানি ফিল্ড নামে এক মহিলা ফ্লোরিডার 'ইউনিভার্সিটি অফ্ মায়ামি স্কুল অফ্ মেডিসিনে' ডেভেলপ্‌মেন্টাল সাইকোলজি পড়ান। ইনি অনেক বছর ধরে 'স্পর্শ চিকিৎসা ও আরোগ্য' সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে সমর্থন না পেয়ে টিফ্যানি তাঁর তত্ত্বকে প্রমাণ করার জন্যে মেডিকেল কলেজের সাহায্য নিলেন। তেরো বছর আগে মায়ামির এই কলেজে 'টাচ রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করলেন।

টিফ্যানি ফিল্ড ও তাঁর সহযোগী গবেষকদের অন্তত একশোটি গবেষণাপত্র এ পর্যন্ত বহু মেডিকেল ও সাইকোলজিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আমেরিকার 'ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউটস্ অফ্ হেল্থ' থেকেও বেশি কিছু পত্রিকায় এ বিষয়ে লেখা হয়েছে। স্পর্শ চিকিৎসাকে বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতির তালিকায় রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই কি মালিশের কোনও উপযোগিতা আছে? দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে ঠিক মতো মালিশ করতে পারলে বারোমেসে কোমর ব্যথা থেকে সাময়িক আরাম পাওয়া যায়। ব্যথার ওষুধের দরকার পড়ে না। আর্থ্রাইটিস্, মাইগ্রেনের মাথার যন্ত্রণা তো বটেই, এমনকি হাঁপানি, ডায়াবেটিস্, ডার্মাটাইটিস ধরনের চর্মরোগের ক্ষেত্রেও থেরাপিউটিক মাসাজে উপকার পাওয়া যায়। বৃদ্ধ মানুষদের নিয়মিত মালিশ করলে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকে। তাঁদের শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে এবং দীর্ঘদিন শুয়ে থাকার ফলে 'বেডসোর' হওয়ার সম্ভাবনাও ঠেকিয়ে রাখা যায়। মাসাজথেরাপি বিষণ্ণতা রোগ প্রতিকারে সাহায্য করে এবং সাময়িকভাবে রক্তচাপ নামিয়ে আনে।

মাসাজ মস্তিষ্কে 'এনডরফিনস্' নামে এক স্বাভাবিক ব্যথানিরোধকারী উপাদানের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। এবং 'ন্যাচ্রাল কিলার সেলস্'-এর উপাদান বাড়িয়ে দিয়ে দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে সাহায্য করে। পার্কিনশনস্ রোগে পেশির অনমনীয়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে মাসাজের প্রয়োজন আছে। অল্ঝাইমার্স রোগীর উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রেও সঠিক মাসাজের সুফল লক্ষ করা গেছে। ক্যানসার হাসপাতালে রোগীর যন্ত্রণা উপশমের প্রয়োজনে এবং কেমোথেরাপির পরে বমিভাব দূর করার জন্যে থেরাপিউটিক মাসাজ দেওয়া হচ্ছে।

গবেষকরা জানতে চেষ্টা করেছেন মানুষের শরীরের মধ্যে কোন বায়োকেমিক্যাল পথ খুঁজে নিয়ে মাসাজ এরকম আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। তবে একটি বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ যে, মাসাজ দেহ-মনের চাপমুক্ত করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ 'স্ট্রেস' কমিয়ে দেয়। যেহেতু অনেক অসুখেরই অন্যতম কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত মানসিক চাপ, সেহেতু মাসাজের সাহায্য নিলে হয়তো তা প্রতিরোধ করা সম্ভব। গবেষকরা বলছেন, দেহ-মনের যেকোনও অসুস্থতাতেই মাসাজ থেরাপিতে উপকার হবে।

এইসব প্রচারের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকল্প শাখায় 'মালিশের' গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এমনকি স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানিরাও কোনও কোনও রুগির ক্ষেত্রে মাসাজের খরচ দিচ্ছে। এদিকে ব্যবসার খাতিরে মাসাজ থেরাপিস্টরা নতুন নতুন পদ্ধতি চালু করে নিজেদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে। প্রত্যেকেই দাবি করছে, তাদের মালিশ পদ্ধতিতেই বেশি উপকার হবে।

আমেরিকান মাসাজ থেরাপিস্টদের নিজস্ব অ্যাসোসিয়েশন আছে। প্রত্যেকেই লাইসেন্স পাশ করা। এখন বাজারে মোট ন'ধরনের মাসাজ চলছে।

(১) সুইডিশ মাসাজ — এটি হচ্ছে সবচেয়ে পুরানো পাশ্চাত্য পদ্ধতির মালিশ। ১৮০০ সালের গোড়ায় প্রধানত শরীরে আরাম হবে বলেই লোকে এভাবে মালিশ করাত। এখনও হেল্‌থ-স্পা-তে এই পদ্ধতিই চালু আছে। শরীরে প্রচুর তেল ঢেলে হাতের লম্বা লম্বা স্ট্রোক দিয়ে অর্থাৎ বেশ টেনে টেনে সেই তেল ঘষতে হবে। এর উপকারিতা হচ্ছে — রক্ত চলাচল ভালো হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ু শিথিল হয়ে বেশ আরামদায়ক অনুভূতি হয়।

(২) স্পোর্টস মাসাজ — অনেকটা সুইডিশ মাসাজের মতো লম্বা লম্বা স্ট্রোক হলেও খুব জোরসে দলাই-মলাই করতে হয়। তবে সর্বাঙ্গে নয়। খেলাধুলো থেকে আঘাত লেগে দেহের যেখানকার পেশির ক্ষতি হতে পারে, সেই নির্দিষ্ট পেশিগুলিকে কেন্দ্র করে অল্প সময়ের জন্যে স্পোর্টস মাসাজ দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের প্রস্তুত হবার আগে এবং ভালো খেলবার জন্যে তো বটেই, এছাড়া পেশির আঘাত তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলার জন্যেও স্পোর্টস মাসাজ দরকার।

(৩) শিয়াৎসু — এটি জাপানি মালিশ। আঙুলের চাপ দিয়ে দেহের গ্রন্থি বা নোড্‌স গুলিকে উদ্দীপ্ত করা হয়। সেখান থেকে এনার্জি বা প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়ে নাকি ভূমধ্যরেখার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ছুঁয়ে যায়। শিয়াৎসু মাসাজ তারাই নেবে, যাদের ধারণা শরীরের সব অসুস্থতার মূলে আছে এনার্জি বা জাপানিদের মতে 'চি'-এর প্রবাহের পথে বাধাবিপত্তি।

(৪) নিউরোমাস্‌কিউলার — এটিও পাশ্চাত্য পদ্ধতির মালিশ। দেহের যেসব অংশ থেকে যন্ত্রণা উৎপত্তি হয়, সেখানে আঙুলের চাপ দিয়ে দিয়ে ব্যথা নিরসন করার জন্যে এই মাসাজ। প্রধানত পেশির যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে। যাদের ক্রনিক মাসল্‌ স্প্যাজম হয়, ডাক্তাররা নিউরোমাস্‌কিউলার মাসাজ করাতে বলেন। স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানি এর খরচ দেয়।

(৫) থাই মাসাজ — এহেন থেরাপিস্ট রুগিকে কয়েকটি পরিচিত যোগ ব্যায়ামের ভঙ্গিতে বসিয়ে দেয়। তারপর জোর করে শরীরের সঞ্চালন করায়। প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হয়। কেউ কেউ রণে ভঙ্গ দেয়। কিন্তু ধোপে টিকতে পারলে নাকি রীতিমতো কাজ হয়। মানসিক উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ থেকে আশু মুক্তিলাভ ছাড়াও ক্রমশ শরীরে বেশ ঝরঝরে ভাব আসে। থাই পদ্ধতির মালিশের আরও গুণাগুণ দাবি করা হচ্ছে। যেমন — মনোযোগ এবং সতর্কতাবোধ বেড়ে যায়। কাজকর্ম করার ক্ষমতাও বাড়ে।

(৬) রোসেন মেথড — এ মালিশ হচ্ছে স্মৃতি পুনরুদ্ধারের জন্যে। শরীরের মধ্যে একগাদা পুরানো স্মৃতি বাক্সবন্দি হয়ে থাকে। তার নামই স্ট্রেস বা মানসিক স্মৃতি ভার। এর ফলে ক্রনিক মাসল টেনশন থেকে ব্যথা শুরু হয়। রোসেন (Rosen) মেথড-এ মালিশ করার সময় রুগিকে অতীতের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি প্রসঙ্গ প্রশ্ন করা হয়। দেহের গাঁটে গাঁটে মালিশ করার ফাঁকে মনের জট খুলে দেওয়াই এ মাসেজের প্রধান উদ্দেশ্য।

(৭) আয়ুর্বেদিক মাসাজ — ভারতের পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি এখন আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পাচ্ছে। দেহ ও মনের 'দশা'র উপযুক্ত ভারসাম্য সাধনই হচ্ছে এ মালিশের বিশেষ উপযোগিতা।

(৮) মায়োফেশিয়াল রিলিজ — পেশির গভীর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এ মালিশ করানো হয়। তবে বেশ ব্যথা লাগে। পেশির চারদিকে যে সংযোগরক্ষাকারী টিস্যুগুলি থাকে, তার ভেতরের জট ছাড়ানোর দরকার হলে এই মালিশে কাজ হবে।

(৯) রিফ্লেক্সোলজি — অনেকটা জাপানি 'শিয়াৎসু' ধরনের আঙুলের চাপ দিয়ে দুই হাত আর পায়ের তালুতে মালিশ করা হয়। ওখানেই শরীরের 'রিফ্লেক্স এরিয়া' থাকে। সেখান থেকে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থি সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হয়। এই মালিশ পদ্ধতিও টেনশন দূর করে। এছাড়া দেহের রক্ত চলাচল ক্ষমতা বাড়ায়।

মাসাজের এই নব 'নব পদ্ধতি'র মধ্যে একমাত্র সুইডিশ মাসাজ ছাড়া কোনও অভিজ্ঞতাই আমরা হয়নি। খেলাধূলোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। স্পোর্টস মাসাজ নেব কী করতে? জাপানি 'শিয়াৎসু'র ব্যাপারটা ধোঁয়াটে লাগছে। গাঁট থেকে এনার্জি টেনে দ্রাঘিমা রেখা সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে যাওয়া ...। কোনও দরকার নেই। থাই মাসাজও সুবিধের মনে হচ্ছে না। থেরাপিস্ট নাকি

পেটের ওপর চড়ে বসে। দু'হাতে গোড়ালি খিমচে ধরে কাঁচির মতো পোজিশন করে। তারপর হাতরিকশো টানার স্টাইলে এগিয়ে যায়। এর নাম 'হিপ-রোটেশন স্ট্রেচ'। বর্ণনা পড়েই কেটে পড়া ভালো।

'রোসন মেথড' নিয়েই বা কী লাভ? পয়সা খরচ করে যত দুঃখ জাগানিয়া স্মৃতিকে খুঁচিয়ে তোলা। তার চেয়ে রিফ্লেক্সোলজিটা বেশ। পায়ের পাতায় টেপাটেপি, সুড়সুড়ি, হাতের তালু মালিশ ভাবলেই ঝিমুনি আসে। এরপর একবার ওটাই করাব।

এদিকে আবার একটা ডিসকাউন্ট কুপনও পেয়েছি। শ্রীমতী ভানিতা বালওয়াল্লি নামে এক সার্টিফায়েড থেরাপিস্ট মাসাজ ক্লিনিক খুলেছেন। নাম 'ওম মাসাজ থেরাপি'। তাঁর নতুনত্ব হচ্ছে, 'হট স্টোন থেরাপি উইথ অ্যারোমাথেরাপি মাসাজ।' সর্বাঙ্গে গরম ঝামাপাথর ঘষে ঘষে মালিশ।

তার সঙ্গে গন্ধতেলের পালিশ। প্রথমটা সহ্য হলে, পরেরটায় ঘ্রাণে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যাবে। এক ঘণ্টার যে কোনও মালিশ করালে ১৫% ডিসকাউন্ট। আধঘণ্টার মালিশে ১০%। ওরাও গিফ্‌ট সার্টিফিকেট বিক্রি করে। ভাবছি ভনিতা না করে মেয়েকে একবার বলব ওই বালওয়াল্লির মাসাজ সার্টিফিকেট কিনে দে। ওঁ নমো বলে ঝামাপুকুরে ঘুরে আসি।

হেমন্তে অপেক্ষাগৃহ থেকে

পারাপারের শেষে অপেক্ষাঘরে বসে থাকি। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, অন্য জীবনযাপনে ফিরেও মনকে তুলে আনতে কিছু সময় লাগে সেই তোলাপাড়ার মুহূর্তে মাঝে মাঝে অপেক্ষাঘরে এসে বসা। সহজ কথায়, ধাতস্থ হওয়া। যদিও মনে হয় পৃথিবী কত ছোট হয়ে এসেছে, পূর্ব-পশ্চিম প্রায় মিলে মিশে একাকার। তবু অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। দু'প্রান্তকে সহজে মেলানো যাবে না। এই বৈসাদৃশ্য দেশকে তার ধুলোমাটির আভরণে সাজিয়ে রাখবে। অভিবাসকে অভ্যাসে অভ্যাসে অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে দেবে। "যদিও আছে একটি ঘর কুঞ্জলতায় ঘেরা, দাওয়ায় বসে জটলা করে পূর্ব্বপুরুষেরা..." এই আশ্বাস ও বোধ বেঁচে থাকবে শুধু এক প্রজন্মের কাছে।

দেশে ঘুরে এলাম। গত সপ্তাহে এ সময় দুর্গাপুরে। তার আগের সপ্তাহে কলকাতায়। তারও আগে নিউজার্সিতে। আবার ফিরে এসে সেখানেই। কিছুই মেলাতে পারিনি। ওখানে গলদঘর্ম। এখানে সোয়েটারের বর্ম। ওখানে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এখানে হেমন্তের ঝড়। পাতা ঝরার শব্দ। ওখানে জনতা। এখানে নির্জনতা। সময়ের তফাত দশঘণ্টার ওপর। আমার সাঁঝবেলা, তোমার হল ভোর। তোমার জেগে থাকা, আমার ঘুমঘোর।

কালও সন্ধে লাগতে ঢুলে পড়েছি। স্থানীয় সময়ে পৌঁছতেই পারছি না। রাত তিনটেয় ঘুম ভেঙে সনেটের বদলে শারদীয় উপন্যাস। জয় গোস্বামী সারা হলে শীর্ষেন্দুর শুরু। দুটো উপন্যাস গুলিয়ে যাবে ভেবে মাঝে একটুখানি ছোট গল্প। স্বপ্নময়/সুচিত্রা। এভাবে আর দু-চার রাত চালাতে পারলে সাংস্কৃতিক জাগরণ সম্পূর্ণ হবে মনে হয়। হেমন্তে রেনেসাঁ...।

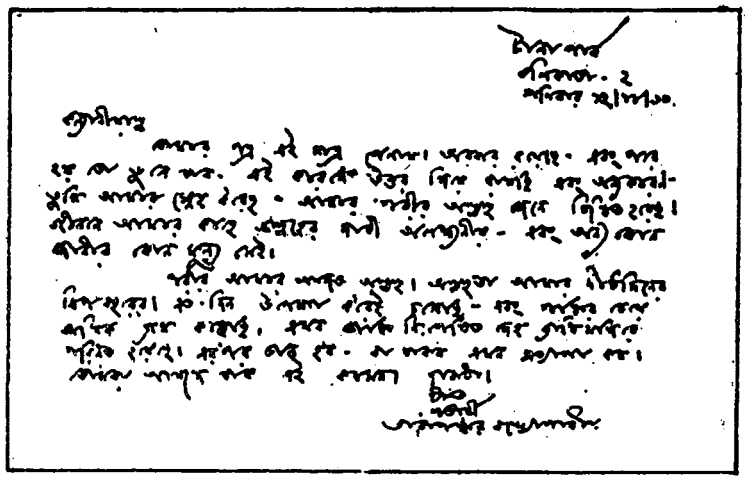

এই ভূমিকার পরে প্রথমেই একটা ট্রেন ঢুকিয়ে দিতে হবে। কারণ শুরুতে ওয়েটিং রুম-এর আভাস দিয়েছি। হ্যাঁ, এসে গেছে। কোলফিল্ড এক্সপ্রেস দুর্গাপুরে ঢুকছে। ধানবাদ থেকে হাওড়া যাবে। চার মিনিটের মধ্যে লটবহর নিয়ে ওঠা। সঙ্গে আমার মেয়ে। ফলে একটু টেনশন। কুলি স্যুটকেস মাথায় নিয়ে অভয় দিচ্ছে।

ট্রেন এল। এ সি -ফার্স্ট ক্লাস খুঁজে পাই না। অথচ সামনেই থাকার কথা। কুলি কিন্তু প্রচণ্ড কনফিডেন্স নিয়ে একটু দূরে এ. সি. চেয়ার কারে উঠে পড়ল। ট্রেন ছেড়ে যাবে বলে আমিও মেয়েকে নিয়ে সেখানেই উঠে পড়লাম। প্ল্যাটফর্ম থেকে ভাই বোঝানোর চেষ্টা করল — ভুল কম্পার্টমেন্টে চড়েছি। ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। ভাই শেষ মুহূর্তে টিকিট কালেক্টরকে পাকড়াও করেছিল। তিনি পাদানিতে উঠে আশ্বাস দিলেন। এদিকে কুলিকে দূর থেকে যত বলছি ভেতর দিয়ে দিয়ে এ. সি. ফার্স্ট ক্লাসে এগিয়ে যাও, সে মাঝপথে স্যুটকেস নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে হাত উলটে জানিয়ে দিল এ. সি. ফার্স্ট ক্লাস ই গাড়িমে নেহি হ্যায়।

অবাক কাণ্ড! ভুল কামরায় চড়িয়ে দিয়ে কেটে পড়ছে। আবার বলছে ই গাড়িমে নেহি হ্যায়। তাহলে বগিটা গেল কোথায়? প্রতিবছর ভাই-এর কাছে দুর্গাপুরে আসি। সে আসা, যাওয়ার টিকিট কেটে রাখে। কোনওবার তো কম্পার্টমেন্ট উধাও হয়নি। এবারও হাতে রিজার্ভেশন সুদ্ধ টিকিট

রয়েছে। তাহলে যাব কোথায়? পেল্লায় স্যুটকেস নিয়ে কার সিটে গিয়ে বসব? এখানে তো আমাদের রিজার্ভেশন নেই?

এবার টিকিট কালেক্টর এসে ঝেড়ে কাশলেন। কয়েকদিন ধরে কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে এ. সি. ফার্স্ট ক্লাস জুড়ছে না। আর আমাদের টিকিট কাটা হয়েছে দেড় মাস আগে। বাঃ কী সুসংবাদ! খপ করে অতগুলো টাকা নিলি? আবার কামরাও কেটে নিলি? শুধুই বিয়োগ? এখন আমরা কোথায় বসব? কেনই বা অসুবিধা করে যাব।

কালেক্টর আমাদের বসানোর জন্যে ব্যস্ত হলেন। একজনকে অন্য সিটে চালান করে দিয়ে আমাদের এক জোড়া চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। ঢাউস স্যুটকেসটা প্যাসেজের মুখে গলা বাড়িয়ে রইল। রেল কোম্পানির ওপর এত রাগ হচ্ছিল।

খানিক পরে টিকিট কালেক্টর ফিরে এলেন। বললেন, রিফান্ড স্লিপ লিখে দেবেন। হাওড়ায় পৌঁছে টিকিটের সঙ্গে সেটা দেখালেই বাকি টাকা ফেরত পেয়ে যাব। তারপর তিনি একটা কাগজে বেশ গুছিয়ে ঘটনার বিবরণ লিখলেন। তার নীচে চৌবে না দুবে কী যেন নাম সই করলেন। যোগ, বিয়োগ করে বোঝালেন আমি কত টাকা ফেরত পাব। এও বলে দিলেন — একেবারে হাওড়া স্টেশনে নেমেই টাকা নিয়ে তবে যেন বাড়ি ফিরি। হাওড়ায় নেমে ড্রাইভারকে কাগজপত্র ধরিয়ে দিতে সে আমাদের গাড়িতে বসিয়ে রেখে রিফান্ড উদ্ধারে গেল। বসে আছি তো বসেই আছি। ক্রমশ বেলা বাড়ছে। বেশ গরম লাগছে। ড্রাইভার আর ফেরে না। একটা জটাবুড়ি এসে ফণা তোলা সাপ দেখিয়ে মনসাপুজোর পয়সা চাইছিল। ভয় পেয়ে জানলার কাচ তুলে দিলাম। একটা পুলিস এসে বুড়িটাকে দাবড়ে গেল। আবার কাচ নামালাম। এবার ছট পরবের জন্যে পয়সা চেয়ে ডালা হাতে দুটো বিহারি বউ এল। অথচ ড্রাইভারের দেখা নেই। হঠাৎ একটা লোক চোখ কুঁচকে জানলায় এসে হাজির। এ আবার কী চায়? লোকটি বলল, আমাদের গাড়ির একটা চাকা নাকি প্রায় বসে গেছে।

হঁঃ দিনক্ষণ তো মানি না। বৃহস্পতিবারে বেরিয়েছি। নির্ঘাৎ বারবেলা পড়ে গেছে! নয়তো একদিনে এত হয়রানি? টাকা নষ্ট, ড্রাইভার ফিরছে না, গাড়ির চাকায় হাওয়া নেই। কখন বাড়ি পৌঁছব? শাশুড়ি তো চিন্তায় পড়ে যাবেন।

এতক্ষণে অরিন্দম — ড্রাইভার ফিরছে। মুখ বিরস। হাতে সেই দুটো কাগজ। জানলার ধারে এসে বলল —এখানে রিফান্ড দেবে না। কোলাঘাটে যেতে হবে।

মেরেছে। কোলাঘাট? সে তো ইলিশের জায়গা। ট্রেনের টিকিটের রিফান্ড আনতেও কোলাঘাটের গঙ্গায় যেতে হবে? রেল কোম্পানি মাছের ব্যবসা ধরেছে নাকি? এক হাতে টিকিটের দাম ফেরত দেবে, অন্য হাতে দড়ি বাঁধা ইলিশ গছিয়ে দেবে?

নাঃ, আমি আর ফলো-আপ করতে চাই না। ঢের হয়েছে। কাল বাদে পরশু আমাদের নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট। এক ফোঁটা গোছগাছ হয়নি। এখন পয়সা আদায় করতে কোলাঘাট যাব?

ড্রাইভারকে বললাম — "কোলাঘাট যেতে হবে না। ও টাকায় আমার দরকার নেই। তোমাকে কাগজ দুটো দিয়ে গেলাম। যদি পারো টাকাটা উদ্ধার কোরো। তারপর ইলিশ মাছ কিনো।"

ড্রাইভার মৃদু প্রতিবাদ করল — "কোলাঘাটে নয়, কোইলাঘাটে যেতে হবে। আপনাকে একটা চিঠি দিতে হবে।"

তা-ই বলো! কয়লাঘাটা। হ্যাঁ, খুব মনে আছে। রেলওয়ের অফিস তো? কিন্তু সেখানেই বা কে যাবে? জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়। কাকে আমি এই কর্মব্যস্ত জীবনে কয়লাঘাটায় পাঠাব? কার অত সময় আছে? কোলাঘাটও নয় যে, ইলিশের ইনসেনটিভ দেওয়া যাবে। যাক গে যাক। টাকার মায়া করব না। এখন বাড়ি ফেরা দরকার। ড্রাইভারকে তাড়া দিতেই মেয়ে ম্যাগজিন থেকে চোখ তুলে নির্বিকার মুখে বলল — "টায়ারের কথাটা বলো।"

ওঃ, টাকার শোকে চাকার কথা ভুলেই গেছি! ড্রাইভার শুনেই ওপাশে চলে গেল। চোপানো টায়ার নিরীক্ষণ করে ঝুঁকে পড়ে বলল — "হাওয়া ভরতে হবে। শিবপুর দিয়ে চলে যাই। চেনা গ্যারাজ আছে।"

দুর্গাপুর থেকে শিবপুরে নিয়ে যাচ্ছে। হাওয়া ভরার জন্যে হর পার্বতী লিংক। তারপর কি গণেশ অ্যাভিনিউ দিয়ে যাব? তাহলে আর দেশপ্রিয় পার্কে পৌঁছব কখন? কিছুই বুঝছি না এখন কি হাওড়া দিয়ে চলেছি? ওই তো হাওড়া পুলিশ স্টেশন পেরিয়ে গেলাম। কী নোংরা রাস্তাঘাট। এ পথে একবারও গেছি বলে মনে পড়ে না। কপালে দুর্ভোগ থাকলে যা হয়। মেয়ে

ভুরু কুঁচকে বসে আছে। একবার জিজ্ঞেস করল —"শিবপুরে আমাদের কারা যেন থাকেন?"

"সাম্যকাকারা থাকেন। সে অন্যদিকে। এটা বাজে শিবপুর। আন্দাজে চালিয়ে দিলাম। মেয়ে হাসছে।"

একটা ঘিঞ্জি গলির মুখে পেট্রোল পাম্প। ওখানেই টায়ারের হাওয়া ভরা হল। তারপর হু হু করে গাড়ি উঠে পড়ল বিদ্যাসাগর ব্রিজের ওপরে। একটু গিয়েই চেনা রাস্তা। ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছে গেলাম। এর মধ্যে দু'বার দুর্গাপুর থেকে ফোন এসেছে। এ বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশনে ফোন হয়েছে। কোলফিল্ড ঠিক সময়ে এসেছে। অথচ আমাদের পাত্তা নেই। কোথায় দেরি হচ্ছে বুঝতে না পেরে সকলেই চিন্তিত। আমি একেবারে ট্রেনের সেই চৌবেজিকে দিয়ে শুরু করলাম।

কিন্তু বেস্পতিবার পেরতেই মেজাজ ভালো হয়ে গেল। শুক্রবারে আরও শরিফ। ক্ষতির বদলে লাভ। রীতিমতো লাভপুর কানেক্‌শন। কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিলাম। "মিত্র ঘোষের" অফিসে বসে আছি, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের শ্যালক প্রদোষবাবুর সঙ্গে এক ভদ্রলোক ভানুবাবুর কাছে এলেন। প্রদোষবাবু আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন — "সম্বিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে।"

সেই যে গল্পে বসে গেলাম তো বসেই গেলাম। তারাশঙ্কর

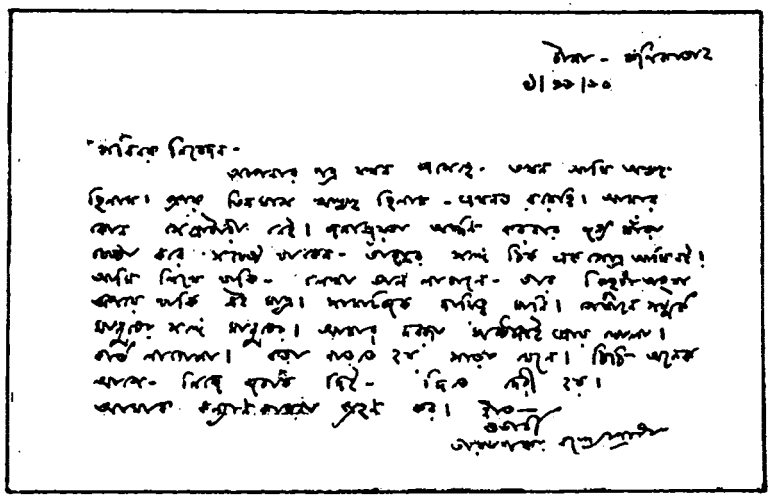

বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুধু দুবার দেখেছিলাম। একবার বেশ ছোটবেলায়। আর একবার বোধহয় ঊনসত্তর সালে। ঠিক মনে নেই। তখন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে তাঁর স্মরণসভা হয়েছিল ল্যান্সডাউন রোডে শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়দের বাড়িতে। সেখানেই তারাশঙ্কর এসেছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছিলেন। সেই শেষবার দেখেছিলাম।

সেদিন "মিত্র ঘোষে" বসে সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলছিলাম আমাদের স্কুল, কলেজের দিনগুলোয় বিখ্যাত মানুষদের কাছাকাছি আসার তত সুযোগ ছিল না। এখন ভাবি কেন যে একবার ওঁদের টালাপার্কের বাড়িতে যাইনি। কতবার ইচ্ছে হয়েছে। তখন "ধাত্রীদেবতা" পড়ছি। "উত্তরায়ণ", "কবি", "ডাকহরকরা", "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা", "সপ্তপদী", "বিচারক"— একের এক উপন্যাস শেষ করছি, "রাইকমল" পড়ার আগেই সিনেমা দেখা হয়ে গেল। পাশের বাড়িতে থাকতেন পরিচালক সুবোধ মিত্র। "রাইকমল"-এর সূত্রেই প্রথম পূর্ণদাস বাউলকে দেখলাম। আমাদের বাইরের ঘরে গুপীযন্ত্র নিয়ে এক রোগা বাউলের নাচ — ভাল করে পড় গা ইশ্‌কুলে ...।

তারও অনেক পরে তারাশঙ্করের লেখা চরিত্রগুলো সিনেমার দৌলতে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। উত্তম তাঁর অধিকাংশ ছবির নায়ক। তখন আমাদের প্রিয় নাম কৃষ্ণেন্দু। প্রিয় সম্বোধন 'বিয়াস'। কোটেশন খাতা ভর্তি করে "সপ্তপদীর" রেভারেন্ড কৃষ্ণ স্বামীর কথা লিখে রাখি। "বিচারক"-এর কথা লিখে রাখি। শুনি তারাশঙ্কর গানও লেখেন। মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলিতে। আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে। ফুটল রাই কমলিনী, বসলো কৃষ্ণ ভ্রমর এসে...

এরকমই একটা সময় গিয়েছিল। খুব ইচ্ছে করত তাঁকে দেখে আসি। একটু আলাপ করে আসি। কিছু না হোক, একটা অটোগ্রাফ। সে সময় টালা পার্কেই বোধহয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেয়ার হয়েছিল। ফেয়ারে গিয়ে ভেবেছিলাম কাছেই তো তারাশঙ্কর থাকেন। কিন্তু, ওই যে, ভাবাই সার। একা একা বালিগঞ্জ থেকে টালা চলে যাওয়ায় মতো স্বাধীনতা ছিল না। যখন স্বাধীনতা এল, উচ্ছ্বাসের বয়স চলে গেল। স্কুলে পড়তে দুবার ওঁকে চিঠি লিখেছিলাম। নাকি তিনবার? দুবার উত্তর দিয়েছিলেন। ষাট সালের পোস্ট কার্ড। এখনও আমার পুরনো ডায়েরির খাপে রাখা আছে।

চিঠির কথা শুনে ভানুবাবু বললেন, ''তারাশঙ্কর শতবার্ষিকীতে চিঠি দু'খানা কোথাও প্রকাশ করতে পারেন।'' সরিৎবাবু বললেন — ''চিঠি নিজের কাছে রেখে কপি পাঠাবেন।'' ''সাপ্তাহিকে''-ই পাঠিয়ে দিলাম।

অপেক্ষাঘর ছেড়ে আসার মুহূর্তে আটত্রিশ বছর আগের দুটো চিঠি সঙ্গে নিয়ে এলাম।

বউবাজার

সাত সাগর আর তেরো নদীর পারে স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা না থাক, কাজকর্মে নিপুণ শতকন্যা থাকে। তাদেরই মধ্যে কাউকে পছন্দ করে আমেরিকায় নিয়ে এসে আংটি বদল। ইদানীং কিছু আমেরিকান পুরুষ এ ভাবে বিয়ে করছে। আমেরিকান বউ ধোপে না টিকলে পরদেশি পিয়া নিয়ে নবসংসার। সিন্ধুপারের বিদেশিনীরা এখন নির্বাচিত পাত্রী হিসেবে "ফিয়াঁসে ভিসা" নিয়ে এদেশে চলে আসছে। ইমিগ্রেশন ভিসা নয়, স্টুডেন্ট, ভিজিটর, বিজনেস কিংবা এইচ ওয়ান ভিসা নয়। এই সব ভাবী বউদের জন্যে আমেরিকান দূতাবাস দিচ্ছে "কে-ওয়ান ফিয়াঁসে ভিসা।" উহাঁ সে ইহাঁতক্ আমার জন্যে।

একে ঠিক প্রেমিকা ভিসা বলা যাবে না। কারণ, বন্দোবস্ত অনেকটা সম্বন্ধ করে বিয়েরই মতো। আন্তর্জাতিক ঘট্‌কালির কাজে এদেশের ম্যারেজ এজেন্সিগুলো অনেকদিন থেকেই ব্যবসা চালু করে দিয়েছে। ইন্টারনেটে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন থাকছে। আমেরিকার পাত্র আর বিদেশি পাত্রী ই-মেল্ চালাচালি করে পরিচয় পর্ব সেরে রাখছে। তারপর পাত্র যাচ্ছে পাত্রী দেখতে। পছন্দ হলে তখন ফিয়াঁসে ভিসার ব্যবস্থা করে তাকে এদেশে আনানো এবং বিয়ে সেরে ফেলা। বিয়ের তাড়া না থাকলে লিভ টুগেদার।

যে সব আমেরিকান বিদেশে পাত্রী খুঁজছে, তাদের মধ্যে ডিভোর্সি ছাড়াও অনেক অবিবাহিত পুরুষ আছে। এদের মতে এ যুগের আমেরিকান মেয়েদের স্বভাবে বধূভাবের এত অভাব যে, সেভাবে মন ভরে না। নিঃশর্ত সমর্পণ বলে কিছু নেই। তারচেয়ে রাশিয়ান কিংবা ফিলিপিনো বউ ঢের ভালো।

তারা আমেরিকান স্বামী পেয়ে কত খুশি। গরিব দেশ থেকে এসে কৃতজ্ঞতায় যেন নুয়ে পড়ছে। ক্লান্তি বলে কিছু নেই। দিনের বেলা সংসার নিয়ে মত্ত। রাতের কালে বিছানায় উন্মত্ত। একই সঙ্গে এমন নিবেদন আর আবেদন ভাবা যায় না!

অ্যারিজোনার ফিনিক্সে "এ ফরেন অ্যাফেয়ার" নামে ঘটকালি কোম্পানি সারা পৃথিবী থেকে বউ জোগাড় করে দিচ্ছে। এমনিতে আমেরিকা, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশেও আন্তর্জাতিক বিয়ের বন্দোবস্ত, "ডেটিং অ্যাণ্ড ইনট্রোডকশন এজেন্সি"র মাধ্যমে যোগাযোগ ইত্যাদি অনেকদিন ধরেই শুরু হয়েছে। "মেইল-অর্ডার ব্রাইড" আর "ওয়েব-অর্ডার ব্রাইড"-এর তালিকায় কিন্তু রাশিয়ান আর ফিলিপিনো মেয়েদেরই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে। ইন্টারনেট হচ্ছে এইসব যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ঘটকালি ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। প্রতিটি ম্যারেজ এজেন্সিই মোটামুটি এক ভাবে কাজ করে ওয়েব সাইটে পাত্রীর ছবি আর বিবরণ তুলে দেয়। আমেরিকায় বসে পাত্র কমপিউটারে মেয়ে দ্যাখে। সে মেয়ের ছবির পাশে লেখা — আমি একজন সুন্দরী, স্বর্ণকেশী। পদযুগল দীর্ঘ ও সুঠাম। শরীরের মাপ...। আমি এমন একজনকে বিয়ে করতে চাই, যে সুপুরুষ, বুদ্ধিমান কর্মকুশল এবং আবেগ পরায়ণ।"

পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখে পছন্দ হলে পাত্র তখন তার ঠিকানা চাইবে। "এ ফরেন অ্যাফেয়ার" প্রতি ঠিকানার জন্যে ন ডলার নেয়। ওই কোম্পানির নিজের ঠিকানা হচ্ছে ডাবলিউ ডাবলিউ ডাবলিউ ডট লাভ্ মি ডট্ কম। এরা এখন প্রতি সপ্তাহে ডজন খানেক বিয়ে ঠিক করে দিচ্ছে। তার মধ্যে ৮/৯ জনই হচ্ছে রাশিয়ান পাত্রী। এই কোম্পানির আন্তর্জাতিক পাত্রীর তালিকায় আপাতত কুড়ি হাজার নাম আছে। তার মধ্যে ৬৫% হচ্ছে ভূতপূর্ব্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়ে। টেক্সাসের ডালাসেও এরকম ম্যারেজ এজেন্সি আছে। নাম — "মিস্ রাশিয়া ইন্টারনেট"। এরা শুধুমাত্র মার্কিন মিলিয়নেয়ারদের জন্যে বউ খুঁজে দেয়। তার জন্যে দশ হাজার ডলার দক্ষিণা নেয়। অবশ্য এ আর ছবি দেখে নির্বাচন নয়। সরাসরি রাশিয়ায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। আট দিন সেন্ট পিটার্সবাগে হোটেলে রেখে পাঁচ পাঁচ খানা পাত্রী দেখাবে। তারা কিছু হেঁজি পেঁজি নয়। রীতিমতো সদ্‌বংশ জাত, সুস্থ, সবল পাত্রী। ড্যালাসের ওই ম্যারেজ এজেন্সির বক্তব্য — আমরা অন্যান্য এজেন্সির মতো রাশিয়ার ফুটপাথ থেকে বাজে মেয়ে ধরে এনে দেখাই না। আমেরিকান

সাহেবের সঙ্গে ফূর্তি করার জন্যে, ফোক্‌টে মদ খাওয়া আর প্লেনের টিকিট নিয়ে এদেশে আসার লোভে যারা ঘুরঘুর করে, আমরা সে সব সস্তার রাশিয়ার মেয়েদের জোটাই না। ধনপতি সওদাগরদের পতি হিসবে পেতে হলে যেমন রূপ, গুণ, শিক্ষার দরকার, আমাদের এজেন্সি তেমন পাত্রীই সংগ্রহ করে দেয়।

এ দাবি অবশ্য ওই অ্যারিজোনার কোম্পানিও করেছে। তারা বছরে কয়েকবার করে রাশিয়ায় মেয়ে দেখাতে নিয়ে যায়। তিন হাজার আড়াইশো ডলার খরচ করে পাত্ররা সেখানে গিয়ে দু সপ্তাহ সেন্ট পিটার্সবার্গে থাকে। পাত্রী দেখার ব্যবস্থা হয় "হলিউড নাইটস্ ক্লাবে।" সে এক মস্ত বউবাজার। গত ডিসেম্বরেই এক দঙ্গল আমেরিকান বউ খুঁজতে গিয়েছিল। তারা কুড়িজন মিলে এক সন্ধ্যেবেলায় একশো কুড়িজন মেয়ে দেখেছে। "হলিউড নাইট্‌স ক্লাবের" টিম্‌টিমে আলো আর ডিম্‌ডিমে বাজনার মধ্যে দিয়ে সেই নারী মিছিল রাশিয়ান শ্যাম্পেন হাতে উপস্থিত হল। বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছর। কেউ ছোট্ট স্কার্ট পরেছে। কেউ টাইট্ প্যান্ট পরেছে। যেমন সাজগোজের বাহার, তেমন লাস্যময় ব্যবহার। এক সন্ধেবেলার মধ্যে, যে ভাবে মনোহরণ করা যায়। প্রতিযোগিতা সহজ নয়। সর্বসাকুল্যে কুড়িটা পাত্র। এদিকে নিজেরা একশো কুড়ি।

এরা কয়েকটি টেবিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গেল। কেউ নার্ভাস, কেউ বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে এসেছে। কেউ এই প্রথমবার এল। কারুর পাঁচবার আসা হয়ে গেছে। দেখা যাক এবার শুভদৃষ্টি হয় কিনা।

এদিকে ওই কুড়িজন পাত্র খুব মদগর্বী ভাব নিয়ে ঘুরছে। আমেরিকায় তেজী মেয়েগুলো তাদের আমল দেয় না। আর রাশিয়ান মেয়েদের দ্যাখো। কত আশা নিয়ে সেজেগুজে এসে বসেছে। তাদের বিয়ে করতে চায় বলেই তো? অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এখনই, কাউকে বেছে নিতে হবে। একবার দেখা হলেই তো আর বিয়ে করা যায় না।

অতএব, সারা সন্ধে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়ে দেখা চলল। মনে মনেই পঞ্চাশ জন বাতিল হয়ে গেল। মনে মনেই কয়েকজনকে পছন্দের তালিকায় রাখা হল। তারপর এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে আর একটু মেলামেশার বন্দোবস্ত করতে হবে। দু সপ্তাহের চেনা শোনার ওপর নির্ভর করে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ওই একই সময়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে আরো কয়েকটি পার্টিতে ঢালাও মেয়ে দেখানো হয়েছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার অন্যান্য ম্যারেজ এজেন্সিরা তার ব্যবস্থা করেছে। এক রাশিয়ান মহিলার নাম গরিমা বুচিনস্কায়া। তিনি এক বিখ্যাত ব্যালে নাচিয়ের বউ। সেন্ট পিটার্স বার্গে ম্যারেজ এজেন্সি খুলেছেন। "ইন্টার ন্যাশনাল অ্যাকুয়েনটেন্স সার্ভিস" (ডাবলিউ ডাব্‌লিউ ডাব্‌লিউ ডট আইডিয়াল ম্যারেজ ডট কম) খুলে গরিমা এখন দারুণ ব্যবসা জমিয়েছেন। ফরাসি পুরুরাও নাকি তাঁর কাছ রাশিয়ান বউ-এর খোঁজ করছে। ফ্রান্সেও এখন এই ঝোঁক উঠেছে।

গত ছ মাসে গরিমার কাছে হাজার দেড়েক রাশিয়ান মেয়ে ছবি ও পরিচিতি জমা দিয়েছেন। প্রায় প্রতিদিন তারা আমেরিকান আর ইউরোপীয়ান পুরুষদের কাছ থেকে ই-মেইল পাচ্ছে। সুতরাং গরিমাকেও মাঝেমাঝে ঢালাও মেয়ে দেখানো পার্টি দিতে হচ্ছে।

ডাকযোগে বা ইন্টারনেট মারফত বউ খোঁজার ব্যবস্থা ক্রমশ এত জনপ্রিয় হচ্ছে যে, এজেন্সির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। "গুড ওয়াইফ ডট কম্" নামে একটি ইন্টারনেটে ক্লিয়ারিং হাউস ১৩৭টি ম্যারেজ এজেন্সির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে। ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া পাত্রীর ফর্দ মিলিয়ে যথাস্থানে খবর পাঠিয়ে দেয়। তিন বছর আগে সত্তরটি এজেন্সি ছিল। এখন রাশিয়া পাত্রীর সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে ১৩৭টি ম্যারেজ এজেন্সি তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত শুরু করেছে।

এরপরেই বিয়ের বাজারে আছে এশিয়ান বিশেষ করে ফিলিপিনো মেয়েরা। তবে আমেরিকানরা প্রথমে রাশিয়ান মেয়েই দেখতে চায়। তারা শুনেছে রাশিয়ান মেয়েরা স্বামীকে খুব যত্ন করে। তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে আসে না। রাশিয়ান মেয়েরা আমেরিকান বিয়ে করতে চায় আর্থিক স্বাচ্ছল্য আর নিরাপত্তার আশায়। আমেরিকার বিলাসবহুল জীবন যাত্রার প্রতি আকর্ষণ থেকেই এদেশে সংসার পাতার ইচ্ছে হয়। নিজেদের দেশের আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিদেশে চলে আসতে চায়।

অলিভার মোয়েনশ নামে ৬৩ বছরের এক আমেরিকান উকিল রাশিয়ায় পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন। ওই "হলিউড নাইটস্ পার্টি"তে গিয়ে স্বর্ণকেশী সুন্দরীদের দেখে মুগ্ধ। অলিভারের চোদ্দো বছর আগে এক আমেরিকান বউ ছিল। সেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর আর সঙ্গিনী জোটেনি। এত বছর পরে

উকিলের খুব বিয়ের ঝোঁক হয়েছে। বউবাজারে গিয়ে রাশিয়ান মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে একজনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। সেই পঁয়ত্রিশ বছরের পাত্রী এক কথাতেই রাজি। আমেরিকার উকিলরা যে কত বড়লোক, রাশিয়ার মেয়েরা তা ভালোই জানে। তাদের অনেকের কাছে এখন রাশিয়ান পুরুষরা অযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে তো সে দেশে অর্থকষ্ট বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান নেমে গেছে। তার ওপর রাশিয়ান পুরুষদের মদ্য পান, অপরাধ প্রবণতাও বেড়েছে। অতিরিক্ত নেশা, খুন, জখম কারণে ড্রাগের চোরাই কারবার, মাফিয়া চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা ইত্যাদির কারণে রাশিয়ান পুরুষদের জীবন বিপদ জনক হয়ে উঠেছে। তাদের গড় আয়ু এখন মাত্র ৫৯ বছর। দারিদ্র, অসুস্থতা, নেশাগত ব্যাধি, চিকিৎসার অভাব এবং মাফিয়া চক্রের কবলে পড়ে তাদের মৃত্যুর হার রাশিয়ান মেয়েদের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। এজন্যও বিয়ের পাত্র কমে যাচ্ছে। ঐ যে ডালাসের "মিস রাশিয়া ইন্টারনেট" কোম্পানি, তাদের পরিচালিকা হচ্ছেন ইয়ানা হিক্‌ম্যান নামে এক রাশিয়ান মহিলা। রাশিয়া থেকে আমেরিকান বউ হয়ে টেকসাসে এসেছিলেন। তারপর স্বামীর সঙ্গে এই কোম্পানি খুলে আরও অনেক দেশওয়ালীর বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। ইয়ানা বলেছেন — রাশিয়ান মেয়েদের চোখে আমেরিকান পুরুষ হচ্ছে সেই মধ্যযুগের নাইটদের মতো, যারা বীরের মতো এসে নারীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

কিন্তু এজেন্সিগুলো যতোই তাদের বিজ্ঞাপন দিক, এভাবে হোটেলে হোটেলে মেয়েদের নিয়ে এসে দ্যাখানো আর পুরুষদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া নিয়ে অনেক সমালোচনাও হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার অভিবাসন দপ্তর থেকে ওই এজেন্সিগুলোর উদ্দেশ্যে ও ব্যবসার নৈতিক দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান চলেছে। সম্প্রতি জানা গেছে, কোনও কোনও "প্রজাপতি কোম্পানি" এই সুযোগে বাজে ব্যবসা শুরু করেছে। বিয়ের আশা দিয়ে রাশিয়ান মেয়েদের ইজরায়েলে নিয়ে গিয়ে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করেছে। তবে আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু ঘটেনি। মার্কিন অভিবাসন দপ্তর এজন্যে এদেশের "মেইল-অর্ডার ব্রাইড" বা ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোর ওপর নজর রাখছে। আমেরিকান ম্যারেজ এজেন্সিগুলো জানিয়েছে — তারা বাজে পুরুষ নিয়ে কারবার করে না। রীতিমতো তার স্বভাব চরিত্রের খোঁজ নিয়ে, পুলিশের সাহায্যে ক্রিমিন্যাল রিপোর্ট চেক্ ইত্যাদির পরে তার

উপার্জনের খবর নেয়। তারপর পাত্র হিসেবে বিবেচনা করে। তারা "গঙ্গারাম" টাইপের পাত্রদের নিয়ে রাশিয়ায় মেয়ে দেখতে যায় না।

সেন্ট পিটার্সবার্গের সেই ব্যালে নাচিয়ের বউ বুচিনস্কায়ার বক্তব্য — আমরা শুধু সংযোগের কাজ করি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাও কোনও বাড়াবাড়ি করতে দিই না। প্রথমে নিজেদের অফিসে মেয়েদের জড়ো করি। সেখানেই বিদেশি পুরুষদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে তাদের পরিচয় করিয়ে দিই। প্রথম দিন এই পর্যন্ত। আমরা কখনও প্রথম দিনেই মেয়েদের হোটেলের ঘরে বা ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিই না। আগে অফিসে দেখা সাক্ষাৎ হোক তারপর পরস্পরের পছন্দ ও বিয়ের আগ্রহ বুঝে নিয়ে আলাদাভাবে মেশার সুযোগ দিই।

কিন্তু মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের দেওয়া তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে — এই সুযোগ নিয়ে অনেক সময় উভয়পক্ষই অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে। অনেক রাশিয়ান মেয়েদের কাছে প্রেম, ভালোবাসা বিয়ে টিয়ে অত কিছু বড় ব্যাপার নয়। তারা গ্রিনকার্ড পাওয়ার জন্য এই পন্থার আশ্রয় নেয়। আমেরিকান বিয়ে করে আমেরিকায় চলে আসে। স্থায়ী বসবাসের ভিসা পেয়ে গেলে বিয়ে ভেঙে দেয় স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না বলে। মোটা ক্ষতিপূরণ নিয়ে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। তারপর স্বাধীনভাবে জীবন শুরু করে। রাশিয়া থেকে আত্মীয়স্বজনকে আনায়। নতুন বরও সেখান থেকেই নিয়ে আসে। এরকম ঘটছে।

আসলে দুপক্ষের ভুল ধারণা থেকে অশান্তি শুরু হয়। রাশিয়ান মেয়ে মানেই স্বামীর নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এ ধারণা নিয়ে যে আমেরিকান পুরুষ বিয়ে করে, তার প্রত্যাশা অনেক বেশি থাকে। সে ধরেই নেয়, বউ খুব অনুগত হবে। গরিব দেশ থেকে তাকে উদ্ধার করে এনে রাজসুখে রেখেছি মানে তার আর চাওয়ার কিছু নেই। সে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমার পছন্দ মতো চলবে। আমেরিকান মেয়েদের মতো অধিকার সচেতন হবে না। স্বামীর ইচ্ছেকেই প্রাধান্য দেবে।

কিন্তু সবাই কি তা সহ্য করে? বিয়ে মানে প্রভুত্ব স্বীকার নয়। আমেরিকায় এসে তারা নারীবাদের প্রভাব দেখছে। চারপাশের মেয়েদের জীবনযাত্রা দেখছে। আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর, আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন, স্বাধিকার-সচেতন মহিলাদের দেখে এই বিদেশি বউরা ধীরে ধীরে

প্রভাবিত হচ্ছে। তারা আর স্বামীর কর্তৃত্ব মানতে চাইছে না। যে লোক শুধু "পুরুষবাদে" বিশ্বাস করে বলে ভিনদেশে নরমগরম বউ খুঁজতে গিয়েছিল, তার তখন মোহভঙ্গ হচ্ছে। সেই থেকেই সংঘাত। গৃহবিবাদ কখনও কখনও শারীরিক নির্যাতনে গিয়ে পৌঁছেছে। আমেরিকা আর রাশিয়ার ঠাণ্ডা লড়াই নয়। রীতিমত মারপিট। এভাবেই বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

তবে সকলের অভিজ্ঞতা এক নয়। আমেরিকান পুরুষদের মধ্যে যারা একটু মুখচোরা কিংবা চেহারা বা ব্যক্তিত্বের বিচারে তেমন আকর্ষণীয় নয়, তাদের পক্ষে বান্ধবী পাওয়া সহজ নয়। একটা বয়সের পরে তারাও ম্যারেজ এজেন্সি বা "সিঙ্গল ক্লাব"-এর মাধ্যমে পাত্রী খোঁজার চেষ্টা করে। রাশিয়ান বা ফিলিপিনো মেয়ে বিয়ে করে ভালোই মানিয়ে নেয়। এরা আমেরিকান মেয়েদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিদেশি বিয়ে করেনি। সেজন্যে বিদেশি বউ এর কাছে অতিরিক্ত প্রত্যাশাও নেই। এদের দৃষ্টি ভঙ্গি অনেক উদার। বউ-এর ওপর কর্তৃত্ব করার প্রবণতা নেই। বউ পেয়েছে তাতেই খুশি।

যারা বিদেশে বউ খুঁজতে যায়, তারা অবশ্য মানতে চায় না যে, আমেরিকায় বান্ধবী পায়নি বলেই এজেন্সির সাহায্য নিতে হয়েছে। ঐ যে ৬৩ বছরের আধবুড়ো উকিল অলিভার মোয়েন্‌শ, তাঁর ধারণা আমেরিকান পুরুষ হচ্ছে সেরা পাত্র। বলেছেন — আমরা হলাম সারা পৃথিবীর মেয়েদের কাছে গৌরবের মুকুট। যার মাথায় বসব, সে রানির মতো থাকবে। কত বেশি রোজগার করি। নিজেদের চেহারা আর স্বাস্থ্যের প্রতি কী যত্ন নিই। বয়স আমাদের ছুঁতে পারে না। মেয়েদের সম্মান দিতে জানি। তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতির মূল্য দিই। যখন ছেলে মেয়ে হয়, সব দায়িত্ব ভাগ করে নিই। অথচ আমেরিকান বউগুলো তার দাম দেয় না।

এঁদের বক্তব্য হচ্ছে — আমরা অচল আধুলি নই। বউ পাইনি কিংবা টেঁকেনি মানে এই নয় যে, আমাদের কোন সমস্যা আছে। আমরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সফল। শুধু প্রেমে দাগা খেয়েছি। আমরিকান মেয়েরা আমাদের গোরুর মতো দোহন করেছে। বাড়ি, গাড়ি, স্টক, বন্ড, সব কিনে দিয়েও মন পাইনি।

তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে সুন্দরী বিদেশিনীর জন্যে আবারও কামধেনু হতে এঁদের আপত্তি নেই। রাশিয়ান কামিনীর পায়ে আবার উজাড় করে দেবেন তাঁদের যা কিছু সম্বল।

কিন্তু রাশিয়ান পাত্রীরা কি একবাক্যে রাজি হয়ে যায়? সত্যিই কি আর সকলকে তাদের পছন্দ হয়? সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশি পুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধার ইচ্ছে হয়?

অথচ তাই ঘটেছে অধিকাংশ মেয়ে আমেরিকান বিয়ে করার জন্যে আবেদন পত্র পাঠাচ্ছে। স্বদেশের দুর্দিনে তারা পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। শুধু নিজের জন্যে নয়, মা, ভাইবোনদের জন্যেও আমেরিকায় আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে। বিয়ের পরে ইমিগ্রেশন পেয়ে একে একে তাদের আনার ব্যবস্থা করবে। যদি অবশ্য বিয়েটা ততদিন স্থায়ী হয়।

আইরিনা নামে ২৯ বছরের এক রাশিয়ান যুবতী অবশ্য অতটা মরীয়া নয়। সেন্ট পিটার্সবার্গের "হলিউড নাইট্স" এ সে মাঝে মাঝে বর খুঁজতে আসে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও আমেরিকানকে তার ঠিক পছন্দ হয়নি। আইরিনা পেশায় হচ্ছে বুলডগ ট্রেনার। কিন্তু যে সে ট্রেনিং নয়, সে বুলডগদের লড়াই করার ট্রেনিং দেয়। কুকুরে কুকুরে কামড়া-কামড়ি করে রক্তাক্ত হয়ে মরবে। এ হচ্ছে রাশিয়ানদের বিটকেল খেলা। আইরিনা সেই লড়াই শেখায়। আমেরিকান বিয়ে করে এদেশে এলে তাকে অবশ্য কেউ ঠেঙিয়ে পার পাবে না একবার বুলডগের স্টাইলে মরণ কামড় দিলেই হয়েছে। বক্তিয়ার উকিলের ভবলীলা সাঙ্গ! প্রেমের সমাধি শুদ্ধ তাজমহল চুরমার। উকিলের দেওয়া সোনার তাজ স্রেফ্ ধূলোয় গড়াগড়ি।

তানিয়া নামে ১৯ বছরের একটি মেয়েও পার্টিতে বর খুঁজতে এসে হতাশ হয়েছে। তার ধারণা একদল আমেরিকান লোক আসে শুধু মজা লুঠতে। একদিনের আলাপের পরে হোটেলে নিয়ে গিয়ে শারীরিক ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়। বিয়ে করবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আবার কেউ কেউ সহজেই বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শর্ত থাকে, আমেরিকায় গিয়ে রাশিয়ান মেয়ে মন দিয়ে সংসার করবে। তার নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে কিংবা ইচ্ছে মতো চলার জন্যে পারিবারিক শান্তি নষ্ট করা চলবে না। অর্থাৎ স্বামী যেমন পছন্দ করে, তাকে সেভাবে থাকতে হবে। তানিয়া এ ভাবে বিয়ে করতে চায় না।

ওদেশে গিয়ে আমেরিকান ছেলেরাও যে সব সময় এই মেয়েদের পছন্দ করে তা নয়। ফ্লোরিডা থেকে মাইকেল ওব্রায়ান নামে একজন রংদার লোক সেণ্ট পিটার্সবার্গে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। রংদার মানে সে হচ্ছে পেইন্টিং

কন্ট্রাক্টর। ৩৮ বছর বয়স। মাইকেল সেখানে গিয়ে লক্ষ করেছিল — বেশির ভাগ রাশিয়ান মেয়েই বর খোঁজার ছুতোয় দেহব্যবসায় নেমে পড়ে। এটাই তাদের জীবিকা। নীতিবোধ বলে কিছু নেই। তারা সারা বছর এই করছে। যখন যে এজেন্সি থেকে আমেরিকান পুরুষদের মেয়ে দেখাতে নিয়ে যায়, এই মেয়েগুলি ক্লাবে এসে হাজির হয়। দু সপ্তাহের জন্যে একজন পুরুষের সঙ্গে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। দামি দামি উপহার নেয়। বড় বড় রেস্তোরাঁয় খায়। সরাসরি ডলার চায় না। কারণ "পাত্রী"-র ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। বিয়েটা যদি লেগে যায় তো খুব ভালো। নয়তো আবার পরের দল এলে দুসপ্তাহের জন্যে কাউকে পাকড়াও করবে। মানে, একের পর এক ম্যারেজ এজেন্সির পার্টিতে গিয়ে এরা বর খোঁজার নামে নিজেদের কাজ গোছানোর চেষ্টা করে। বর না জুটুক মেলা জিনিসপত্র আদায় করে নেয়। দু সপ্তাহ ধরে শহরের দামি রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ-ডিনার খেয়ে নেয়। মাইকেল ওব্রায়ান দেখে শুনে একটি উনিশ বছরের সরলমতি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছিল। কিন্তু সে একবছর পরেই কেটে পড়েছে। ফ্লোরিডার ওই নির্জন শহরতলিতে সে থাকতে পারবে না। কোথায় সেন্ট পিটার্সবার্গের মতো জমজমাট শহর। আর কোথায় এই ঘুমন্ত গ্রাম! ওলগা নামে ওই মেয়েটি কদিনেই পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছিলো। তারপর দেশে পালিয়েছে। এরকম আরো কয়েকজনের হয়েছে। আমেরিকা বলতে তাদের কল্পনায় ছিল নিউইয়র্কের মতো ঝলমলে শহর। কে জানতো বর তাদের গ্রাম মার্কা ছোট্ট শহরে নিয়ে গিয়ে তুলবে? বড়লোক আমেরিকানরা শহরতলিতে থাকে থাকুক, রাশিয়ান মেয়েদের পোষাবে না। সারাদিন গাড়ি ঘোড়া, লোকজন, হট্টগোল দেখা অভ্যেস। এমন নির্বান্ধব পরিবেশে থাকা যায়? অতএব বনবাস থেকে মুক্তি পেতে আবার সেই পুরনো শহরে ফেরা।

মাইকেল তাও আশা ছাড়েনি। আবার বউকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল। সে রাজি হয়নি। উনিশ বছরের মেয়ে তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে আর এখানে আসবে না। মাইকেল এখন তাই আবার বউ খুঁজছে। রাশিয়ান মেয়েই চাই। সে নাকি এত কোমলভাব আর যৌন আবেদন অন্য কোনও জাতের মেয়ের মধ্যে খুঁজে পায়নি। ওলগাকে ভোলবার জন্যেও তার রাশিয়ান বউ চাই।

এই হল রাশিয়ান বউবাজারের খবর। ভাবতে অবাক লাগে, যে দুটি

দেশের মধ্যে বহুবছর কোনও যোগাযোগ ছিল না, সেই আমেরিকা আর ভূত-পূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের ছেলেমেয়েরা এখন বিয়ের জন্যে মিলিত হচ্ছে। আসলে রাজনৈতিক সম্পর্ক ভালো হওয়ার পর থেকে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে অজানা দেশকে জানা যাচ্ছে। রাশিয়ার টেলিভিশন দেখাচ্ছে পশ্চিমের ভোগ, বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ছবি। সেই সঙ্গে এত প্রচার করছে যে আমেরিকান পুরুষ নারীবাদের শিকার। তাদের ঘরে শান্তি নেই। বউরা যত্ন করে না। নিজের "কেরিয়ার" নিয়েই ব্যস্ত। মতান্তর থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের সূত্রপাত। আমেরিকা পুরুষ অবহেলা পেয়ে যেন আঁখি জলে সিক্ত। তারা এখন গৃহমুখী মেয়ে চায়। পায় না...।

এই সব দুঃখের কাহিনী শুনে রাশিয়ান মেয়েদের মনে হয় আহা! প্রেমের কী অপচয়! আমাদের রূপ আছে। ভালোবাসার মন আছে। আমরা তো ওই সব অবহেলিত পুরুষদের সংসার সাজিয়ে তুলতে পারি। নিজের দেশে না আছে পয়সাকড়ির সুখ, না আছে তেমন ভালো স্বামী পাওয়ার সম্ভাবনা। দেশটা তো উচ্ছন্নে গেল। পুরুষগুলোও নানা ধান্দা করতে গিয়ে চোর, জোচ্চোর হয়ে যাচ্ছে। মদ খেয়ে পটাপট মরে যাচ্ছে। আমরা যদি নিজেদের ভবিষ্যত না ভাবি, কে আমাদের সমস্যার কথা চিন্তা করবে?

এদিকে আমেরিকান পুরুষও বিজ্ঞাপনে দেখছে বিদেশিনী রূপসীর ছবি। ঘটক কোম্পানিগুলো ইন্টারনেটে বিশদ বিবরণ তুলে দিচ্ছে। কমপিউটারের বোতাম টিপলেই পহেলি ঝলক। তারপর রাশিয়া ভ্রমণ। তারপর যা যা হয়, আগেই জানিয়েছি। রাশিয়ার মেয়ে এখানে আসিয়া মার্কিন স্রোতে মিশিয়া যায়। এশিয়া হইতে ফিলিপিনোরাও নববধূ হয়ে আসিতে চায়। বুড়ো উকিলের ভাষায় স্বপ্নে দেখা রাজপুরুষের জন্যে।

উদর-নৃত্যের কদর

নাতিটাকে নিয়ে সেদিন খুব মুশকিলে পড়েছিলাম। সবেমাত্র নিউইয়ার্সের হই-হুল্লোড় মিটেছে। হোটেলে, ক্লাবে, রেস্তোরাঁয় অখণ্ড নৃত্যগীত থেমেছে। ছুটি-ছাটার শেষে যে যার কাজকর্মে ফিরে গেছে। এবার শুধু আমাদের ছুটি আসছে। কদিন পরে দেশে যাব।

এক শনিবারে কানেকটিকাট থেকে মেয়ে চলে এল নাতি শিবশঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে। ওর বয়স প্রায় তিন হতে চলেছে। এসেই মেয়ে তাল তুলল দোসা খেতে যাবে। কথাটা কানে যাওয়ার পর থেকে শিবও বার কতক বলল দোসা, দোসা। আজকাল সাদা দোসা খেতে শিখেছে। তা, আমরা ভাবলাম কাছাকাছি একটি শহরে, 'মহারানি' রেস্তোরাঁয় যাব। ওখানে নর্থ ইন্ডিয়ান, সাউথ ইন্ডিয়ান দুরকমই পাওয়া যায়।

সন্ধেবেলা গিয়ে দেখি 'মহারানি' উধাও। তার বদলে 'নমস্তে ইন্ডিয়া' নামে নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছে। মেয়ে বললে, 'আগে জিজ্ঞেস করি, ওরা দোসা বানায় কি না।' প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমরা আর গাড়ি থেকে নামলাম না। মেয়ে দোসার খোঁজ নিতে ভেতরে গেল। শিব এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। মা নেমে যেতেই কারসিটের বেল্ট খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল — দিম্মা আই লাইক সাদা দোসা।

বললাম — ঠিক আছে। আগে তোমার মা কী খবর আনে দেখি। শিব ফর্দ দিয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড ম্যাংগো লাসসি ... অ্যান্ড চিনি। কবে নাকি ওদের কানেকটিকাটে এক দক্ষিণী রেস্তোরাঁয় দোসা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিনি মুড়ে খেয়েছিল। এখন সেটাই মনে পড়েছে বোধহয়।

মেয়ে ফিরে এসে বলল — এখানে সব নর্থ ইণ্ডিয়ান খাবার। আর কোথাও যাবে?

রাত হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডাও অসম্ভব পড়েছে। এখন দোসার খোঁজে যাওয়া মানে এডিসনের সেই ইন্ডিয়ান পাড়ায় যেতে হবে। চল্লিশ মাইলের ধাক্কা। এদিকে 'চাঁদ প্যালেস' নামে আর একটা রেস্তোরাঁ আছে। আগে ভালো দোসা বানাত। ইদানীং সম্বরে গুজরাতি মশলা দিয়ে, মসালা দোসার ভেতরে মিষ্টি মিষ্টি গুজরাতি আলুর তরকারি দিয়ে একেবারে অখাদ্য বানিয়ে ছেড়েছে। ওখানে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। ভাবছিলাম মিনিট কুড়ি ড্রাইভ করে মন্টক্লেয়ার শহরে 'নটরাজ'-এ গেলে হয়। কিন্তু শিব আর কতক্ষণ জেগে থাকবে? তার চেয়ে 'নমস্তে ইন্ডিয়াতে'ই ঢোকা যাক।

শেষ পর্যন্ত ওখানেই ঢুকলাম। আগের 'মহারানি'র চেয়ে এবারে ভেতরের সাজসজ্জা আর একটু বেশি। খাবারের দামও বেশি। দোসা নেই বলে নর্থ ইন্ডিয়ান খাবারই অর্ডার দেওয়া হল। শিব ম্যাঙ্গো লস্যি পেয়ে স্ট্র দিয়ে সড়াৎ সড়াৎ করে টানতে টানতে মাঝে মাঝেই এক গাল হেসে বলছিল — আই আম গোইং টু হ্যাভ দোসা। অ্যান্ড চিনি।

ওর মা ভেবেচিন্তে ছেলের জন্যে পুরি অর্ডার দিল। ওটাকেই সাদা দোসা বলে চালানো হবে। আর আমরা যে তন্দুরি নান রুটি, পোলাও টোলাও নেব, তা ও যদি একটু খায় তো খাবে। চিকেন রেশমি কাবাবে ঝাল নেই বলে শিব সেটাও খেতে পারে।

খাবার যখন এল, গোল গোল পেট ফোলা পুরি দেখে শিবের চোখ গোল। সন্দিগ্ধ ভাবে জানাতে চাইল — হেই, হোয়াটস দিস? মা তক্ষুণি কাঁটা দিয়ে রামলুচির পেট ফাটিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে ব্যাখ্যা করল — দিস ইজ নিউ দোসা। দিস ইজ রিয়েলি গুড! শিব আর তেমন মাথা ঘামাল না। একবার ছেঁড়া লুচি, একবার চিকেন কাবাব, এক টুকরো নান, মর্জিমতো এটা ওটা খেতে লাগল। চিনি চিনি করছিল বলে ভারতীয় ওয়েট্রেস এসে চিনির প্যাকেট দিয়ে গেল।

সবে খেতে শুরু করেছি, ঘরের আলো কমে গেল। কানের গোড়ায় মায়াবী সুরে মিডল-ইস্টের বাজনা। হঠাৎ হুশ করে হাওয়ায় ওড়না উড়িয়ে এক বেলি ড্যান্সার এসে হাজির। আগুনবরণী কন্যার অঙ্গে আগুনবরণী স্বচ্ছ পোশাক। চোলিকে পিছে সবই প্রায় পরিদৃশ্যমান। মাথায় এক ঢাল চুল,

দারুণ ফিগার দুলিয়ে মেয়েটি ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। দুহাতে কটকটি বাজনা।

রেস্তেরাঁয় তেমন ভিড় নেই। আমেরিকান আর ভারতীয় মিলিয়ে জনা কুড়ি হবে। ঘরটাও নাচের পক্ষে তেমন বড় নয়। বেলি ড্যান্সার আমাদের টেবিলের পেছন দিকে লম্বা এক ফালি জায়গায় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নেচে যাচ্ছে। চোখে কটাক্ষ, ঠোঁটে চাপা হাসি। মসৃণ পেটের ওপর পেশি ঢেউ খেলিয়া যায়।

মুক্তকেশীর নৃত্য দেখে শিব ভয় পেয়ে গেছে। এর আগেও হ্যালোউইনের সময় দেখেছি যারা মুখে রং-চং মেখে পরী, ডাইনি, ড্রাকুলা সেজে এসেছিল, শিব তাদের দেখেই দৌড় মেরেছিল।

এদিনও এক কাণ্ড। চোখে মুখে চিকচিকে অভ্র মাখা বেলি ড্যান্সার যতবার আমাদের টেবিলের কাছে এসে হাতের ওড়না দুলিয়ে ডাকাডাকি করছে, শিব কাঁদো কাঁদো মুখে বলছে — দিস ইজ স্কেয়ারি। লেটস গো হোম দাদু ... দিম্‌মা, পিক মি আপ...। ওর নিজের হাই চেয়ার ছেড়ে আমাদের কোলে পালিয়ে আসার জন্যে ঝুঁকে পড়ছে। ওর মা বোঝাল ভয়ের কী আছে। শি ইজ ড্যান্সিং।

কিন্তু শিব খাওয়া বন্ধ করে বসে আছে। টেরিয়ে টেরিয়ে চোখের পাশ দিয়ে নাচ দেখছে আর ফিস-ফিস করছে — আ অ্যাম স্কেয়ার্ড মামা। ইটস ব্যাড।

কিন্তু বেলি ড্যান্সার কি আর সহজে থামে? এক কালো আমেরিকান ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে কোমর কাঁপানোর কায়দা শেখাতে লাগল। তারপর কৃষ্ণচন্দ্রের মাথায় বিবেকানন্দের স্টাইলে নিজের গেরুয়া ওড়না বেঁধে দিয়ে আরও চার চার টেবিল পাক খেয়ে এল। তারপরেই উধাও। ভাবলাম বাঁচা গেছে। শিবের হাতে রেশমি কাবার গুঁজে দিয়ে নিজেরা গল্প-টল্প করছি। আবার কানের কাছে ঝন ঝন বাজনা। পেছন ফিরে দেখি ঝাঁসির রানি আসছে। বেলি ড্যান্সারের মাথায় ঝলমলে বেঁটে মুকুট। হাতে তরোয়াল। অসিনৃত্য করতে করতে হাঁটু ভাঁজ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এবার বুক আর পেটের অপূর্ব কম্পন প্রদর্শন। নাঃ নাচটা শিখেছে ভালো। একটু বাহবা দিতেই হয়। আমি ঝুঁকে পড়ে হাততালি দিচ্ছি দেখে শিবও হঠাৎ চটপট হাততালি দিল। পরমুহূর্তে মোক্ষম মন্তব্য! ওর হাই চেয়ারের পাশে চিৎপাত

বেলি ড্যান্সারের প্রায় উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গর দিকে ছোট আঙুল দেখিয়ে মাকে বলল — হি হ্যাজ নো শার্ট মাম্‌মা। হি ইজ হিন্দি মুভি।

সেরেছে। হি, শি-র ব্যাকরণ বোঝার বয়স হয়নি। এদিকে কে জামা পরেনি, কে হিন্দি মুভির মতো সেজেছে, সেদিকে নজর গেছে। গত বছর কদিন 'রামায়ণ'-এর ভিডিও দেখেছিল। সেই থেকে শিখেছে নাভি-দেখানো সাজ-পোশাক মানে 'হিন্দিমুভি'।

বেলি ড্যান্সার ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে পড়ল। আমাদের হাততালির উত্তরে একটু হেসে শিবের কাছে এল। ওর হাতে সেই কটকটি বাজনা দুটো ধরিয়ে দিতে শিব হঠাৎ হেসে হেসে ঠুক ঠুক করে বাজাতে লাগল। ভয় কেটে গেছে। খঞ্জনির মাহাত্ম্যে শিবরঞ্জনি।

নাচ শেষ। বাজনা থামল। কৃষ্ণচন্দ্রের ঝাঁকড়া মাথা থেকে পাগড়ি খুলে নিজের বুকে জড়িয়ে নিয়ে, শিবের হাত থেকে কটকটি ফেরত নিয়ে গায়ে এক জরির আলখাল্লা ছাপিয়ে মনমোহিনী বিদায় নিল।

নাতিটা হাই চেয়ারে শিবনেত্র হয়ে বসে আছে। ঠোঁটের ওপর ম্যাঙ্গো লস্যির হলদে গোঁফ, গালে চিনি, মুখে ঘি মাখনের গন্ধ নিয়ে হাই তুলছে। দাদু তাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে বললেন — ঢের হয়েছে। এর চেয়ে অন্য কোথাও গেলে ছেলেটার ঠিকমতো খাওয়া হত।

বেলি ড্যান্স তো এতকাল দেখে আসছি মেয়েরাই নাচে। শুধু মিডল ইস্ট-এর মেয়েরা নয়, সব দেশের পেশাদার নর্তকীরাই এ নাচ দেখায়। কিন্তু এবার যাদের কথা লিখব, তারা পুরুষ নাচিয়ে। ইদানীং আমেরিকার বড় বড় শহরের নাইট ক্লাব, রেস্তোরাঁয়, লাস ভেগাস-এর ক্যাসিনোর ফ্লোর-শোতে মেল বেলি ড্যান্সিং খুব চলছে।

জেমস ব্র্যান্টলি নামে একজন এয়ার ফোর্স কমিপিউটার স্পেশালিস্টের এখন দুটি পেশা। দিনে কমপিউটারের চাকরি। রাতে 'শাহিদ' নাম নিয়ে নাইট ক্লাবে, ড্যান্স ফেসটিভ্যালে বেলি ড্যান্সার। দুই মেয়ে আর বউকে নিয়ে এক মিডল ইস্টার্ন নাচের দিদিমণির কাছে ওই নৃত্যকলা শিখেছে। বউ, মেয়েরা অবশ্য শরীররচর্চা হিসেবে বাড়িতেই নাচানাচি করে। বাইরে নাচে না। কিন্তু জেমস তিন বছর ধরে প্রফেশন্যাল মেল বেলি ড্যান্সিং শিখে নানা জায়গায় প্রোগ্রাম করে। তার দিনের বেলার কমপিউটার সহকর্মীরা প্রথমে খুব হাসাহাসি করত। এখন শাহিদের জনপ্রিয়তা আর রোজগারের বহর দেখে হাসি থামিয়েছে।

আরবি ভাষায় 'শাহিদ' মানে শক্তিমান। জেমস বলে এটি তার দ্বিতীয় পরিচয়। ঝলমলে ঢোলা প্যান্ট, চকচকে ভেস্ট আর সিল্কের উড়নি নিয়ে যখন নাচে, তখন যেন অন্য চরিত্র হয়ে যায়। ছত্রিশ বছর বয়সে তার স্বাস্থ্যও চমৎকার। শরীররচর্চা আর শিল্পচর্চার আনন্দ — বেলি ড্যান্সে দুই-ই বজায় থাকে।

পুরুষের কোমর দোলানো নাচের গুরু হিসেবে অবশ্য এলভিস প্রিসলেই ছিলেন প্রথম। তার আগে ঠিক ওই ধরনের ঝাঁকুনি আর শরীর কাঁপানোর ভঙ্গিমা ছিল না। ষাটের দশকে থেকে ক্রমশ নাচের ধরন বদলাতে লাগল। মিড ইস্টার্ন ড্যান্সের প্রভাব এল। আরও এখন তো দেখা যাচ্ছে নাচের স্কুলে, ড্যান্স স্টুডিওতে, বিভিন্ন ক্লাবে পুরুষ বেলি ড্যান্সারদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। স্পোর্টস ক্লাবগুলোতেও বুক, পেট, আর পশ্চাৎদেশের পেশির ব্যায়াম হিসেবে বেলি ড্যান্স শেখানো হচ্ছে। বিখ্যাত পপশিল্পী শাকিরা আর ব্রিটনি স্পিয়ার্স মহিলা হলেও তাদের অন্যতম আকর্ষণীয় আবেদন হচ্ছে বেলি ড্যান্স। তো, এই সব দেখে পুরুষ পপশিল্পীরাও এ নাচের দিকে ঝুঁকেছে।

সকলেই যে শো করতে ইচ্ছুক, তা নয়। অনেক পুরুষই এ নাচ শিখছে একই সঙ্গে ব্যায়াম, নৃত্যচর্চা আর নতুন কিছু শেখার আগ্রহে। যে কারণে হেল্‌থ স্পাতে গিয়ে লোকে নানারকম বাজনার সঙ্গে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করে। কিংবা মার্শাল আর্ট শেখে। প্রধান উদ্দেশ্য হল পেটের পেশিগুলো নিয়ন্ত্রণ করা। সোজা কথায় ভুঁড়ি কমানো অথবা কখনওই ভুঁড়ি না হতে দেওয়া। আবার কোনও কোনও পুরুষের কাছে এ নাচ যৌন আকর্ষণের প্রতীক। নিজের যৌন আবেদন বাড়ানোর জন্য শরীরের হিল্লোল দেখাতে চায়। শুধু মহিলাদের কাছেই নয়, এদেশের পুরুষ সমকামী সমাজেও এ নাচের আবেদন আছে।

এছাড়াও একটা ব্যাপার আছে। তা হল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোনও কিছু শেখা বা তার থেকে আনন্দ পাওয়া। নাচকে শুধু মেয়েদের শিল্পকলা বলে ধরা হচ্ছে না। কুস্তিকে শুধু ছেলেদের পেশাদারি খেলা বলে ধরা হচ্ছে না। যে যা প্রাণ চায় করছে। পুরুষের গয়না পরার রেওয়াজ, রূপচর্চা, কেশচর্চার যুগে বেলি ড্যান্স ঢুকে পড়েছে।

নিউইয়র্কের নাইট ক্লাবে, রেস্তোরাঁয় একই সঙ্গে মহিলা আর পুরুষ বেলি ড্যান্সার প্রোগ্রাম করতে আসে। ডেভি মিশেল নামে একটি লোক নতুন

নাম নিয়েছে 'মাশালা'। গত তিন বছর ধরে বেলি ড্যান্স করছে। নামকরা নাচের স্কুল 'অ্যালভিন এইলি ট্রুপ'-এ কয়েক বছর নাচ শেখার পর আলাদা করে বেলি ড্যান্সের ট্রেনিং নিয়েছে। রোজগার ভালোই। কোনও জন্মদিনের পার্টিতে নাচতে ডাকা হলে একশো ডলার পারিশ্রমিক নেয়। বেয়াল্লিশ বছর বয়সেও যুবকের মতো হাবভাব। মাশালা নেচে নেচেই শরীর ঠিক রেখেছে।

আদাম বাসমা নামে লেবাননের একটি ছেলে হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই নানা জায়গায় বেলি ড্যান্স করত। মিডল ইস্টের সমাজে পুরুষদের ওই নাচ একেবারেই নামঞ্জুর ছিল। এখনও কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু বাসমা নাচ চালিয়ে গেছে। তারপর আমেরিকায় চলে এসেছে। এখন তার প্রচুর রোজগার। লস এঞ্জেলেসে বাসমার নিজের 'মিডল ইস্টার্ন ড্যান্স স্টুডিও' ছাড়াও আলাদা ড্যান্স কোম্পানি আছে। লাস ভেগাসের এম জি এম গ্র্যান্ড হোটেলে, বেলাজিও হোটেলে সে নাচের শো করেছে। শুধু তাই নয়, ২০০০ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনেও বেলি ড্যান্স করেছে। কোনও বিয়ে বা প্রাইভেট পার্টিতে ডাকলে বাসমা পনেরো মিনিটের একক নৃত্যের জন্য এক হাজার ডলার নেয়। তার এখন লেবাননের আত্মীয় স্বজনের কাছে খুব খাতির বেড়ে গেছে। বাসমা বুঝে গেছে জীবনের সফল হতে পারলে তখন লোকজনের একরকম ব্যবহার। নয়তো শুধুই সমালোচনা আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য।

বেলি ড্যান্সের জন্ম হয়েছিল উত্তর আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যের লোকনৃত্যের সংমিশ্রণে। আরব ও মধ্য এশিয়ার নৃত্যশৈলীর প্রভাবও আছে। মধ্যপ্রাচ্যে হাজার হাজার বছর আগে সামাজিক উৎসবে এরকম নাচ হত। আরবি ভাষায় বেলি ড্যান্সের নাম ছিল — 'রাকস শারকি'। অর্থাৎ প্রাচ্যের নাচ।

আমেরিকার এ নাচ সাড়া জাগিয়েছিল ১৮৯৩ সালে। শিকাগোর বিশ্বমেলায় বেইরুট থেকে নাচের দল এসেছিল। 'বেলি ড্যান্স' নামও আমেরিকানদের দেওয়া। পশ্চিম দেশে যে নাচকে পুরুষের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লাস্য নৃত্য বলে প্রচার করা হয়েছিল, তা কিন্তু একসময়ে ছিল মধ্যপ্রাচ্যের নানা উৎসব উপলক্ষে নারী-পুরুষের লোকনৃত্য। মাঠে প্রচুর ফসল হলে চাষিরা আনন্দ উৎসবে ওইভাবে নাচত। ধর্ম-উৎসব উপলক্ষে ছুটির দিনে, অথবা কোনও বাড়িতে শিশুর জন্ম হলেও ওই নাচের মাধ্যমে

আনন্দ করা হত। সেই যুগেও মেয়েরা প্রধানত নাচের উৎসবে অংশ নিত। ক্রমশ তাদের মধ্যে এই নাচের চর্চা থেকে গেল। পরবর্তীকালে পেশাদার নর্তকীরা এ নাচকে আরও আকর্ষণীয় করে আন্তর্জাতিক বাজারে নিয়ে এল।

আমরা টার্কি বেড়াতে গিয়ে ইস্তানবুলে 'ক্যারাভান সেরাই' নামে একটি নাইট ক্লাবে সুফি নাচ, গান আর বেলি ড্যান্স দেখেছিলাম। টার্কির লোকনৃত্য সুফি-সাধকদের পোশাকে পুরুষদের সমবেত নাচ ও গানের পরে টার্কির পেশাদারী নর্তকীদের বেলি ড্যান্স হল। সে নাচে দুই হাতের পেশি সঞ্চালনের ভঙ্গি, কোমর আর পায়ের পেশির সূক্ষ্ম আন্দোলন, একেক মুহূর্তে ফ্ল্যামেনকো আর কত্থকের ভঙ্গির মতো লাগছিল। লাস্যের মধ্যেও যেন বিষণ্ণ দূরত্ব রচনা করছে। টার্কির বেলি ড্যান্সে যৌনতা নৃত্যশৈলীকে ছাপিয়ে ওঠে না।

আমেরিকায় পুরুষরা এখন যে ধরনের বেলি ড্যান্স শিখছে, তার সঙ্গে মেয়েদের নাচের কিছু পার্থক্য আছে। যেমন হাতের মুদ্রা আর ভঙ্গির তফাত। মেয়েরা নরম মোহময় ভঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। প্রলোভন জাগিয়ে তোলার জন্যে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গে নানা বিভঙ্গ ফুটিয়ে তুলেছে। পুরুষদের হাতের ভঙ্গিতে আছে শক্তির প্রকাশ। হাত আর বুকের পেশি কাঁপিয়ে সে নিজের পৌরুষ জাহির করছে। নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নারী আর পুরুষের দুরকম নাচের কায়দা।

ওই যে মাটিতে শুয়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পেট, বুক আর উরুর কম্পন দেখানো, এ জিনিস পুরুষ বেলি ড্যান্সাররা করতেই চায় না। তাদের কথা হচ্ছে ওরকম লতিয়ে পড়ে মূর্ছাভাব মেয়েদেরই শোভা পায়। পুরুষ দর্শকরা ওসব দেখতে ভালোবাসে। তা বলে পুরুষ ড্যান্সাররা মাটিতে গড়াগড়ি দেবে কেন? তাদের শক্তি আর পৌরুষের ভাবমূর্তি ধুলোয় চটকে যাবে না?

উত্তর নিউজার্সির রাদারফোট শহরে 'মেসিনা রেস্টোরেন্ট' নামে একটা মরক্কো রেস্তোরাঁ আছে। সেখানকার পুরুষ বেলি ড্যান্সারের নাম টাইরন। নাচের খাতিরে নতুন নাম বানিয়েছে 'তারিক'। সে নাকি দারুণ ভালো নাচে। এমন ঝড়ের গতিতে বুক, পেট, কোমার নাচায় যে মহিলা দর্শকরা ছুটে গিয়ে তারিকের ঢোলা প্যান্টের খাঁজে ডলার গুঁজে দিয়ে আসে। প্রত্যেক বুধবার থাকে 'লেডিস নাইট'। সেদিন শুধু মহিলারাই তার দর্শক। তাদের তারিফ

পেয়ে তারিক এখন খুব রোজগার করছে। সে শুধু নিজে নাচে না, দর্শকদেরও বগলদাবা করে ফ্লোরে নামায়। লিলিয়ান নামে অষ্টাশি বছরের এক বুড়িকে তার নাতনি জন্মদিনের উপহার হিসেবে ওই রেস্তোরাঁয় খেতে নিয়ে গিয়েছিল। গোলাপি জামা পরা বুড়ি তো তারিকের নাচের কায়দা দেখে মুগ্ধ। তারপর তারিক যখন তাকে নাচতে নিয়ে গিয়ে মাথায় এক ওড়না পরিয়ে দিল, বুড়ি হেসে অস্থির। দুহাতে সিমবলস বাজিয়ে পেট, কোমর দুলিয়ে দিদিমাও নেচেছে।

তারিকেরও দুটো পেশা। সকালে ব্রংকস-এর জুনিয়র হাইস্কুলে ইতিহাস আর সমাজ-বিজ্ঞান পড়ায়। বিকেলে ম্যানহাটনের একটা ড্যান্স স্টুডিওতে নাচ শেখায়। তখন সে টাইরন বেইলি। এরপর প্রতি বুধবার রাতে আর শনি-রবিবার মরক্কোর ওই রেস্টোরেন্টে গিয়ে তারিক হয়ে যায়। সবুজ ভেলভেটের পায়জামা মার্কা প্যান্ট, খালি গায়ে জরির ভেস্ট পরে বেলি ড্যান্স করে। শরীর কাঁপানো, কোমর দোলানো, হাতের কসরত এ সব দেখিয়ে এমনিতেই প্রচণ্ড হাততালি পায়। তবে তার শেষের নাচটিই মোক্ষম। মাথার ওপর আধডজন জ্বলন্ত মোমাবাতিসুদ্ধু একটি ছোট থালা নিয়ে দাঁড়ায়। তারপর দুই হাত ব্যবহার না করে সেই থালাকে শুধু শরীরের পেশি নাচিয়ে নাচিয়ে মাথা থেকে মুখ গলা, বুক পেট আর পার করে পায়ে নামিয়ে আনে।

এই নৃত্যকেলীও তবে আমেরিকার বেলিড্যান্সে মিশে গেল। নাচ মানেই যখন উদ্ভাবন, হাজার বছর ধরে কি আর তার স্টাইল সীমাবদ্ধ থাকতে পারে?

জানোয়ারের জান বাঁচাও

একটা ঝগড়াটে পাখি আমাকে দুদিন কনফিউজ করেছে। অসময়ে বাগান থেকে বিকট কঁক কঁক শব্দ শুনে বাইরে গেছি। নির্ঘাৎ বুনো হাঁস আহত হয়ে পড়ে আছে। বুদ্ধদেবের শিক্ষা। ছুটে গিয়ে কোলে নিতে না পারলেও পুলিশ ডাকতে পারব। তারা "ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল রেসকিউ অফিস" থেকে লোক ধরে আনবে। দরকার হলে হাঁস কোলে নিয়ে হাসপাতালে যাবে। মোটকথা, আমাকে নাগরিকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। শুনছি, পরোক্ষ নিষ্ঠুরতার দায়েও আজকাল ফাইন দিতে হচ্ছে। একদিকে বুদ্ধদেব, অন্যদিকে পুলিস! দুয়ের প্রভাবে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু বাগানে গিয়ে হতাহত কাউকে দেখতে পেলাম না। কাছাকাছি ছোট একটা ঝিল আছে। কটা হাঁস চরে বেড়ায়। ভেবেছিলাম তাদেরই কেউ শেয়ালের খপ্পরে পড়েছে। ছোট ছোট রেডফক্স আসে তো মাঝে মধ্যে।

নাঃ, হাঁস, শেয়াল, কুকুর বেড়াল কেউ নেই। কঁক কঁক শব্দটাও আচমকা উধাও। সেদিন আর রহস্য ভেদ হল না। আবার কদিন বাদে ঘন ঘন হংসধ্বনি। এবার সামনের ড্রাইভওয়ের দিক থেকে মর্মঘাতী আওয়াজ ভেসে আসছে।

দরজা খুলে বাইরে গেলাম। হাঁস, মুরগি, দাঁড়কাক, যাকে পাই পুলিসের হাতে তুলে দেব। পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতির কেরামতি যা দেখলাম একদিন। জানোয়ারের জান বাঁচাতে তারা কী না জানে?

কমাস আগের কথা। এলিমেন্টারি স্কুলের মাঠের শেষে একটা স্টর্ম ড্রেন আছে। বৃষ্টি আর বরফের পরে ঝাঁঝরির নীচ দিয়ে জল বয়ে যায়। সেদিন

পোস্ট অফিস থেকে ফিরছি। দেখি ওই স্টর্ম ড্রেন ঘিরে ছোটখাট ভিড় জমেছে। পুলিশের গাড়ি, লোকজন। ব্যাপার কী? ওখান তো বাচ্চা পড়ে যাওয়ার কথা নয়। লোহার ঝাঁঝরি ভেদ করে নীচে নামাও সম্ভব নয়। কিন্তু পুলিশ এসে উবু হয়ে উঁকি দিচ্ছে মানে, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।

ঝট করে অকুস্থলে পৌঁছে গেলাম। ও বাবা, কাছে গিয়ে দেখি করুণ দৃশ্য। ঝাঁঝরির ফাঁক গলে কটা হাঁসের ছানা নর্দমায় পড়ে গেছে। ওদিকে বিরাট "প্যাকান্যাক লেক" আছে। প্যাঁক প্যাঁক করে হাঁসেরা রোজ হাঁটতে যায়। ওইদিন প্রাতঃ ভ্রমণ সেরে ফেরার পথেই পদস্খলন ঘটেছে। পুলিশের মন্তব্য আর লোকেদের বক্তব্য মিলিয়ে যা বুঝলাম — এভাবে আচমকা পড়ে যাওয়ার কথা নয়। ঝাঁঝরির মধ্যে দিয়ে কেউ একটা জোর করে মাথা গলিয়ে নেমেছিল। শিশুর কৌতূহল আর কী! দেখাদেখি বাকিগুলো শিকের ফাঁক দিয়ে নেমে পড়েছে। তারপর খাবি খাচ্ছে।

এক বুড়ি বলল, সকলেই খেলতে যায়নি। হাঁসের ছানারা স্রেফ জলকেলির জন্য দল বেঁধে নামেনি। ওই যে প্রথম বাচ্চাটা ভুল করে পিছলে পড়েছে — তাকে বাঁচাতেই বাকিরা নেমেছে। এখনই না তুললে নর্দমা দিয়ে ভেসে যাবে।

পুলিশ যথারীতি সন্দিগ্ধ। হুম একি হাঁসেদের কাজ? না কোনও দুষ্টমতি বালকের কাজ? বলেই আড়ে আড়ে স্কুলের দিকে তাকাচ্ছে। সেখানে দরজা বন্ধ। ক্লাস চলছে। শুধু স্কুলের অফিস থেকে দুজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা পুলিশের সন্দেহ শুনে বললেন — পৌনে নটার মধ্যে ছেলে মেয়েরা স্কুলে ঢুকে গেছে। এখনও লাঞ্চ ব্রেক হয়নি। ওরা এদিকে আসবে কখন? তবে, আমরা কিছু বলতে চাই না। প্রিন্সিপ্যাল যা বলার বলবেন।

কথাবার্তার মধ্যেই ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লোক এসে গেল। জলে, স্থলে, দাবানলে এরাই ত্রাণকর্তা। মেশিন দিয়ে ঝাঁঝরি তুলে ফেলল। ততক্ষণে হাঁসের ছানাগুলো হেদিয়ে গেছে। কোনও মতে গলা বাড়িয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। এবার পশু উদ্ধার দপ্তরের লোকেরা ছাঁকনি নিয়ে শুয়ে পড়ল। স্টর্ম-ড্রেন তো তেমন চওড়া নয় কোনও মতে একজন লোক নামতে গেলেও হাঁসের বাচ্চারা চাপা খেয়ে মরবে। তাই বিরাট ছাঁকনি নামিয়ে দিয়ে ছানাদের জল থেকে ছেঁকে ছেঁকে তোলা হল। অভূত পূর্ব দৃশ্য দেখে আমিও আর চট করে বাড়ি ফিরিনি। ওদিকে স্কুলে লাঞ্চ ব্রেক হতে দলে দলে ছোট ছেলে

মেয়ে ছুটে আসছে। পুলিশের চোখ ইতি উতি ঘুরছে। কে সেই দেবদত্ত? কে সেই দেবদত্ত যে হাঁসকে ব্যথা দিয়েছে...?

হ্যাঁ, মা হাঁস দুটোর কথা বলতে ভুলে গেছি। এতক্ষণ দুটো বড় হাঁস নাগাড়ে চিৎকার করছিল। আমি এদের প্রায়ই দেখি। একটু নির্বিকার টাইপ। আগে আগে হেলতে দুলতে লেকের দিকে চলে যায়। পেছনে একদল কচি হাঁস। আজ নিশ্চয়ই সে ভাবেই ফিরে যাচ্ছিল। বাচ্চারা খানায় পড়ার পর হুঁশ ফিরেছে। ওদের চিৎকারেই লোক জড়ো হয়েছিল।

পশু উদ্ধার সমিতি ছানাগুলোকে ভ্যানে তুলল। ওদের নাকি ঠাণ্ডা লেগে "হাইপোথারমিয়া" হয়েছে। শক পেয়েছে। এমনিতে হাঁসের ছানা তেমন সুশ্রী নয়, তার ওপর জলে ভিজে, খাবি খেয়ে একেবারে ঝুলঝাড়ার চেহারা নিয়ে ছাঁকনিতে বসেছিল। ওদের তো চিকিৎসা করতেই হবে। অতএব কাঁপতে কাঁপতে কম্বলের পুঁটলিতে চালান হয়ে ভ্যানে উঠে গেল। শোকার্ত মা দুটোও পশু উদ্ধার কর্মীর কোলে চড়ে একই ভ্যানে উঠল। শুনলাম অবজারভেশন আর প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সবাইকে এখানেই ছেড়ে দিয়ে যাবে।

তারপর শীত পড়ে গেল। মাঠেঘাটে বরফ। লেক জমে কাঠ। তার ওপর ছেলেরা আইস হকি খেলছে। হংসরা বংশশুদ্ধু কোথায় লুকিয়েছে জানি না। শীত শেষ হল। বসন্তের মুখে আবার তাদের লেকের দিকে হাঁটতে দেখলাম। সেই ছানাগুলোই বড় হয়ে এদের সঙ্গে চলেছে কি না কে জানে? সেদিন হাঁসেদের উদ্ধার পর্ব দেখে বুঝেছিলাম, সময় থাকতে লোক ডাকতে হয়। কিন্তু এখানে কঁক কঁক করে যে কে চেঁচাচ্ছে ধরতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হাতেনাতে ধরলাম। চেরি গাছের ডালে বসে খয়েরি রঙের পেট মোটা একটা পাখি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ওটাই তার প্রভাত সঙ্গীত। মাঝে মাঝে ভরদুপুরেও গেয়ে উঠছে। যাইহোক, আমার তদন্ত শেষ। নাগরিকের আশু কর্তব্যের প্রথম শিক্ষা সমাপ্ত।

পরোক্ষ নিষ্ঠুরতার শাস্তি তবু এক রকম। জরিমানা নিয়ে ছেড়ে দেবে। কিন্তু সরাসরি পশু, পাখি ঠেঙালে আর রেহাই নেই। পাঁচটা বেড়াল মেরে একটা লোক বারো বছর জেল খাটছে। নাম ব্যারি হারবেক। লোকের বাড়িতে কার্পেট লাগানোর কাজ করত। সাঁইত্রিশ বছর বয়স। বউ ছেড়ে চলে গেছে। ব্যারির সঙ্গে তার আট বছরের মেয়ে থাকত। আর ছিল এক বান্ধবী। আর

ওই যে খুন হওয়া পাঁচটা বেড়াল — তারাও থাকত। ব্যারির যে কী মতিচ্ছন্ন হল, পোষা বেড়ালগুলোর ঘাড় মটকে লাথি মেরে খতম করে দিল। একটা তেড়ে উঠেছিল। তার ল্যাজ ধরে দেওয়ালে আছড়ে মেরেছে। বান্ধবী কিছু জানত না। বাড়ি এসে রান্নাঘরের সিঙ্কে লোম আর রক্তটক্ত দেখে সন্দেহ হচ্ছিল। বেড়ালগুলোও গায়েব। বান্ধবী টুক করে পুলিশে ফোন করে দিল। পুলিস এসে খানা তল্লাশি চালিয়ে পেছনের বারান্দায় কটা বাক্স পেল। ভেতরে প্লাস্টিকের ব্যাগে মার্জার বাহিনীর মরদেহ।

পুলিসের চাপে পড়ে ব্যারি হারবেক অপরাধ স্বীকার করল। তার ছোট মেয়ে ওই বেড়াল আছড়ানোর দৃশ্য দেখে ফেলেছিল। সেও কাঁদতে কাঁদতে বলে দিল। ব্যারি পুলিশকে বলল — সে প্রচণ্ড রাগ আর ঘৃণা থেকে বেড়ালবধ করেছে। কিন্তু রাগ তার পোষা বেড়ালদের ওপরে নয়। ব্যারির বাবা তাকে ছোটবেলায় বেদম ঠ্যাঙাত। ক্রমাগত মারধোর খেয়ে সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাবাকে মারতে পারেনি। সেই অবদমিত রাগ আর ঘৃণা ভেতরে পুষে রেখেছিল। শেষে পোষা বেড়ালদের ওপর শোধ নিল। ব্যারি উইসকনসিনের লোক। সেখানে "অ্যানিম্যাল অ্যাবিউজ ল" ভীষণ কড়া। ৮৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় মাত্র পাঁচটি রাজ্যে এত কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু গত চোদ্দো বছরে মোট বাইশটি রাজ্যে পশুহত্যাকে কঠিন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন — ইচ্ছাকৃত পশু হত্যার পেছনে যে বিকৃত মনোবৃত্তি ও নিষ্ঠুরতা কাজ করে, তার পরিণতি আশংকাজনক। এ থেকে হত্যার প্রবণতা আসতে পারে। কোনও কোনও রাজ্যে পশু হত্যার সঙ্গে যে অপরাধগুলি সমান বলে ধরা হয় তা হচ্ছে — গাড়ি থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে মানুষকে ভয় দেখানো, বাড়িতে পরিবারের ওপর দৈহিক অত্যাচার করা এবং অবহেলার দরুন সন্তানের মৃত্যু ঘটানো। উইসকনসিনে এই ধরনের অপরাধের জন্য অন্তত দুবছর জেল হয়।

ব্যারি হারবেক পাঁচটা বেড়াল মারার অপরাধে পাঁচ দু'গুণে দশ বছর, আর বাড়িতে শটগান রাখার জন্য আরও দু বছর জেল খাটবে। এরকম শাস্তি অনেকেই পাচ্ছে। কেননা আরও এগারোটি রাজ্যে পশুহত্যাকে 'ফেলোনি চার্জ' হিসাবে গণ্য করার জন্য কংগ্রেসে আলোচনা চলছে। "অ্যানিম্যাল-রাইটস গ্রুপ" গুলির চাপ ও প্রচার ক্রমশই ওয়াশিংটনে এই

আইনকে বিধিবদ্ধ করতে সাহায্য করছে। ক্যালিফোর্নিয়াতেও কঠোর শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ড্যানিয়েল লি উইলিয়ামস নামে একজন লোক তার প্রতিবেশীর গোল্ডেন রিট্রিভারকে কুপিয়ে মেরেছিল। চার বছরের জেল হয়েছে। নেব্র্যাস্কার ওমাহা শহরে মার্ক উইলিয়ামস নামে একজন লোক বেশ কটা কুকুর আর খরগোশকে বীভৎসভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। প্রসিকিউটররা অভিযোগ এনেছেন-লোকটি বিকৃত যৌনকামনা থেকে এই নৃশংস কাজ করেছে। সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক লোকটির কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত। মার্ক উইলিয়ামসের ন বছরের জেল হয়েছে।

প্রসিকিউটরদের অবশ্য প্রমাণ করতে হবে যে আসামি ইচ্ছে করে পশু হত্যা করেছে। হঠাৎ করে ভয় পেয়ে বা রেগে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা ঘটায়নি। ব্যারি হারবেকের বেড়াল মারার শাস্তি নিয়ে খুব শোরগোল উঠেছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপকের মতে — বেড়াল মারার জন্য দশ বছর একটা মানুষ জেল খাটবে, এ অত্যন্ত কঠিন শাস্তি। সাধারণত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যারা ডাকাতি করে, তাদের এরকম শাস্তি দেওয়া হয়। ডাকাতি আর বেড়াল মারার অপরাধ সমান বলে আমি মনে করি না।

কিন্তু অধিকাংশ লোক ওই মামলার সময় ব্যারির কড়া শাস্তি হোক বলে চিঠি দিয়েছিলেন। কিম্বার্লি গ্রিফিন নামে এক মহিলা ওই পাঁচ বেড়ালের মধ্যে তিনটেকে উপহার দিয়েছিলেন। আসলে তাঁর নিজের বেড়ালদের লাগাতার বংশবৃদ্ধি হয় বলে মাঝে মাঝে বিলিয়ে দেন। কিম্বার্লির কাছ থেকে বেড়াল ছানা নিয়ে ব্যারি তাদের নাম রেখেছিল মরিস, বাটার বল আর মাংকি। মহিলা যখন জানতে পারলেন, ব্যারি তাদের গলা টিপে মেরেছে, তখন থেকে প্রসিকিউশনের উকিল আর জজ সাহেবকে চিঠি ছেড়ে গেছেন। শেষমেশ যেদিন রায় বেরল কিম্বার্লি কোর্টে দাঁড়িয়ে "সত্যের জয়, ধর্মের জয়" বলে কাঁদতে যাচ্ছিলেন। সিকিওরিটি থামিয়ে দিয়েছে। তিনি একা নন। প্রায় দুশো লোক সে দিন রায় শুনতে এসেছিল। যারা ঢুকতে পায়নি, বাইরে দাঁড়িয়ে জিগির দিয়েছে। শয়ে শয়ে লোক জজকে চিঠি লিখেছে। এক তেজস্বিনী মহিলা লিখেছিলেন — ধর্মাবতার, যদি আমাদের কাউন্টির জেলখানায় নতুন কয়েদি ঢোকানোর জায়গা না থাকে, আসামিকে আমাদের হেফাজতে ছেড়ে দিন। আমার কাছে মোটা দড়ি আছে। বাগানে মোটা

গুঁড়িওলা গাছ আছে। পাড়ায় একজনের আস্তাবলে ঘোড়া আছে। সকলের বাড়িতে ফায়ার-প্লেস জ্বালানোর জন্য চ্যালাকাঠ আছে। দয়া করে পাঠিয়ে দিন হুজুর। আমরা লোকটাকে গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে বসাব। চ্যালাকাঠ দিয়ে সকাল-বিকেল ঠ্যাঙাব। আমি একা নই। বহু লোক ধোলাই-এর ডিউটি নিতে চাইছে। আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করুন।

চিঠির নীচে দুশোজন সই করেছিল। জজ অবশ্য হান্টারওয়ালিদের সে সুযোগ দেননি। তবে রায় দেওয়ার আগে দুশোজনের মনের এই অভিলাষ জেনে হয়তো তাঁর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়েছিল। উইসকনসিনের ওই অঞ্চলের পশু অধিকার সংরক্ষণ দলের নাম "অ্যানিম্যাল লবি"। তাঁরা ষোলোটি স্থানীয় কাগজে এই মামলার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কোর্টে বিস্তর লোক জড়ো করেছিলেন। শুধু ওই রাজ্যে নয়, ক্যালিফোর্নিয়ায় "দ্য অ্যানিম্যাল লিগ্যাল ডিফেন্স ফান্ড" থেকে বেড়াল হত্যা মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ ইন্টারনেটে আবেদন জানানো হয়েছিল। লোকেরা যেন জজ সাহেব আর প্রসিকিউটরদের কাছে ন্যায্য বিচার চেয়ে চিঠি লেখেন — এই অনুরোধ করা হচ্ছিল।

আমেরিকার প্রত্যেক রাজ্যেই অ্যানিম্যাল-অ্যাডভোকেসি দল আছে। এঁরা যে শুধু পশু, পাখির ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইন ও শাস্তিবিধানের কাজে প্রধান উদ্যোগ নিয়েছেন তা নয়, আরও কিছু সৎ কাজ করেছেন। এদের মধ্যেই আছে "মাদার্স এগেনস্ট ড্রাংক ড্রাইভিং" নামে প্রতিবাদী নারী সংস্থা। সত্তরের দশকে আন্দোলন করে এঁরা মাতাল ড্রাইভারদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার আইন বিধিবদ্ধ করিয়েছেন। এঁদের অনেকের ছেলে মেয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে, যেখানে মাতাল ড্রাইভারের দোষেই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এই আইন জারি হওয়ার পর কঠিন শাস্তির ভয়ে ওই জাতীয় দুর্ঘটনার হার কমে গেছে।

'হিউম্যান সোসাইটি অফ ইউ এস" থেকে দেশের প্রতিটি রাজ্যের সেনেটর আর কংগ্রেসম্যানদের কাছে পশু অত্যাচারের বিরুদ্ধে আবেদন পাঠানো হয়েছে। যে রাজ্যগুলি এই অপরাধের জন্য আরও কঠিন শাস্তি আইনবদ্ধ করেছে। তারা সেনেটে ও কংগ্রেসে হিয়ারিং-এর সময় "হিউম্যান সোসাইটির" প্রতিনিধিদের ডেকেছে। প্রতিটি ঘটনার প্রমাণ সহ বিবরণ নেওয়া হয়েছে। তারই ভিত্তিতে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

বেড়াল, কুকুরদের জন্য মামলা লড়বেন যাঁরা, তাঁদের কিছু কিছু পরামর্শ আর উপদেশ চাই। মানুষের জন্য মামলা লড়ার বিদ্যেবুদ্ধি অর্জন করেছেন। বেড়ালের অধিকার সম্যকরূপে জানা নেই। তা সেই জন্য, "অ্যানিম্যাল লিগ্যাল ডিফেন্স ফান্ড" নিখরচায় উপদেশ ও পরামর্শ দেয়। গত বছর তারা পাঁচশো মামলার উপদেষ্টা ছিল। এই দলে আছেন প্রাণী বিশেষজ্ঞ, পশু চিকিৎসক, পশু-মনস্তত্ত্ববিদ, পশু শিক্ষক এবং সমাজের সর্বস্তরের পশুপ্রেমী লোকজন। প্রসিকিউটর দরকার মতো এঁদের পরামর্শ নেন।

ওই সংস্থার একটি বিভাগের নাম "নিষ্ঠুরতা বিরোধী শাখা" তারা পশুপাখিদের নিজস্ব আইনি অধিকার বজায় রাখার আন্দোলনে নেমেছে। তাদের বক্তব্য — জন্তুরা শুধুমাত্র পোষা প্রাণী নয় যে, মালিকের ইচ্ছেমতো থাকবে। তাদেরও নিজের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। মানুষ যদি তা কেড়ে নেয়, তাদের কষ্ট দেয়, তবে কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত। আমরা সেই জন্যই আইনের কড়াকড়ির ওপর জোর দিচ্ছি।

ইন্টারনেটের দৌলতে সারা আমেরিকা জুড়ে প্রচার চলছে। যখনই কোথাও প্রাণী হত্যা বা অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে, পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতি তখনই ইন্টারনেটে জানিয়ে দিচ্ছে। তাদের চিঠির প্রিন্ট-আউট নিয়ে নাম সই করে জজের কাছে আর ওই এলাকার সরকারি অ্যাটর্নির কাছে পাঠিয়ে দিলেই হল। চিঠি চাপাটির ভারে মামলার গুরুত্ব বেড়ে যাবে। ক্যানসাসে চারটে লোক মিলে একটা কুকুরকে পুড়িয়ে মেরেছিল। পাঁচ হাজার চিঠি এসেছিল। তারমধ্যে হাজার তিনেক হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে নেওয়া ছাপা চিঠিতে সই দেওয়া। বাকিগুলো ব্যক্তিগত বয়ানে লেখা। তবে ঘটনাটা প্রচার হয়েছিল ইন্টারনেট থেকেই। জজ পরে বলেছিলেন — পাঁচ হাজার লোক অপরাধীদের কঠিন শাস্তি দিতে লিখেছেন দেখে, আমার পক্ষে জনমত বোঝা সম্ভব হয়েছে। ক্যানসাসের আইন অনুযায়ী যতদূর সাধ্য কঠিন শাস্তি দিয়েছি।

ওই চারজনের মধ্যে দুজনের তিনবছর জেল হয়েছে। দুজন প্রোবেশনে আছে।

পশু-অধিকার সংরক্ষকরা মনে করেন এই আইন সমস্ত সমাজের মঙ্গলের জন্যেই বিধিবদ্ধ হয়েছে। নিষ্ঠুরতা এমন এক অপরাধ, যা ক্রমশ ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনে। আজ যে বেড়াল, কুকুর মারছে, কাল হয়তো তার মানুষ মারতেও দ্বিধা হবে না। রক্তের নেশা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে

কে বলতে পারে? তাই নিষ্ঠুরতার প্রবণতাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে। নয়তো মানুষের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। শুধু জেলে বন্দি করে সাময়িক শাস্তি দেওয়া নয়, পরে তার মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে হবে।

আমেরিকার কুখ্যাত খুনিদের মধ্যে অনেকেই ছোট থেকে নিষ্ঠুর ছিল। বেড়াল, কুকুরদের গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে মারত। গাড়ির পেছনে ট্রাংকে ঢুকিয়ে দমবন্ধ করে মারা চেষ্টা করত। সিরিয়াল কিলার টেড বান্ডি, ডেভিড বার্কোউইটস, জেফরি ডেমার তিনজনই মানুষ খুন করার আগে বেড়াল, কুকুর মেরে হাত পাকিয়েছিল। "ইউনিবম্বার" টেড কেজিনস্কি, যে পত্রবোমা পাঠিয়ে শত্রুকে মারতে চেষ্টা করত, তার যত রাগ ছিল বেড়ালের ওপর। যখন তখন বেড়ালদের ওপর অত্যাচার করত। দুবছর আগে যে ছেলেটা অরিগনের স্কুলে নিজের ক্লাসের ছেলেদের ওপর গুলি চালিয়েছিল, সে তো বেড়ালের মুখের মধ্যে বাজি ফাটাত। একেকটা বেড়াল ধরে মুখের সঙ্গে বাজি বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিত।

এফ বি আই-এর দপ্তরে যে অপরাধ বিশেজ্ঞরা কাজ করেন, তাঁরা বলেন —যারা পশুপাখির ওপর অত্যাচার করে তারা নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন স্বভাবের লোক। এরা বন্ধু পায় না। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে, বাইরে কোথাও স্বীকৃতি পায় না। অক্ষমতার আক্রোশে ভেতরে ভেতরে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। সেই অবদমিত আক্রোশ থেকেও পশু, পাখিদের ওপর অত্যাচার করে।

একটা কোথাও নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে জয়ী হতে চায়। পাঁচ বেড়ালের হত্যাকারী ব্যারি হারবেক তো নিজেও সে কথা স্বীকার করেছে। তার মামলা চলার সময় জজ সাহেব সাতশো চিঠি পেয়েছিলেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি পেয়েছিলেন আরও সাতশো চিঠি।

বেশির ভাগই ইন্টারনেট থেকে নেওয়া ছাপা ফর্মে সই করা আবেদন। সেই এক অনুরোধ — হত্যাকারীকে কঠিন শাস্তি দিন। চোদ্দোশো চিঠির ফল যা হবার হল। বারো বছর জেল। পাঁচটা বেড়ালের জন্য দশ আর শট গানের জন্য দু বছর। পুলিস বেড়ালের তদন্তে না এলে শট গানের খবরও পেত না। বান্ধবীই অবশ্য ফাঁসিয়েছে। বিয়ের প্রথম রাতে বেড়াল কাটার গল্প না জেনেই।

ঠাণ্ডা মেশিনের গল্প

আলমারির মতো চেহারা, ক্রিম রঙের পুরানো রেফ্রিজারেটরটাকে আমরা বলতাম ফ্রিজিডেয়ার। আসলে ওটা ছিল কোম্পানির নাম। আমাদের রান্নার ঠাকুর বলত রিফাইটার। কেউ বলত মেশিন। তবে রেফ্রিজারেটরের অপভ্রংশ 'ফ্রিজ' কথাটাই শেষ পর্যন্ত চালু হয়ে গেল। এক যুগে যা বিলাসিতা বা শৌখিনতার উপকরণ ছিল, ক্রমশ তা নিত্যব্যবহার্য এবং আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রান্নাঘরে একে একে ঢুকে পড়েছে ফ্রিজ, ব্লেন্ডার, ইলেকট্রিক টোস্টার, মাইক্রোওয়েভ আভেন। তবে, ইদানীং কোন যন্ত্রটি না থাকলে সবচেয়ে অসুবিধে হবে বলে মনে হয়? আমার ধারণা — রেফ্রিজারেটর। নানা কারণে রান্নাঘরের ঠাণ্ডা মেশিনের ওপরেই বোধহয় সবচেয়ে নির্ভরশীল হয়ে গেছি। নয়তো, এই কর্মব্যস্ততার যুগে রোজ রোজ কাঁচা বাজার, এবেলা ওবেলা রান্না, উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র নষ্ট হওয়া, রীতিমতো ঝামেলা বলে মনে হবে না?

তো, এবারে রেফ্রিজারেটরের বিষয়েই কিছু লেখা যাক। আমেরিকায় যখন ঠাণ্ডা মেশিন আবিষ্কার হয়নি, অর্থাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লোকে নানা প্রক্রিয়ায় খাবার সংরক্ষণ করত। শীতপ্রধান দেশ বলে বাড়তি সুবিধে ছিল। ছোট নদী বা নালার জলে বড় বড় জালা বা ঢাকা দেওয়া পাত্রে খাবার ভাসিয়ে রাখত। তুষারপাত হলে কাঠের বাক্সে ভরে, সেই ঠাণ্ডা বাক্স বাড়ির নীচের বেসমেন্টের ঘরে রাখত। খাবার দাবার, দুধ ইত্যাদি কদিন ওই বাক্সে ভালোই থাকত। কিন্তু শীতকাল শেষ হলে এমন সুবিধে থাকত না। গরমকালে খাবার দাবার পচে গিয়ে অসুখ বিসুখ করত। ফুড পয়েজনিংকে সে সময় লোকে বলত গরমকালের রোগ।

ওই যুগেই কিন্তু আইসবক্সের ব্যবহার ছিল। ১৮৩৮ সালের আগে থেকে কাঠের আইসবক্স তৈরি হত। ভেতরে সীসা বা টিনের পাত মোড়া লাইনিং। তার মধ্যে কাঠের গুঁড়ো, সামুদ্রিক লতাগুল্ম, বোতলের ছিপি (কর্ক) ইত্যাদি ঢেলে ইনসুলেশনের ব্যবস্থা। ভেতরে খাবার দাবার বাসন বা প্যাকেটের ওপরে এবং নীচে বরফ ছড়ানো থাকত। বরফ গলে যেতে আরম্ভ করলে সেই জল অন্য পাত্রে ঢেলে দেওয়া হত। খেয়াল না করলে পুরো বাক্সে জল ভরে যেত। এরপর বাক্সের নীচে নল আর ছাঁকনি বসানো হল। কিন্তু সেই নলের মধ্যেও আঠালো ধরনের কাদা জমে যেত। বুরুশ দিয়ে নিরমিত পরিষ্কার না করলে জল আটকে যেত। আরও এক সমস্যা ছিল। আইসবক্সের নীচে লাগানো ওই নল দিয়ে ইঁদুর উঠে আসত। তারপর খাবার দাবার পেয়ে ওখানে আস্তানা গাড়ত। এ জন্য আইসবক্স পরিষ্কার রাখার কিছু পদ্ধতিও শেখানো হয়েছিল।

বরফ জোগাড় করার ব্যাপারে শহর আর গ্রামের লোকের পদ্ধতিও ছিল আলাদা। শহরের লোকেদের চাঙড় চাঙড় বরফ কিনতে হত। ৮৬ বছরের এক বৃদ্ধার নাম ফেইথ ম্যাকসন। তিনি আমেরিকার উত্তর-পূর্বপ্রান্তের রাজ্য মেইন-এ বড় হয়েছিলেন। সেখানে রবিনহুড শহরে ওই সময় অনেক লোকই বরফ ভাঙা এবং সরবরাহ করে রোজগার করত। ফেইথের এখনও মনে আছে, প্রচণ্ড শীতের সময় শহরের পুকুরগুলো জমাট বেঁধে গেছে। সারাদিন ধরে লোকেরা বড় বড় করাত দিয়ে বরফ কাটছে। বিশাল মাপের কাঁটাচামচের মতো যন্ত্র দিয়ে চাঙড় তুলে আনছে। তারপর কাঠেরগুঁড়ো মাখানো বরফের বস্তাগুলি ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে যে যার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে বরফ ঘর থাকত। প্রায় ২/৩ মাস এভাবে বরফের বস্তা জমিয়ে রাখা যেত। শহরের লোকেরা ওই বরফওলাদের কাছে বরফ কিনত। যখন বরফওয়ালারা শহরে বরফ বিক্রি করতে যেত, ছোট ছেলেরা তাদের পেছন পেছন দৌড়াত। চাঙড় থেকে ভেঙে ছোট্ট একটা টুকরো দিলেই তারা মহা খুশি। এক বৃদ্ধ এখনও ছোটবেলার সেই স্মৃতি উপভোগ করেন।

কেনাবেচার সময় ক্রেতা/বিক্রেতার দেখা হওয়ারও দরকার হত না। শহরের লোকজন বাড়ির জানলায় এক কার্ড রেখে দিত। তাতে লেখা থাকত মোট কত পাউন্ড বরফ তার দরকার। সেই চাহিদা অনুযায়ী গ্রামের বরফওলা মাল নামিয়ে দিয়ে যেত। ক্রেতা আগাম তার দাম দেওয়ার জন্যে ওই কার্ডের

পাশে টিনের কৌটোয় ডলার রেখে দিত। এভাবে ত্রিশ/চল্লিশ পাউন্ড থেকে একশো পাউন্ড ওজনের বরফের চাঁইও সরবরাহ করা হত।

আঠারো শতকের প্রথম দিকে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে কমার্শিয়াল আইস হাউস অর্থাৎ বরফ কেনাবেচার কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। তারপর প্রায় ষাট/সত্তর বছর ধরে ব্যবসা ভালোই চলেছিল। কিন্তু আঠারো শতকের শেষাশেষি জল দূষণের সূচনা হতে পুকুরের জল জমানো বরফেও দূষণের চিহ্ন পাওয়া গেল।

একে তো বরফের গুণাগুণ নিয়ে প্রশ্ন উঠল। তার ওপর ১৮৮৯ আর ১৮৯০ সালে পরপর দু'বছর এমন গরম পড়ল যে, আইসবক্সও আগের মতো ঠাণ্ডা রাখা গেল না। ক্রমশ ব্যবসায়ীরা ভাবছিলেন এমন একটি যন্ত্র দরকার, যেখানে বরফ তৈরি হবে এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় থাকবে। এভাবেই রেফ্রিজারেটর আবিষ্কারের সূচনা হয়েছিল।

১৯১১ সালের কথা। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি একটি যন্ত্র বাজারে আনল, যা রাসায়নিক বায়ু বা কেমিক্যাল গ্যাসকে কমপ্রেস পদ্ধতির সাহায্যে শীতল বায়ুতে রূপান্তরিত করতে পারে। ১৯২০ সালের মধ্যে আমেরিকার বাজারে অন্তত দুশোটি বিভিন্ন মডেলের রেফ্রিজারেটর এসে গেল। ওই উদ্ভাবন এমন সাড়া জাগিয়েছিল যে, নিউইয়র্কার পত্রিকার হেডলাইনে ছাপা হল — কী বিস্ময়কর ঘটনা! রহস্যময় এক খোপের ভেতর একটু জল ঢেলে দেওয়া হল। খানিক পরে দরজা খুলে দেখা গেল স্ফটিকের চৌকো চৌকো টুকরোর মতো ট্রে ভর্তি বরফ ঝলমল করছে!

তবে ওই বিস্ময়কর ঘটনা দেখার সৌভাগ্য অল্প লোকেরই হয়েছিল। কারণ, রেফ্রিজারেটরগুলোকে মস্ত বড় মোটরের সাহায্যে চালাতে হত। তার জন্যে আলাদা একটি বড় ঘর দরকার হত। একে তো ওই পেল্লায় যন্ত্র কিনে বসানোর জায়গা করা শক্ত। তার ওপর দামও পড়েছিল, হাতি কেনার শামিল। ১৯২২ সালে একটি রেফ্রিজারেটরের দাম ছিল তখনকার হিসেবে ৭১৪ ডলার। এখনকার হিসেবে ৭,৮৫৬ ডলার। সুতরাং, ওই যুগে কজনই বা তা কিনতে পেরেছিল? এরপর প্রতিযোগিতার চেষ্টায় আর একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। তার নাম 'ক্রসলি আইসিবল।' কিন্তু ওই যন্ত্র চালানোও সহজ ছিল না। প্রথমত মেশিনের অর্ধেক অংশকে একটি কেরোসিন বার্নারের ওপর প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা থেকে ছত্রিশ ঘণ্টা অন্তর বসিয়ে রাখতে হত। দ্বিতীয়ত

যন্ত্রের ভেতরে যে রাসায়িনক পদার্থ ঢালা হত (শীতলতা সৃষ্টি করার জন্যে) সেটি মাঝে মাঝে ছিদ্র পথে বেরিয়ে গিয়ে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া ঘটাত। ফলে দুর্ঘটনায় লোকজন মারা যেত।

১৯৩০ সালে ফ্রিজিডেয়ার কোম্পানিই প্রথম ক্লোরোফ্লুয়োরোকার্বন- এর সাহায্যে মেশিনের ভেতর শীতল তাপমাত্রা বজায় রাখতে সক্ষম হল। ক্রমশ রেফ্রিজারেটরের চেহারা বদলাতে শুরু করল। ছোট মেশিনের মাথার দিকে বড় পাখা ঘুরছে — এরকম ধরনের রেফ্রিজারেটর তৈরি হতে লাগল।

আমেরিকার খাদ্যরুচি, সংরক্ষণের চাহিদা ইত্যাদির ওপর লক্ষ রেখে একেক যুগে রেফ্রিজারেটরের চেহারা বদল হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ফ্রিজ নির্মাতা কোম্পানিগুলি ক্রেতাদের জন্যে নতুন নতুন রান্নার বই ছাপল। এমন সব নোনতা ও মিষ্টি খাবারের ফর্দ দিল, যা রেফ্রিজারেটর থাকলেই বানিয়ে রাখা যাবে। ১৯২৯ সালে "কেল্‌ভিনেটর" কোম্পানি এভাবেই র‍্যাসপবেরি কাপ, কেলভিনেটর ফ্রুটকেক উইথ হুইপড ক্রিম, এবং কয়েকটি মাংসের পদ ও রন্ধন তালিকায় দিয়ে দিল। সেই সময় আইসক্রিম, জিলেটিন পুডিং, ঠাণ্ডা স্যালাড ইত্যাদি খুব ধনী লোকেরাই খেত। কারণ রেফ্রিজারেটর না থাকলে ওসব তৈরি করা যায় না। কিন্তু রেফ্রিজারেটরের বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়তে, তার দাম মধ্যবিত্তেরও আয়ত্তে এসে গেল। তখন তারাও বড়লোকি খাবার চিজ কেক, ফ্রোজেন চিজ স্যালাড, জমাট বাঁধা টমেটো স্যুপ দিয়ে তৈরি ফরাসি খাবার দাবার ইত্যাদি খেয়ে রসনার পরিতৃপ্তি ঘটাল।

১৯৩৭ সালের মধ্যে দুই মিলিয়নেরও বেশি সংখ্যক আমেরিকানদের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর পৌঁছে গিয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি এদেশের ৮০% পরিবার ফ্রিজ কিনতে পেরেছিল। এত বছর পরে, তার যান্ত্রিক কলাকৌশলের তেমন পরিবর্তন না হলেও ভেতর ও বাইরের চেহারায় অনেক নতুনত্ব এসেছে। এখন ফ্রিয়ন (ক্লোরোফ্লুয়োরোকার্বন) এর বদলে উন্নততর গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তার ফলে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ওই "কুল্যান্ট" বা শীতলকারী উপাদান পৃথিবীর বায়ুস্তরের "ওজন" স্তরকে বিদীর্ণ করে না। হাইড্রেটর, অটোমেটিক ডি-ফ্রস্ট সিসটেম, ফ্রিজের দরজায় বসানো আইসমেকার ইত্যাদি আধুনিক ব্যবস্থা রেফ্রিজারেটরগুলিকে আরও আকর্ষণীয় এবং সুবিধাজনক করে তুলেছে।

একদিকে যেমন রেফ্রিজারেটরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বেড়েছে, তার সঙ্গে রান্নাঘরের অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে রং মিলিয়ে তার রঙের বাহারও বেড়েছে। '৭১ সালে যখন প্রথম নিউইয়র্কে এসেছিলাম, তখন বেশির ভাগ অ্যাপার্টমেন্টেই সাদা কুকিং রেঞ্জ-এর সঙ্গে মিলিয়ে সাদা রেফ্রিজারেটর থাকত। নিউজার্সিতে এসে রান্নাঘরে ব্রোঞ্জ রঙের রেফ্রিজারেটর কুকিং রেঞ্জ আর অটোমেটিক ডিশওয়াশার পেয়েছিলাম। তখন যেবাড়িতেই যাই, দেখি তামাটে কিংবা হলদে রঙের ফ্রিজ, কুকিং রেঞ্জ, আভেন ইত্যাদি রয়েছে। এরপর এলো জলপাই রং। নতুন বাড়িগুলোতে রান্নাঘরে অলিভ গ্রিন রঙের ফ্রিজ, কুকিং রেঞ্জ, ডিশওয়াশার থেকে শুরু করে সিংকের ভেতরে ওই রঙের এনামেল করে ম্যাচ করে দিত। আমাদের প্রথম বাড়িতে সে জন্যে রান্নাঘরের মেঝেতে অলিভ গ্রিন রঙের ডিজাইন আঁকা লিনোলিয়াম বসিয়েছিলাম। জানলায় জলপাই রঙের লতা, পাতা আঁকা পর্দা ঝুলিয়ে রান্নাঘরকে প্রায় জলপাইগুড়ি বানিয়েছিলাম।

এক সময় রঙের বাহার কমে এল। অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানিরা কালো রং বাজারে ছাড়ল। কিন্তু কালো রেফ্রিজারেটর তেমন বিক্রি হল না। টুকটুকে লালও বেশিদিন চলেনি। এরপর নতুন স্টাইল নিয়ে এল স্টেইনলেস স্টিলের রেফ্রিজারেটর, অটোমেটিক ডিশওয়াশার, কুকিং রেঞ্জ, আভেন আর কিচেন সিংক। এখন এটাই দারুণ চলছে। সঙ্গে মাইক্রোওয়েভ আভেনও (স্টেনলেস স্টিলের দরজা বসানো) পাওয়া যাচ্ছে। জলপাইগুড়ি থেকে আমার রান্নাঘর এখন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট।

এদেশে পুরানো রেফ্রিজারেটর বাতিল করতে হলে দু'ভাবে করা যায়। যারা নতুন ফ্রিজ বাড়িতে ডেলিভারি দিতে আসে, তাদের পনেরো/কুড়ি ডলার দিলে তারাই পুরানো ফ্রিজ ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। তবে আগে থেকে কথা বলে রাখতে হয়। দ্বিতীয় উপায় হল নিজেরা ধরাধরি করে বাড়ির সামনে ফুটপাথে নামিয়ে দেওয়া। কাজটা এমনিতেই শক্ত। তার ওপর ফ্রিজের দরজা, ডিপ ফ্রিজের দরজা, দুটোই আলাদা করে খুলে ফেলতে হবে। অর্থাৎ পুরো ফ্রিজটা খোলা অবস্থায় থাকবে। ছোট ছেলে মেয়েদের নিরাপত্তার জন্যই এই নিয়ম। তারা রাস্তায় লুকোচুরি খেলতে গিয়ে বন্ধ ফ্রিজের মধ্যে যাতে ঢুকতে না পারে, সেজন্যে শহরের পুরবিভাগ থেকে ওই নিয়ম জারি করা হয়েছে। নতুন ফ্রিজ কেনার সময় পুরানো বা খারাপ হওয়া

ফ্রিজ বাতিল করার জন্য পনেরো/কুড়ি ডলার খরচ করে তার সদগতি করা যায়। মুশকিল হয়, যদি বাড়িতে দুটো ফ্রিজের মধ্যে একটি অকেজো হলে শুধু সেটাকেই বাইরে পাচার করতে হয়। যেহেতু তখনই নতুন ফ্রিজ কেনা হচ্ছে না, সেই কোম্পানির লোকেরা সাহায্য করতেও আসবে না। এসব ঝামেলা এড়াতে তখন পয়সা খরচ করে মুটে ডাকতে হয়। মুটে মানে "হলিং কোম্পানি"র লোক। নিজেদের ভ্যান নিয়ে এসে ভারী ভারী হাবিজাবি জিনিস, ভাঙাচোরা ফার্নিচার ইত্যাদি তুলে নিয়ে যায়। অন্তত পঞ্চাশ ডলারের কমে এরা কোনও জিনিস তুলে নিতে আসবে না। পুরনো ফ্রিজের গুরুভার বহন করার ভয়ে ওদেরই ডাকতে হয়। তবে এদেশে মেশিনপত্র সহজে খারাপ হয় না বলে রক্ষে। বহু বছর বাদে যদি বা খারাপ হল, তা মেরামতের জন্যে যা খরচ পড়বে, কিছু বাড়তি খরচ করে নতুন জিনিস কেনাই সুবিধে। সারা বছরের বড় বড় সেলগুলোতে ফ্রিজের দামও কমিয়ে দেয়। ধরুন, জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির ২৪.৬ কিউবিক ফিটের স্টেনলেস স্টিলের একটি রেফ্রিজারেটরের দাম ৬৯৯ ডলার। আমেরিকার লেবার ডে উইক এন্ড অথবা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্পেশ্যাল সেল-এর দিন ওটাই হয়ে যাবে ৬৪৯ ডলার। তার ওপর দোকানের সেলসপার্সন আর ম্যানেজারের সঙ্গে দরাদরি চালিয়ে গেল আরও ডলার কুড়ি/পঁচিশ ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ, ৬৩০ ডলারে অত বড় ফ্রিজ পাওয়া গেল। এমনিতে ৪০০ ডলার থেকেই পছন্দমতো ফ্রিজের দাম শুরু হয়। সবচেয়ে ছোট্ট মাপের মিনি ফ্রিজ আশি ডলারের মধ্যে পাওয়া যায়।

এদেশে দুই দরজাওলা ফ্রিজের একদিকে পুরোটাই ডিপ ফ্রিজ বা ফ্রিজার সেকশন। এমনিতেও যে কোনও ফ্রিজের ওপর দিকের বেশ বড় অংশ জুড়ে ফ্রিজার থাকে। মাছ, মাংস, ফ্রোজেন ভেজিটেবলের প্যাকেট, রান্না করা ফ্রোজেন ডিনার, আইসক্রিম ইত্যাদি রাখার জন্য ওই ব্যবস্থা। আজকাল শুধু ভারতীয় মশালাপতির দোকানেই নয়, আমেরিকান সুপারমার্কেটেও প্যাকেটের মধ্যে ফ্রোজেন ইন্ডিয়ান খাবার বিক্রি করে। নিউইয়র্কের 'দীপ ফুড কোম্পানি'র রাইস অ্যান্ড চিকেন টিক্কা মশালা, ইংল্যান্ড থেকে আসা সামোসা বা চিকেন কোর্মা, বাঙ্গালোরে তৈরি 'ভেজিটেরিয়ান ট্রে' রাইস অ্যান্ড মটর পনির ইত্যাদি অনেক কিছু হিমায়িত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং ডিপ ফ্রিজে রাখার মতো পদাবলীও বাড়ছে।

তবে জমাট বাঁধা খাবার দাবার জমা করার ঝামেলাও আছে। এক মহিলা প্রচুর কাঁচা বাজার করে রেখে নিউজার্সি থেকে ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছিলেন। ফ্রিজারে পাঁঠার মাংস, মুরগির ঠ্যাং, আস্ত ইলিশ, পাঁচ পাউন্ড চিংড়ি জমে কাঠ হয়েছিল। মহিলার স্বামী তখন চাকরিসূত্রে এক বছরের জন্যে ক্যালিফোর্নিয়া থাকতেন, উনি মাঝে মাঝে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতেন। তো, একবার প্রায় মাসখানেক কাবার করে নিউজার্সির বাড়িতে ফিরতেই ভির্মি খাওয়ার অবস্থা। সব বাড়িতে পচা মাংসের গন্ধ ছড়াচ্ছে। বন্ধ বাড়িতে কোনও জন্তু টন্তু ঢুকে মরেছে ভেবে, মহিলা ছুটে পাশের বাড়িতে গেলেন। প্রতিবেশীরা সঙ্গে এসে তারাও নাক টিপে ওয়াক তুলে পালাচ্ছে। কেউ সন্দেহ করছে, মরা মানুষের গন্ধ নয়তো? শেষ পর্যন্ত পুলিশ এল। তারাই আবিষ্কার করলে, মানুষ বা জন্তু টন্তু নয়, রাম পচা পচেছে ফ্রিজারের ওই মাছ, মাংসগুলো। সময় বুঝে রেফ্রিজারেটর খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওই কাণ্ড! তারপর পচা মাংসশুদ্ধ ফ্রিজ তো বিদায় হল। কিন্তু বাড়ির বীভৎস গন্ধ তাড়াতে কয়েকদিন ধরে শুধু ক্লোরিন ব্লিচ আর এয়ারফ্রেশনারের শ্রাদ্ধ। পচা ইলিশ আর গোবর হয়ে যাওয়া চিংড়ির জন্যে মহিলাকে খুব আক্কেল সেলামি দিতে হয়েছিল।

দু'মাস আগে আমিও পুলিশ ডেকেছিলাম। সকালবেলা বেসমেন্টে নেমে অন্য রেফ্রিজারেটরটার ডিপ ফ্রিজের দরজা খুলতেই পিঁপ পিঁপ শব্দে স্মোক অ্যালাম বাজতে লাগল। সর্বনাশ। ফ্রিজের তারেটারে আগুন লাগলো নাকি? মাত্র আড়াই বছর হল কিনেছি। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। ভয় পেয়ে পুলিশ আর ফায়ার ডিপার্টমেন্টে ফোন করলাম। তারপর প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ওভারকোট চাপিয়ে ড্রাইভ-ওয়েতে পালিয়েছি। নিউমোনিয়া হলে হাসপাতালে যাব। তবু জতুগৃহে রব না। দাঁতকপাটি লাগার আগেই পুলিশের গাড়ি, আর ফায়ার ডিপার্টমেন্টের মই ঝোলানো লাল ট্রাক গম গম করে ড্রাইভওয়েতে উঠে এল। ফায়ারম্যানদের মাথায় হেলমট, হাতে লম্বা নল বসানো কী সব যন্ত্রপাতি। সবাই মিলে গ্যারাজ দিয়ে বেসমেন্টে ঢুকে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। ততক্ষণে স্মোক অ্যালার্ম থেমে গেছে। কোথাও ধোঁওয়ার গন্ধও নেই। কিন্তু আমি যে ভুল শুনিনি, তা প্রমাণ করার জন্যেই বোধ হয় হঠাৎ আবার 'পিঁক পিঁক শব্দ হল। ফায়ার ম্যানদের সঙ্গে ওদের 'হ্যাজ-ম্যাট' টিমও চলে এসেছে। হ্যাজার্ডস মেটিরিয়াল থেকে ধোঁওয়া

বেরচ্ছে কি না পরীক্ষা করবে। তারা মুখোশ পরে বয়লার রুমে ঢুকে গেল। হাতের মস্ত ক্যামেরাটা এক্স-রে মেশিনের মতো। তাই দিয়ে দেওয়ালের অভ্যন্তরের ছবি নিচ্ছে। গুপ্ত আগুন বা বিস্ফোরক থাকলে ধরা পড়বে। বয়লার রুমে ফার্নেস ইত্যাদি থাকে। কিন্তু কোথাও ধোঁওয়ার চিহ্ন পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করে দমকল বাহিনী আশ্বাস দিয়ে গেল কোথাও আগুন লাগেনি। বোধহয় স্মোক অ্যালার্মের ব্যাটারি পুরনো হয়েছে। তাই পিঁক পিঁক করে জানান দিচ্ছে, যাতে ব্যাটারি বদলানো হয়।

কিন্তু সে আওয়াজ আমি চিনি। তখন হঠাৎ হঠাৎ পিক ধ্বনি হয়। আর এবার তো প্রচণ্ড জোরে একটানা বেজে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না। সন্দিগ্ধভাবে পুলিশ আর দমকলকে বললাম — যদি আবার ওরকম অ্যালার্ম বাজে, তখন কিন্তু আবার ফোন করব। হেলমেট পরা ফায়ারম্যান ভরসা দিল — তখন আবার আসব।

দলবল বিদায় নিলে আমার স্বামী ভবানীকে অফিসে ফোন করে সবিস্তারে জানালাম। ভবানী অবাক — 'এ তো সিম্পল ব্যাপার। ফ্রিজের ওপর সিলিংয়ে স্মোক অ্যালার্ম বসানো আছে। যেই তুমি ফ্রিজারের দরজা খুলছ, ফ্রিজার ওয়াজ গোয়িং থ্রু ডিপ-ফ্রস্ট সাইকল। দরজার খুলতেই ওয়াটার ভেপার বেরিয়েছে। সিলিংয়ে স্মোক অ্যালার্মের ইলেকট্রিক আইকে ঝাপসা করে দিয়েছিল। আগুন লাগলে ধোঁওয়াও ঠিক এক কাজ করে। ইলেকট্রিক আই একটু সময়ের জন্যে আবছা কিছু দেখলেই অ্যালার্ম বাজিয়ে দেয়। ফ্রিজার থেকে বেরনো মিস্ট দেখে বাজতে আরম্ভ করেছিল। তারপর আপনিই থেমে গেছে। ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লোকগুলোকে বলেছিলে ডিপ ফ্রিজের দরজা খোলার কথা?'

সে আর বলিনি? তারা তো কানেই নিল না। আগুন খোঁজার জন্যে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াল। হিমযন্ত্র যে আবার আচমকা আর্দ্র ধূম উদ্গীরণ আমিই বা জানব কী করে?

স্মরণ

অনেক বছর আগের কথা। পান্নালাল ভট্টাচার্য মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে তাঁর স্মরণে "প্রিয়া" সিনেমায় একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। গান, কবিতা পাঠ, পান্নালাল সম্পর্কে অন্যান্য সংগীত শিল্পী ও পরিচিতজনের, এভাবেই অনুষ্ঠান চলছিল। এক সময় মঞ্চে এলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন দর্শকরা তাঁর কাছে কী আশা করেছিলেন জানি না। এটুকু মনে আছে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন — আমি কৌতুক অভিনয় করি। ফাংশানে আমাকে লোক হাসানোর জন্যে ডাকে। কিন্তু আজ সে জন্যে আসিনি। পানু ছিল আমার ছোট ভাই-এর মতো। আমার আগেই চলে গেল। আজ আর হাসির কথা বলতে পারলাম না। আপনারা আমাকে ক্ষমতা করবেন।

স্মরণসভা তো এমনই হয়ে থাকে। সেখানে কৌতুকের স্থান নেই। শ্মশান থেকে স্মৃতিবাসর পর্যন্ত মৃত্যু যে বিষাদের আবরণ বিছিয়ে রাখে, একমাত্র সময়ই পারে ধীরে ধীরে তা থেকে মুক্তি দিতে। সেই বিষণ্ণ ভাবগম্ভীর পরিবেশ আমাদের অনুভূতিকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে। একটি শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ঘিরে সমবেদনা, সান্ত্বনার যে আবহ সৃষ্টি হয়, সেখানে হাসি, রসিকতা, অবান্তর গল্পগুজব সামাজিক দৃষ্টিতে অশোভন ঠেকে।

আমেরিকান সমাজেও তা দেখেছি। তবে ফিউন্যারাল হোমে বা কবরখানায় যে বিষাদচ্ছন্ন, ভাবগম্ভীর পরিবেশ থাকে, কয়েকদিন পরে মেমোরিয়াল সার্ভিসের দিনে সে তুলনায় সকলকেই শোক সংবরণ করে স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখি। অনুষ্ঠান বলতে পারিবারিক স্মৃতিচারণ, গান, কবিতা পাঠ, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের পক্ষ থেকে প্রয়াত

মানুষটি সম্পর্কে নানা কথা। সবশেষে চা, কফি আর জলখাবারের ব্যবস্থা। একটি বিষয় লক্ষ করেছি যে, স্মৃতিচারণের সময় অনেকে বেশ মজার ঘটনা বলছেন। স্মৃতিসভা মানেই শুধু দুঃখের কথা নয়। লোকটি মহৎ চরিত্র ছিলেন বলে ভুরি ভুরি প্রশংসা নয়। সম্ভবত এরকম চিন্তা থেকে এঁরা ওই সব মজার মজার ঘটনা বলতে চান। দোষে-গুণে মেলানো একটি মানুষের সঙ্গে তাঁদের যে সুখ-দুঃখের বন্ধন ছিল, হাসি রসিকতার মধ্যে দিয়ে সেই অনুষঙ্গ তুলে ধরেন। আশা করেন ঘরের আবহাওয়া একটু হালকা হবে।

এ অভিজ্ঞতাও আমার কাছে নতুন নয়। শ্রাদ্ধবাসরে না হলেও স্মৃতিসভায় কৌতুকস্নিগ্ধ কথাবার্তা শুনছিলাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যাওয়ার পরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কমিটি কলকাতায় যে স্মরণসভা করেছিলেন, সেখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পরিচয়ের গল্প খুবই সরস ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছিলেন।

সুতরাং এটি বোঝা যাচ্ছে যে, শোকসভায় শুধু যে বিয়োগান্ত কথা হয় তা নয়। অনুষ্ঠানের ভাব গাম্ভীর্য বজায় রেখেও আন্তরিক স্মৃতিচারণের মাধ্যমে কিছু মাধুর্য আরোপ করা যায়।

আমেরিকার এখন আবার নতুন রব উঠেছে — মৃত্যুর পরে শুধুই শোক নয়, একটি জীবনের যাত্রাপথ সম্পূর্ণ হল বলে হাসি মুখে তা উদ্‌যাপন করো। জীবনের মতো মৃত্যুও স্বাভাবিক পরিণতি। তাকে স্বীকার করে নাও, উৎসবের মধ্যে দিয়ে বরণ করে নাও। লোকে বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁর মরণোৎসবের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলছে। ফিউন্যারাল কোম্পানিকে নির্দেশ দিয়ে রাখছে। এমনকি নিজের কফিন, পুড়িয়ে দিলে ছাই রাখার পাত্র, সব আগাম পছন্দ করে রাখছে। কিনেও ফেলছে। এবারে সে প্রসঙ্গে লিখছি।

গত বছর জ্যাক নামে এক কালো ভদ্রলোক আড়াই বছর ধরে অসুখে ভুগে মারা গেলেন। তিনি ছিলেন খেলাপাগল মানুষ। মায়ামি ডল্‌ফিন নামে বেসবল দলের সমর্থক। জ্যাক-এর বউ বললেন — মানুষটা প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে রোগযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেলেন। এজন্যেই আমি সবাইকে ডেকে সাড়ম্বরে ওঁর শেষ কাজ করব।

সে কী আয়োজন! জ্যাক-এর বউ-এর নির্দেশ ফিউন্যারাল হোমেই ছোট্ট স্টেডিয়ামের সেট বানানো হল। সেখানে ওই বেসবল দলের খেলোয়াড়দের

ছবি, ব্যাট বলের নমুনা ঝুলছে। কফিনের চারপাশে জ্যাকের গল্‌ফ স্টিক, সাঁতারের পোশাক, বিলিয়ার্ড বা পুল খেলার ছড়ি, আর বেশ কয়েকটি পারিবারিক ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। জ্যাকের প্রিয় ছবি "ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা"-র গান বাজছে "অ্যাজ্ টাইম গোজ বাই..."। জ্যাকের জীবনের যন্ত্রণাদায়ক শেষ দিনগুলি নয়, তার আগের সুসময়ের কথা জানানোর জন্যেই এরকম ফিউন্যারালের আয়োজন করা হল।

একদল আমেরিকান বলছেন আমরা ওই পুরানো রীতি-নীতি মানতে চাই না। দাদু, দিদিমা, মা, বাবার ফিউন্যারালের মতো শুধু কান্না, পুরোহিতের বক্তৃতা আর একঘেয়ে অর্গ্যানের বাজনা চাই না। আমরা বৈচিত্র্য আনব। মৃত্যু মানেই শোক নয়, মৃত্যু হচ্ছে জীবন শেষ হওয়ার উৎসব।

ফলে বৈচিত্র শুরু হয়ে গেছে। এদের পছন্দ মতো নিজস্ব কফিন তৈরি হচ্ছে। শোকযাত্রায় এতকাল শুধু কালো ক্যাডিলাক গাড়ি সার বেঁধে যেত। ফিউন্যারাল হোম থেকে সে ব্যবস্থা করে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মোটর সাইকেল, স্পোর্টস কারও সারি দিয়ে চলেছে। চিতাভস্মের সঙ্গে কী সব মিলিয়ে হীরের আংটি, দুল তৈরি হচ্ছে। কেউ আবার চাইছে, তার ছাই-এর সঙ্গে বারুদ টারুদ মিলিয়ে হাউই-এর মতো বাজি বানানো হোক। কিংবা বোমা বানানো হোক। পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যাবার আগে ফাটাফাটি কাণ্ড করে যাবে আর কি!

এতকাল তো সাহেবদের মরে ছাই হবার রেওয়াজ ছিল না। কবরখানাতেই শেষ শয্যা। কিন্তু আমেরিকায় ক্রমশ ক্রিমেটোরিয়ামের সংখ্যা বাড়ছে। ধর্মনির্বিশেষে নানা জাতের মানুষ দাহপ্রথাকে সমর্থন করছে। দশ বছর আগে এদেশে মাত্র ১০% মৃতদেহ দাহ করা হত। আর এখন সারা বছর যত লোক মারা যায়, তার ২৭% মৃতদেহ ক্রিমেটোরিয়ামে দেওয়া হয়। এদেশে আবার "ক্রিমেশন অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা" নামে শ্মশান সংগঠন আছে। তারা আশা করছে আর কুড়ি বছরের মধ্যে ৪৮% মৃতদেহ কবরের বদলে চিতায় চলে যাবে। তার কারণ, একে তো ইমিগ্র্যান্টদের দল ভারী হয়ে গেছে। হিন্দু আর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেদের মৃতদেহ দাহ করা ছাড়াও কিছু কিছু রোম্যান ক্যাথলিকও এই প্রথা গ্রহণ করছে। ষাটের দশক থেকে রোম্যান ক্যাথলিকও এই প্রথা গ্রহণ করছে। দ্বিতীয়ত, শেষকৃত্যের খরচ কমানোর জন্যেও দাহ প্রথা প্রচলন বাড়ছে। আমেরিকায় মৃতদেহ একদিন ফিউন্যারাল হোমে রাখা আর

পরদিন কবর। দেওয়ার খরচপত্র মিলিয়ে অন্তত সাত/আট হাজার ডলার পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে দাহ খরচ পড়ে মাত্র হাজার খানেক ডলার। ইদানীং বাঙালি সমাজেও দেখেছি মৃতদেহ একদিন ফিউন্যারাল হোমে রাখার বদলে অনেক পরিবার থেকে সরাসরি ক্রিমেটোরিয়ামেই পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন। এ দায়িত্বও অবশ্য ফিউন্যারাল ডিরেক্টরই নেন। তবে, পার্লারে দেহ রাখার বদলে সরাসরি ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে গিয়ে সেখানেই পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম শেষ করে দাহ করা হলে খরচ অনেক কম হয়। আমাদের সমাজের রীতি অনুযায়ী ভস্ম দেশে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। আমেরিকানরা সেই ভস্ম পাত্রটি নিয়ে, কেউ বা নিজেদের পূর্ব পুরুষের সমাধির পাশে মাটিতে পুঁতে দেন। কেউ সমুদ্রে ভস্ম ছড়িয়ে দেন। কেউ প্রিয়জনের দেহাবশেষ রেখে দেবেন বলে ভস্ম পাত্রটি বাড়িতেই রেখে দেন।

আবার উদ্ভট শখও আছে কিছু লোকের। বেঁচে থাকতেই ছাই রাখার বন্দোবস্ত করে ফেলছেন। লস এঞ্জেলেসের এক আর্ট-ডিলারের মাছ ধরার ভীষণ ঝোঁক। তো, সে চায় মরে গিয়ে গলদা চিংড়ির পেটে আস্তানা নেবে। সে জন্যে এখন থেকেই দশ ফুট লম্বা এক কফিন বানিয়ে রেখেছে। বিশাল গলদা চিংড়ির মতো দেখতে সেই কাঠের কফিনে তার ছাই ঢেলে রাখা হবে।

কোন লোকের ছাই কীভাবে রাখা হবে, সে নিয়ে ইতিমধ্যে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। একটা কোম্পানির নাম "ইটারন্যাল রিফ" অর্থাৎ চিরন্তন সাগরনুড়ি। এরা করে কী, ছাই দিয়ে শক্ত পাথরের মতো খাঁজ কাটা কাটা নুড়ি বানায়। অনেকটা প্রবালের মতো দেখতে। সেই ভস্মশিলা সমুদ্রগর্ভে পাঠিয়ে দেয়। এতে নাকি প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার কাজ হবে। কোনও লোক চায় তার ছাই পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরে বেড়াক। হিউস্টনের এক রকেট কোম্পানি সেই ব্যবসা ফেঁদেছে। ক্যাপসুলের মধ্যে ছাই পুরে দিয়ে রকেটে করে আকাশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মৃতদেহের ছাই দিয়ে হীরের মতো পাথর বানাচ্ছে "লাইফ জেম" নামে একটা কোম্পানি। এক মহিলা তাঁর মায়ের ছাই জমা দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট দুটি হীরে মার্কা লকেট তৈরি করিয়েছেন। তাঁর দুই মেয়ে নাকি "দিদিমা"কে গলায় পরে থাকবে। দিদিমার চরিত্র নাকি হীরের মতোই উজ্জ্বল ছিল।

এতরকম নতুন ধুয়ো উঠেছে যে, ফিউন্যারাল কোম্পানিগুলো তাল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। ফিউন্যারাল আর কবর দেওয়ার কারবারে তারা

এতদিন প্রতিবছর ১৬/১৭ বিলিয়ন ডলারের (সম্মিলিত হিসেব অনুযায়ী) ব্যবসা করছিল। এখন "ছাইভস্ম" নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে যে, আগের মতো মোটা রোজগার হচ্ছে না।

এ জন্যেই শেষকৃত্য বিশেষজ্ঞরা মার্কেটিং রিসার্চে নেমেছে। লোকেদের চাহিদা বুঝে এগোনো দরকার। তো, গত বছর মিনেসোটাতে এ বিষয়ে সেমিনার হল। নানা শহর থেকে ফিউন্যারাল ডিরেক্টররা গিয়েছিলেন। দারুণ সব আইডিয়া নিয়ে ফিরেছেন। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও করছেন। নানারকম সেট সেটিং তৈরি করতে হচ্ছে। কেউ চান তাঁর মার কফিনের পেছন দিকে রান্নাঘর সাজানো হবে। তিনি রাঁধতে ভালোবাসতেন। মেয়ের কথা অনুযায়ী নকল আভ্ন বসিয়ে, বাসন কোসন, হাতা বেড়ি, কেটলি, টি-পট সাজানো হল। শুধু তাই নয়, একটা গামলায় বনস্পতি দিয়ে ভাজা তেলচপচপে মুরগির ঠ্যাংও রাখা হল। পাশে ভেজিটেবল শর্টেনিং বা বনস্পতির গোল টিন। এটি ছিল এক কালো মহিলার ফিউন্যারাল। কালো সমাজে বৃদ্ধা মায়েরা বেশ ফ্যাটযুক্ত খাবার-দাবার বানান। বিশেষ করে ছুটির দিনে "ডালডায়" ভাজা মুরগি তো হবেই! মা মারা যাওয়ার পর মেয়ে সেই স্মৃতি অনুযায়ী ফিউন্যারাল হল সাজাতে চাইল। বুদ্ধদেব বসুর গল্প "রান্না থেকে কান্নার" বদলে কান্না থেকে রান্না।

এক যুবতী প্রজাপতিদের সঙ্গে উড়ে যেতে চেয়েছিল। ওভেরিয়ান ক্যানসারে অসময়ে মারা গেল। তার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তার স্বামী ফিউন্যারাল ডিরেক্টরদের এক খাঁচা ভর্তি প্রজাপতির বন্দোবস্ত করতে বললেন। দেহ চুল্লিতে দেওয়ার পর প্রজাপতিদের আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হল।

এমনিতে ফিউন্যারাল হোমে একটা নতুন খাতা রাখা থাকে। শবযাত্রীরা সেখানে প্রিয়জনের মৃত্যুর স্মরণে কিছু লিখে দেয়। পরে খাতাটি মৃতের পরিবারকে দিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল অনেক চার্চের দেওয়ালে বড় বড় সাদা পোস্টার সেঁটে দেয়। তার ওপর লোকে শোকবার্তা লিখে দেয়। কোথাও ভিডিও স্ক্রিন টাঙিয়ে মৃত লোকটির জীবদ্দশার নানা আনন্দময় মুহূর্তের ছবি দেখানো হয়। অর্গ্যানে দুঃখের বাজনার বদলে ক্যাসেটে গান বাজে। মৃত লোকটির প্রিয় ছিল এমন সব গান। শুধু করুণ সুর বাজাতে হবে, তার কোনও মানেই নেই। লাগাতার বেহালা আর তবলা ছাড়া গান নয়, রীতিমতো বাদ্যবৃন্দ চলতে পারে।

আমেরিকায় ফিউন্যারাল ব্যবস্থায় ক্রমশ যে পরিবর্তন হচ্ছে, তার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, পৃথিবীর নানা দেশের লোকেরা এখানে বসবাস করায় তাদের নিজস্ব রীতি, নীতির প্রভাব পড়ছে। যেমন দাহকার্য। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের কথা ভেবেও মূল সমাজের একাংশ বলছেন, কবরের জমি কিনে জায়গা নষ্ট না করে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা উচিত। এছাড়া খরচের কথা বিবেচনা করেও ফিউন্যারাল আর কবরের জমির জন্যে বেশি অর্থ ব্যয় করতে চাইছেন না অনেকে। তাঁদের বক্তব্য ওই সাত/আট হাজার ডলার পরিবারের জন্যে রেখে যাওয়া উচিত। যাঁরা কোনও আড়ম্বর চান না, তাঁরা বলছেন — কবরে তো যেতেই হবে। কিন্তু তার জন্যে অত দামি কফিন, স্যুট, বুট আর পার্লারে শুয়ে থাকার খরচ দেব কেন? তার চেয়ে জিনস আর গেঞ্জি পরে সুতির একটা কাপড় জড়িয়ে কবরখানার গর্তে শুয়ে থাকব। ছেলে-মেয়েরা মাটি চাপা দিয়ে চলে যাবে। আমরা একদিন সার হয়ে যাব। একটা দুটো গাছের পুষ্টি হবে। এঁরা সেই হরিনাথের মতো। ধাপায় মাটি চাপা হয়ে ট্যাঁড়শ ফলাবেন। এসব ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন একদল উদ্ভিদ বিজ্ঞানী।

আর একদল বলছেন পুরানো প্রথা বদলাতে হবে জন্মদিন আর বিয়ের উৎসবে যেমন আধুনিকতার ছোঁওয়া লেগেছে, মৃত্যু উপলক্ষেও সেরকম নতুনত্ব আনতে চাই। স্বজন হারানোর দুঃখ, সে তো আছেই। সে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি। তবু, শুধু অশ্রু দিয়ে নয়, জীবনকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে বিচ্ছেদকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করো। শেষের দিনটি হোক উৎসবের দিন।

ভাবছি শেষের দিনের জন্যে আগাম একটা গান বেছে রাখলে হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ বাদ দিয়ে বাংলা ব্যান্ডের সঙ্গে "তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই।" ফিউন্যারাল হোমের বারান্দায় বসে আত্মীয়, বন্ধু, অবন্ধুরাও যাতে সমস্বরে গলা মেলায়, সে ইচ্ছেও সময় থাকতে জানিয়ে যেতে হবে। তারা নাচতে রাজি থাকলে সে সাজেশনও দিয়ে যাব। আমার কফিনের পেছনে গাদাখানেক গল্পের বই আর শোনপাপড়ির প্যাকেট। প্রিয় বস্তু। জোর মিউজিক বাজছে। মরণকে বরণ করার উৎসবে সকলে কফিন ঘুরে ঘুরে দুলকি চাল নাচছে... তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই...।

আহা! সেই নৃত্যলীলা আমার দেখা হবে না। শুনতে পাব না চন্দ্রবিন্দু আর ভূমির গান। নিজের নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসে গেছে তো!

আমেরিকার প্রিয় খেলা

ফুটবল, কড়াপাক, ইলিশমাছ, মিনিবাস — এই চারটি কথা যদি 'চল চল চল। ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' স্টাইলে গাইতে গাইতে এগিয়ে যান, দেখবেন প্রতি পদক্ষেপে দেহে মনে আশ্চর্য বাঙালিয়ানার সঞ্চার হচ্ছে। চতুরঙ্গের মধ্যেই বঙ্গ পরিচয়। আমেরিকানরা তো কোন কালে এমন একখানা চৌতালা বেঁধেছিল। বেসবল, হট ডগ, অ্যাপল পাই, শেভ্রলে...।

গানের ভিতর দিয়েই মার্কিনি মার্কামারা পরিচয়। সে আজন্ম কাল অ্যাপল পাই খাবে। আমৃত্যু হট ডগ। জন্ম জন্ম বেসবল খেলবে আর শেভ্রলে গাড়ি চালাবে।

ইদানীং অবশ্য তিনটে কমন ফ্যাক্টর ধরে রাখা মুশকিল হচ্ছে। ওজন সচেতন ছেলেমেয়েরা আর যখন তখন হট ডগ, অ্যাপল পাই খাচ্ছে না। আমেরিকার গাড়ির বাজারেও জাপান জার্মানি ঢুকে পড়েছে। শেভ্রলের সোনার যুগ শেষ। একমাত্র বেসবলই যা ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। আমরিকানদের প্রিয় খেলা হিসেবে এখনও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এ খেলার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে নিউইয়র্ক আর নিউজার্সির মধ্যে ক'বছর আগেই জোর তর্কবিতর্ক বেধে গিয়েছিল। দুই রাজ্যই এ খেলার সূত্রপাতের ভূমিকা নিয়ে প্রথম হওয়ার দাবি জানাতে ব্যস্ত। কিন্তু মীমাংসা হল মাংসের কল্যাণে। পর্ক অর্থাৎ শুকরছানার মাংস শেষ পর্যন্ত প্রধান ভূমিকায় এসে প্রমাণ করল নিউজার্সির হোবোকেন শহরই হচ্ছে বেসবলের প্রকৃত জন্মস্থান। যদি আজ থেকে দেড়শো বছর আগে হোবোকেনের 'ম্যাকাটি' হোটেলে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের জন্য ঢালাও মাংসের বন্দোবস্ত না করা হত, নিঃসন্দেহে অন্য

কোথাও বেসবল টিম গড়ে উঠত। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনেই কোনও ক্লাব তৈরি হয়ে যেত। সত্যি বলতে কি, সেই একশো দেড়শো বছর আগেও ভালোমন্দ খাবার আর প্রচুর বিয়ারের বন্দোবস্ত না রাখলে এদেশের ছুটির দিনের খেলাগুলো মোটেই জমত না। ম্যাকাটি হোটেলে যেমন ছিল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন, তেমনি ছিল হোটেলের পাশে মস্তবড় খেলার মাঠে। এ জন্য খেলোয়াড় দর্শক দু'দলই হাডসন নদীর ধারে ওই এলিসিয়ান মাঠে এসে জড়ো হল।

ম্যানহাটনের অপ্রশস্ত ক্লাব ঘর ছেড়ে 'নিকার বোকার অ্যাথলেটিক অ্যান্ড সোশাল ক্লাব'-এর কুড়ি পঁচিশজন খেলোয়াড় এপারে খেলতে এল। সে সময় নদী পারাপার করত 'স্টিভেন্স বার্কলে ফেরি কোম্পানি'র স্টিমার। নিউইর্য়ক থেকে নিউজার্সি যাতায়াতের ভাড়া ছিল ১৩ সেন্ট। ১৮৪৬ সালের এক বসন্ত দিনের তারা দল বেঁধে সারাদিন নদীর ধারে ব্যাট আর বল নিয়ে এলোপাথাড়ি মার, দৌড়ঝাঁপের শেষে ক্ষুধার্ত দল ঢুকে পড়ল ম্যাকাটি হোটেলে। সেদিনের খেলার শেষে রাতের ভোজই নাকি ছিল প্রধান আকর্ষণ।

সে বছরই অর্থাৎ ১৮৪৬-এর ১৯ জুন নিকার বোকার ক্লাব তাদের এই নতুন ধরনের খেলা নিয়ে ম্যাচ লড়বে বলে এক প্রতিপক্ষ দলকে ডেকে আনল। তখনও মার্কিন অভিবাসী সমাজে ইংল্যান্ডের একচ্ছত্র প্রভাব। ফলে ক্রিকেট খেলাও চলছে। সেই রকমই একদল ক্রিকেট খেলোয়াড় এদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বেসবল খেলতে এল। এও ঠিক হল, যে দল হারবে, তারা জিতে যাওয়া দলকে রাতে ওই ম্যাকাটি হোটেলে খাওয়াবে। খেলার শেষে ফিস্ট হবে পরাজিত দলের খরচে।

ক্রমশ ম্যাচের দিন এগিয়ে আসছে। কিন্তু উদ্যোক্তা নিকারবোকার দলের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের এতই আত্মবিশ্বাস যে, প্র্যাকটিস করাটাও সময় নষ্ট বলে ভাবছে। অথচ সর্দারির শেষ নেই। তাদের দলপতি আলেকজান্ডার বার্টরাইট নিউইয়র্কের সেই ক্রিকেট দল 'নিউইয়র্ক নাইন'কে অনবরত 'নতুন খেলার' বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে আসছেন। বাকিরা তো অসম্ভব নিশ্চিন্ত। কারণ জয় হবেই।

শেষে একেবারে মোক্ষম শিক্ষা হল। কোনও রকম প্রস্তুতি না থাকার ফলে নিকারবোকার অ্যাথলিটিক গোহারা হারাল। ২৩-১ পয়েন্টে জিতে গেল 'নিউইয়র্ক নাইন'। যেমন খেলার বহর তেমন তাদের খিদের বহর। পরের পয়সায় ভোজ বলে কথা। ম্যাকাটি হোটেলে 'নিকার বোকারের' ঢালাও পর্ক

আর ভালোমন্দ খাবার। সঙ্গে বিয়ার। 'নিউইয়র্ক নাইন' তো আনন্দে আত্মহারা। এদিকে একই রাতে দলের সম্মান ও গ্যাঁট খরচা দিয়ে মুখে নিচু করে বাড়ি ফিরল চ্যালেঞ্জার নিকারবোকার পার্টি। এরপর তিনটি বছর একদম চুপচাপ। 'নতুন খেলার' আর নামই করল না। নিজেরা যাও বা আপন মনে খেলা যায়, হামবড়া হাবভাব করে অন্য দল ডেকে এনে ম্যাচ খেলার ঝুঁকি নেওয়া যায় না। কিন্তু খেলোয়াড় দল কি প্রতিযোগিতা ছাড়া বেশিদিন থাকতে পারে। আবার বছর তিনেক বাদেই ম্যাচ খেলার ইচ্ছে জাগল। আর তখনই দেখা গেল আমেরিকার পূর্ব উপকূলে কত দল এই খেলার টিম গড়ছে। ফিলাডেলফিয়া থেকে বস্টন পর্যন্ত বহু দল ঠিক সেই খেলাই খেলছে, যা তিন বছর আগের 'নিকার বোকার' দল বনাম 'নিউইয়র্ক নাইন' খেলেছিল। নিয়ম কানুন হুবহু সেইরকম রেখেছে। সুতরাং ১৮৪৬ সালের সেই ১৯ জুনের খেলাকেই বেস বলের সূচনা বলে ধরতে হবে। আমেরিকার বেসবলের ইতিহাস প্রসঙ্গে খেলা বিশেষজ্ঞরা একমত যে — নিউজার্সির হোবোকেন শহরেই এই খেলার জন্ম হয়েছিল। বাদবাকি অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা একমত না হলেও বেসবলের ইতিহাসে ওই তারিখটি আর মাঠটির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের দ্বিমত নেই।

কয়েক বছর আগে নিউজার্সির রাজধানী ট্রেনটন আর বেসবলের পীঠস্থান হোবোকেনে বেসবলের ইতিবৃত্ত নিয়ে আগ্রহ যেন তুঙ্গে উঠেছিল। ওদিকে নিউইয়র্কের রাজধানী অলব্যানি আর বেসবলের অন্যতম কেন্দ্র কুপার্স টাউনেও সমান প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ১৯ জুনের স্মরণে হোবোকেনে বিরাট উৎসব হল। কুচকাওয়াজ, বক্তৃতা, বাজি পোড়ানো ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান। অবশ্য এলিসিয়ান নামে আদি মাঠটি আর নেই। সেখানে এখন ঘরবাড়ি, কারখানা তৈরি হয়েছে। ওই দিন হোবোকেনের বাসিন্দারা ঘোষণা করে ছেড়েছেন যে — নিউইয়র্কের কুপার্স টাউনকে বেসবলের জন্মভূমি বলে অপপ্রচার বন্ধ হোক এবং এ গৌরবের প্রকৃত অধিকারী হোবোকেনকে সেই স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এঁরা ভীষণ ক্ষুব্ধ যে আমেরিকার এই শহরটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছাড়াও জনসাধারণের দ্রষ্টব্য হিসেবেও বেসবলের জন্মভূমিকে কোনওভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়নি। পরিবর্তে নিউইয়র্কের কুপার্স টাউনকে নিয়ে মাতামাতি করা হয়েছে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি হয়ে গেল সেখানে 'ন্যাশনাল বেসবল হল অফ ফেম' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি অবশ্য কেউ বলছে না যে কুপার্স টাউন থেকে 'হল অফ ফেম'-এর বাড়ি সরিয়ে আনা

হোক। কিন্তু নিউজার্সির হোবোকেনের বাসিন্দাদের দাবি — কুপার্স টাউন সম্পর্কে মিথ্যা রটনার সংশোধন করা হোক। 'আদি বেসবল পল্লী'র গৌরব কেড়ে নিয়ে হোবোকেনকে সেই মুকুট পরানো হোক। এলিসিয়ান মাঠের প্রথম খেলাই চিহ্নিত হোক আমেরিকার প্রথম বেসবল খেলা হিসেবে। বরং কুপার্স টাউনকে 'নব বেসবল পল্লী' আখ্যা দেওয়া হোক। এই আদি আর নব নিয়ে মহা গণ্ডগোল। খেলার জগতের লোকেরা অনেকেই হোবোকেনের দাবি সমর্থন করেছেন বটে। কিন্তু বহু লোকই বলেছেন — হোবোকেনের বাসিন্দারা বড্ড বেশি আবদার ধরেছেন। ফলে তর্কাতর্কি বেড়েই চলেছে।

সে বছর নিউইয়র্কের রাজ্যপাল ছিলেন ম্যারিও কোমো। তিনি তো নিউজার্সির আন্দোলনে কর্ণপাতই করেননি। সময় বুঝে নিউইয়র্ক রাজ্যে গাড়ির নতুন লাইসেন্স প্লেট বের করে ছাড়লেন। নাম্বার প্লেটে সগৌরবে লেখা আছে — নিউইয়র্ক, বার্থ প্লেস অব বেসবল।

তুলনায় কুপার্স টাউনের জনতা বরং অনেক সহৃদয়। হোবোকেনের আবেদনের বিরুদ্ধে সেখানে কিন্তু কড়া রকম প্রতিবাদ ওঠেনি। 'হল অফ ফ্রেম'-এর কর্মকর্তারা বলেছেন — এটা হয়তো সত্যি, যে এ শহরের গৌরব কাহিনির মূলে প্রকৃত তথ্যের পাশাপাশি কিছু গল্পকথাও জড়িয়ে আছে। কিন্তু লেখক অ্যাবনার ডাবলডে'র 'কুপার্স টাউন স্টোরি' যদি খানিক কল্পনাপ্রসূতও হয়, তো ক্ষতি কী? স্যান্টাক্লজ আছে কি নেই, সে প্রশ্ন বড়। না অস্তিত্ব নিয়ে শিশুর বিশ্বাসের আনন্দ বড়?

এরা বেশ কায়দা করে কিছু তথ্যকে ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছে। এদের বক্তব্য ছিল — কুপার্স টাউনেই প্রথম বেসবল খেলা আবিষ্কৃত হয়েছিল কি না, এ প্রশ্ন অবাস্তব। আমেরিকায় এরকম অসংখ্য শহরে ১৮০০ সালের মাঝামাঝি থেকে নিয়মিত বেসবল খেলা শুরু হয়েছিল। কে তার হিসেব রেখেছে? কিন্তু কুপার্স টাউন হচ্ছে বেসবলের আসল বাড়ি।

খেলার ইতিহাসের পণ্ডিত টম হেইটস-এর বক্তব্য হল — যদি নিউজার্সির জনতা একটু ইতিহাস পড়ে আসত, ঠিক ঠিক খেলার বইগুলো ঘেঁটে দেখত, তাহলে জানত পারত হোবোকেনে কেন, গোটা নিউজার্সি রাজ্যেই কোথাও প্রথম বেসবল খেলা হয়নি। প্রমাণ স্বরূপ তিনি একতাড়া রেফারেন্স বই পড়ে দেখতে উপদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ বেসবল খেলার সূচনার পুরো কৃতিত্ব হোবোকেন শহরকে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। হোবোকেনের

বাসিন্দাদের মনোভাব নিয়ে অনেক ক্রীড়া সাংবাদিকও সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে হোবোকেনের লোকেদের এই ভেবেই খুশি হওয়া উচিত যে তাদের শহরে একদা ঐতিহাসিক খেলা হয়েছিল। তার বদলে এদের বিক্ষোভ আর অসন্তোষ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছে। সাধারণ মানুষ ভেবে নিতেই পারে যে, বেসবল খেলা নাকি রাতারাতি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং সেও ওই নিউজার্সির এলিসিয়ান ময়দানে। কিন্তু তা তো ঠিক কথা নয়। হোবোকেনে খেলা হলেও তার নিয়ম কানুন সবই তো বেঁধে দিয়েছিলেন নিউইয়র্কের 'নিকারবোকার' দলের ম্যানেজার অ্যালেকজান্ডার বার্টরাইট। পরে তাঁর শিক্ষাপ্রণালী বেসবলের 'নিউইয়র্ক রুলস' নামে পরিচিত হয়েছিল। বার্টরাইট নিজে তারও তিন চার বছর আগে থেকে এ ধরনের খেলা খেলছিলেন। তাঁরই উদ্ভাবনায় তৈরি হয়েছিল রেকট্যাঙ্গল মাপের 'বেস'। অর্থাৎ 'ডায়মণ্ড' মাপের নয়। বড় নিয়ম বদলের মধ্যে এসেছিল 'ফাউল টেরিটরি' সৃষ্টি করা।

আমেরিকার বেসবল খেলায় ক্রমশ নানা বিবর্তন এসেছে এবং এখনও আসছে। আমেরিকার মানুষ সেই ১৮০০ সালের গোড়া থেকেই বল, লাঠি আর বেস সাজিয়ে খেলতে শুরু করেছিল। সেই হিসবে ১৮৪৬-এ হোবোকেনের খেলাও কিছু সদ্য আবিষ্কৃত ঘটনা ছিল না। বরং আগের খেলাগুলি থেকে শেখা আর এক ধরনের ব্যাট বল খেলার সূচনা হয়েছিল। এই যে প্রতি ইনিংসে তিনটি 'আউট'-এর ব্যবস্থা, (যা কিনা বার্টরাইটের উদ্ভাবনা বলে ধরা হয়), সেও কিন্তু ১৮৩৮-এর কানাডর বেসবল গেমের নিয়মের মধ্যেও ছিল। তাছাড়া নিউজার্সির হোবোকেনের খেলার সময় কিছু অদ্ভুত নিয়মও ছিল, যা পরে বদলানো হয়েছে। তখন চারদিকে জঙ্গল। খেলার সময় বনে জঙ্গলে বল হারিয়ে যাবে, এই দুশ্চিন্তায় মাঠের বাইরে বল পাঠানোর নামেও খেলোয়াড়দের উৎসাহ কমে যেত। তখন খেলার ধারণা ছিল অনেকেটাই আলাদা।

ধরা যাক হোবোকেনের প্রথম কৃতিত্বের দাবি না হয় সবটুকুই যথার্থ নয়। কিন্তু হঠাৎ নিউইয়র্কের কুপার্স টাউনের দিকে বেসবলের ইতিহাস এতখানি গুরুত্ব পাচ্ছে কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে — যে কোনও আমেরিকান শহরের মতো এখানেও ছোট ছেলেরা নিয়মিত বল খেলত। কিন্তু ১৮১৬ থেকে এখানে রাস্তায় বল খেলা নিষিদ্ধ হওয়ায় পার্কে পার্কে খেলার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। 'হল অফ ফেম'-এর গৌরব এবং কুপার্স টাউনের স্বীকৃতি

প্রসঙ্গে জানা গেছে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'মিলস কমিশন রিপোর্ট'-ই ওই বিষয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। ন্যাশনাল লিগের প্রেসিডেন্ট এফ জি মিলস এবং খেলার সাজ-সরঞ্জাম বিক্রেতা অ্যালবার্ট স্পলডিং হঠাৎ একদিন এক ক্রীড়া সাংবাদিক হেনরি চ্যাডউইকের লেখা পড়ে অসম্ভব রেগে গেলেন। চ্যাডউইকের বক্তব্য ছিল — আমেরিকার বেসবল খেলার সৃষ্টি প্রসঙ্গে নাকি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের কোনও সত্যতা নেই। আসলে নাকি এ খেলা 'ব্রিটিশ রাইন্ডার্স' নামে ছোটদের একটি খেলারই বিকট সংস্করণ মাত্র।

ব্যস! এই 'আপত্তিকর' মন্তব্য পড়ে মিলস কমিশন একেবারে উঠে পড়ে লাগলেন। কমিশনের কাজ হল হেনরি চ্যাডউইকের বক্তব্যকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা। কুপার্স টাউনের বাসিন্দা ৬৮ বছরের এক বৃদ্ধের সাক্ষ্য ও জবানবন্দির ওপরে ভিত্তি করে এঁরা রিপোর্ট দিলেন — ১৮৩৯ সালে জেনারেল অ্যাবনার ডাবলডে ওই কুপার্স টাউনেই বেসবল খেলার প্রবর্তন করেন।

পরবর্তী কালে বেসবলের ইতিহাস ঘেঁটেও জানা গেছে যে মার্কিন মিলিটারি প্রধান ডাবলডে ১৮৩৯-এর গ্রীষ্মকালে ওই দায়িত্ব নিয়েই কুপার্স টাউনে গিয়েছিলেন এবং খেলার যাবতীয় বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁর লেখা বইও আছে এ বিষয়ে। নাম 'কুপার্স টাউন স্টোরি'।

যাইহোক, ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত মিলস রিপোর্টের ভিত্তিতেই কুপার্স টাউনে বেসবলের 'হল অফ ফেম'-এর সৌধ গড়ে উঠেছিল। আবার এত বছর বাদে তাই নিয়ে তর্ক বেঁধেছে।

নিউইয়র্ক আর নিউজার্সির মধ্যে বেস বল আবিষ্কারের মৌলিক অধিকার নিয়ে মান অভিমান চিরকালই চলছে। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হবার আগে নিউজার্সির হোবোকেনবাসীরা সদলবলে নিউইয়র্কে রাজ্যের কুপার্স টাউনে 'হল অফ ফেম'-এ গিয়ে একটি ছবি দেখে আনন্দ পেতে পারেন। সেখানে বেসবলের উৎস বিষয়ে যে বিরাট বিভাগ আছে, তার মধ্যে হোবোকেন এবং তার এলিসিয়ান মাঠের সেই ঐতিহাসিক খেলাটির ছবি বিশদ বিবরণসহ ঘর জুড়ে টাঙানো আছে। আমেরিকার প্রিয় খেলার ইতিহাসে নিউজার্সির ভূমিকা অবহেলিত হয়নি।

গানের বদলে গর্জন

সেদিন "চাইল্ড ওয়ার্ল্ডে" গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। শিশু সম্ভারের অভিনবত্ব বছর বছর আর কত দেখব? এ দোকানটায় অনেক দিন আসিনি। আজকাল ছোটদের উপহার টুপহার কিনতে হলে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেই সেরে নিই। আলাদা করে "চাইল্ড ওয়ার্ল্ড" কিংবা "টয়েজ আর আস"-এ আর আসা হয় না। কিন্তু মদনের সঙ্গে শপিং-এ বেরলে সাত ঘাট ঘুরতেই হবে। মদন হচ্ছে এক রাজস্থানি মহিলা। এ শহরে দীর্ঘদিন আছে। ওর সঙ্গেই আমাকে এক আমেরিকান মহিলার বাড়িতে যেতে হবে। তাঁর মেয়ের বাচ্চা হবে। "বেবি শাওয়ার" দিচ্ছেন। মার্কিনি প্রথায় সাধভক্ষণ। সাধের আসনে বসে চোখ ওলটানো মুড়ো চিবিয়ে ফাঁসির খাওয়া অবশ্য নয়। এদেশে "বেবি শাওয়ার" মানে ভাবী মায়ের খাওয়ার চেয়ে পাওয়ার পর্ব বেশি। কেক, কার্ড, মেটানিটির জামা কাপড়, এছাড়া অনাগতকে স্বাগত জানাতে রাজ্যের উপহার। আত্মীয়, বন্ধুরা বাড়িতে ডেকে শাওয়ার দেয়। অফিসে সহকর্মিণীরা চাঁদা তুলে লাঞ্চ আওয়ারে কেক্ এনে পার্টি করে। নতুন ক্রিব (বেবি কট্) দম দেওয়া দোলনা, প্যারাম্বুলেটর, বাচ্চা কোলে নেওয়ার ব্যাসিনেট, ক্যারেজ, কার-সিট, মায়ের হাসপাতালে পরার পোশাক, বাচ্চার বালিশ, কম্বল লেপ, বিছানা, তোয়ালে, জামাকাপড়, ফিডিং বটলের সেট, প্ল্যাস্টিকের চুষি, ডায়াপারের বাক্স, তেল, সাবান, খেলনাপতি — শিশুটি জন্মানোর আগেই এত কিছু এসে যায়। কেউ কেউ বেবি শাওয়ারে বাচ্চাদের দোকানের 'গিফ্ট সার্টিফিকেট" দেন। দু/এক বছর পরে কেনাকাটি করা যায়।

আমেরিকান বাড়িতে বাচ্চার জিনিস দিলেও চেনাশোনা বাঙালি

মেয়েদের বেবি শাওয়ারে আগে আমরা "মা"কেই উপহার দিতাম। পুরনো সংস্কার। যে জন্মায়নি, তার জন্যে আগে থেকে কেনাকাটি করে কাজ নেই। তবে এখন আর সেসব ভাবি না। যে দেশের যেমন ধারা। নতুন বাবা, মায়ের যাতে একটু সুবিধে হয়, সে জন্যেই বাচ্চাদের জিনিস কিনে দেওয়া। নয়তো শেষ মুহূর্তে এত বাজার করে কে? এমনও হয় বরফ ঝড়ের মধ্যে তিনদিনের বাচ্চা কোলে নিয়ে মা হাসপাতাল থেকে ফিরল। বাবা তখন ওই আবহাওয়ায় ফর্দ হাতে কোথায় কোথায় ঘুরবে? ফর্দ তো কম লম্বা নয়? বোতলও চাই কম্বলও চাই। এ দোকানে চুষি, ও দোকানে টুপি, সে দোকানে তোয়ালে — করতে করতে আধ বেলা কাবার করে ফেললে বাড়ির কাজ শিকেয় উঠবে। যদি সাহায্য করার তেমন কেউ থাকে, তবে বাবারও অফিস থাকবে। সুতরাং বাচ্চার জন্যে যা যা দরকার, আগে ভাগে জমিয়ে রাখা ভালো।

একটু মুশকিল হয় রং নিয়ে। বাচ্চার গায়ের রং নয়, তার বিষয় আশয়ের রং। এদেশে ছেলেদের জন্যে নীলের বাহার, মেয়েদের জন্যে গোলাপি। দু'রঙের আলাদা আলাদা জামাকাপড়, মোজা, টুপি, বালিশ, বিছানা তো পাওয়াই যায়। এর ওপর শিশু সামগ্রী ব্যবসায়ীরা আরও বুদ্ধি খাটিয়েছে। বাচ্চার ঘরের দেওয়ালের জন্যে ওয়াল পেপার থেকে শুরু করে জানলার পর্দা পর্যন্ত দুই রঙে মিলমিশ করে দিচ্ছে। থোড়া নীল, থোড়িসি গুলাবি। সাদা বেবি কটের মাথার দিকে গোলাপি বেড়াল শিবনেত্রে নীল বল দেখছে। কম্বলের গায়ের নীল প্রজাপতি, গোলাপি ফুল দু'দিনের বাচ্চার ঢোলগোবিন্দ জামায় নীল, গোলাপির চেককাটা। নয়তো হলুদ ছিটছিট সাদা, হলদে, লাল হল নিরপেক্ষ রং। দু'পক্ষেরই চলবে। বেবি শাওয়ারে আমি একটু রামধনু মার্কা জিনিসপত্র দিয়ে আসি। নীলকমল না গোলাপ সুন্দরী, কে আসছে জানি না তো। নেহাত ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ উর্ধ্বের মা যদি ডাক্তারের কথায় বিশেষ পরীক্ষা করান (ডাউন সিনড্রোমের আশংকায়) তবে রহস্য ভেদ হতে পারে। জানাজানি হয়ে গেলে অবশ্য রং বাছাই-এর চিন্তা নেই। ঢালাও নীলের বন্যা, নয়তো গোলাপির ছড়াছড়ি করে দেওয়া যায়।

যাইহোক, এবার চাইল্ড ওয়ার্ল্ডের কথায় আসি।

মাঝে তো অনেকদিন আসিনি। দোকানটা দেখলাম ঢেলে সাজিয়েছে। দোলনারই কত বৈচিত্র। ঝুড়ির মতো লম্বাটে দোলনা একভাবে নড়ে যাচ্ছে। যেন কেউ বাচ্চা কোলে নিয়ে পা নাচাচ্ছে। এর নাম 'ভাইব্রেটিং হ্যামক"।

"পাওয়ার সুইং" তো আগেও ছিল। এখন আবার তিন রকম স্পিড করেছে। "গ্লাইডার" আর এক ধরনের দোলনা। সবচেয়ে আধুনিক হল, "নেচারস্ ক্র্যাডল্।" এখানে শুলে শিশুরা মাতৃক্রোড়ে নয়, মাতৃগর্ভের পরিবেশে ফিরে যাবে। গদির মধ্যে কন্ট্রোল প্যানেল আর কী কী সব যন্ত্র বসিয়েছে। সাউন্ড মেশিন ম্যাট্রেসের এমন ক্ষমতা যে দোল দোল দুলুনির সঙ্গে ধুকধুক করে বুকের আওয়াজও শোনাবে। সদ্যোজাত এবং কাঁদুনে শিশুকে ঘুম পাড়ানোর মহৌষধ। অন্তত দোলনা কোম্পানি সেরকমই প্রচার করছে। প্যামফ্লেটে লিখেছে — অতি আশ্চর্য এই দোলনায় শুয়ে একশো কাঁদুনে বাচ্চার মধ্যে পঁয়ষট্টিজনই চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ইনফ্যান্ট অ্যাডভানটেজ ইনকরপোরেটেড-এর তৈরি "নেচারস্ ক্র্যাডল"-এর দাম দেখলাম তিনশো ষাট ডলার। দোলনার পক্ষে খুবই বেশি দাম।

নতুন কায়দার ব্যাসিনেটের দামও কিছু কম নয়। ছোট্ট ট্রের মধ্যে ঝুলন্ত বিছানার দাম একশো চল্লিশ ডলার। কী? না, ডিজাইনের জন্যে কোলের অনুভূতি হবে। এও ঘুম পাড়ানি বিছানা। চুষির দাম করেছে আট ডলার। কারণ চুষি থেকে ঘুমপাড়ানি গান বেজে উঠবে। শিশু প্রশান্ত চিত্তে ঘুমিয়ে পড়বে। চুষির ইংরেজি "প্যাসিফায়ার"। দামি চুষি বোধহয় "গভীর" প্রশান্তির ব্যবস্থা করবে। একেবারে টানা ঘুম।

কিন্তু ঘুমপাড়ানোর জন্যে এত যন্ত্রপাতি, বাজনা বাদ্যির দরকার হচ্ছে কেন? মায়ের গুন গুন গান আর মৃদু চাপড়েও কাজ হচ্ছে না? না কি মায়ের অত সময় নেই? সারাদিনের কাজের পর তাদের গান টান আর আসে না? সাধারণ চাকরিই হোক, কি প্রফেশন্যাল জব, মেটার্নিটি লিভ শেষ হলে পুরোদমে কাজের চাপ ফিরে আসে। বাবা, মা কেউই ঘুমের ব্যাঘাত চায় না। কাঁদুনে বাচ্চার জন্যে রাতে ঘুম ভেঙে বার বার ওঠা মানে, পরদিন অফিসে গিয়ে ঢুলে পড়া। এ অবস্থা রোজ রোজ বরদাস্ত হয় না। তার চেয়ে ঘুমপাড়ানি যন্ত্রপাতি কিনে যদি রেহাই পাওয়া যায়। এ জন্যেই ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলি নানা ধরনের বিছানা, বাজনা, চলন্ত খাট, ক্যাসেটে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ রেকর্ড করে বাজারে আনছে মায়ের গুনগুনের বদলে চুষিতে "টুইংকল টুইংকল" শুনতে শুনতে বাচ্চার কান্না থেমে যাবে।

এদেশে "ঘুম বিশারদ" ডাক্তারদের মধ্যে শিশুদের ঘুমের সমস্যা নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের পসার বেশ বেড়ে গেছে। কাঁদুনে বাচ্চার চিকিৎসার

জন্যে "ক্রাই-রিসার্চ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। আমেরিকায় গ্রাইপ-ওয়াটার দেওয়া বারণ। কান্নার কারণ খুঁজে চিকিৎসা করতে হয়। নয়তো "ঘুম-বিশারদ"-দের লেখা বই পড়েও অনেক নিদান পাওয়া যায়। রিচার্ড ফারবারের লেখা "সলভ ইওর চাইল্ডস স্লিপ প্রব্লেম" বইটির পঁচিশতম সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। বারো ডলার দামের ওই বই বছরে ৭৮ হাজার কপি মতো বিক্রি হচ্ছে। তার মানে বাচ্চার কান্না থামিয়ে চটপট ঘুমপাড়ানোর জন্যে মা, বাবা বইপত্র পড়েও সমাধান পেতে চেষ্টা করছেন।

এই সুযোগে বাজারে এসেছে দশ ডলারের "নাইট লাইট", যা বেবি কটে লাগিয়ে দিলে, মায়ের গর্ভে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমন শব্দ সৃষ্টি করে। 'মাম্মি বেয়ারস' নামে আর একটি যন্ত্র বেরিয়েছে, তারও ওই কাজ। গতবছর প্রচুর বিক্রি হয়েছে। ব্যাটারি দিয়ে চালানো "ক্র্যাডল রকার'-এর দাম পঞ্চাশ ডলার। এর কাজ লাগাতার দোলনা ঠেলে দেওয়া। ঘুমপাড়ানি যন্ত্রপাতির বিক্রি যে হঠাৎ এত বেড়ে যাচ্ছে, তার একটি কারণ — চাকরি করা মায়েদের রাত জাগার ক্লান্তি। আগে অধিকাংশ মা ছোট বাচ্চা নিয়ে বাড়িতে থাকতেন। দিনের বেলায় একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকত। এখনকার চাকুরে মায়েদের দিনেও বিশ্রাম নেই। সারাদিন অফিস করে, রাতেও যদি ঠিকমতো ঘুমতে না পারেন, শরীরের ক্লান্তি যায় না। সুতরাং, যে করেই হোক ঘুমের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় কারণ — বাবা, মায়ের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাচ্চা মানেই সে রাত বিরেতে কান্না জুড়বে আর বাবা, মাকে জাগিয়ে রাখবে — এমন পুরনো সমস্যাকে তাঁরা মেনে নিতে রাজি নন। বাড়িতে থাকা মা হলেই বা তাঁর রাতের ঘুম ছাড়তে হবে কেন? হাই টেকনোলজির দৌলতে এখন এত কিছু সম্ভব হচ্ছে, আর কাঁদুনে বাচ্চাকে নেড়ে ঘুম পাড়ানো যাবে না?

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আগেকার দিনে বাচ্চারা রাতভর কেঁদে যেত। রাতের কান্না থামানোর জন্যে মায়েরা কত রকম প্রক্রিয়া করে এসেছেন। তাই নিয়েও কত মতামত। চুষি ব্যবহার করা যাঁরা পছন্দ করেন না, তাঁরা বলেন বদ অভ্যেস। চুষির জন্যে বাচ্চার দাঁত উঁচু হবে। ঠোঁটের গড়ন খারাপ হয়ে যাবে। চুষির সপক্ষে চুক্তি — বাচ্চা নিজের মনে থাকবে। কাঁদলে চুষি দিলে থেমে যাবে। আপনিই ঘুমিয়ে পড়বে। না দিলে আঙুল চোষার অভ্যেস হতে পারে। চুষি ফেলে দিয়ে অভ্যেস এক সময় ছাড়ানো

যায়। আঙুল কোথায়, ফেলে দেবেন? এই যে ঘুমের আগে দোলানো, চাপড়ানো, কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়ানো — ভিক্টোরিয়ান যুগে এসবই ছিল বাচ্চাদের "বদ অভ্যেস করানো। একশো বছর আগের একটি শিশু পালন পদ্ধতির বইতে আছেন — দোলনায় দুলে দুলে ঘুমলে বাচ্চার ব্রেন লোব্‌গুলির ভারসাম্যের গোলমাল হয়ে যায়। তার ডায়াফ্রাম্-এর ক্ষতি হয়।

কিন্তু এখন এ সব বই আর কে পড়ছে? বাচ্চাদের কান্নার বহর নাকি একেক দেশে একেক রকম। যে দেশের বাচ্চারা যত মনোযোগ পায়, তারা তত বেশি রাত কাঁদুনে হয়। এ নিয়ে গবেষণাও হয়েছ। আমেরিকার বাচ্চারা যত কাঁদে, আফ্রিকার এক শিকারী উপজাতির বাচ্চারা তার অর্ধেক সময়ও কাঁদে না। তার একটি কারণও পাওয়া গেছে। আফ্রিকান বাচ্চারা ক্রমাগত খেয়ে যায়। জন্মানোর পর থেকে দুধ দিয়ে শুরু। তারপর আড়াই/তিন বছর বয়স পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা যাহা পায় তাহা খায়। কাঁদার সময় পায় না।

আমেরিকার প্রফেশন্যাল দম্পতিরা ঘুমের জন্যে অনেক খরচপত্র করে 'গ্যাজেট' কিনছেন। "বেবি প্যাটিং মেশিং" তার মধ্যে একটি। বাচ্চার খাটের পায়ের দিকে হাতের মতো একটি যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া যায়। সেই নকল হাতের পাতায় নরম দস্তানা পরানো। মায়ের করকমলের বিকল্প। তার কাজ হচ্ছে সমানে বাচ্চার পেছনে থাব্‌ড়ে যাওয়া। হোল্ নাইট চাপড় খেলে বাচ্চা পরমানন্দে ঘুমবে। "বেবি প্যাটিং মেশিন" নাকি খুবই বিক্রি হচ্ছে। বাচ্চাদের পেট মালিশ করারও মেশিন বেরিয়েছে। রাত দুপুরে পেট কামড়ানোর জন্যে কাজ দেবে। ঘোড়ার পেটে, পিঠে যেমন স্ট্র্যাপ পরানো থাকে, অনেকটা সেরকম দেখতে। কলিক্ ব্যথা চাগাড় দিলে ফিতের চাপে আরাম হবে। "রোবোটিক বেবি স্ট্রোলার" তো রীতিমতো ভুতুড়ে কায়দায় নবজাত শিশুর দুপুরের ঘুম পাড়ানোয় সাহায্য করবে। আগে থেকে গতি আর দূরত্ব ঠিক করে নিয়ে মেশিন চালু করতে হবে। তারপর ছোট্ট ঠেলাগাড়ি আপন মনে এগোবে আর পেছবে। এমন জায়গায় রাখতে হবে, যাতে খাট আলমারিতে ধাক্কা না লাগে। ঠিক ভাবে সেট করলে "শুধু যাওয়া আসা" চলতে থাকবে। বাচ্চার মনে হবে, কেউ তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

এক মহিলা নতুন যন্ত্র বাজারে এনেছেন, ঘুমপাড়ানি টেডি বেয়ার। ওই ভাল্লুক সমানে গার্গল-এর মতো আওয়াজ করে। মহিলা দাবি করছেন ওটাই

মায়ের পেটের ভেতরের আওয়াজ। ওই টেডি বেয়ার বাচ্চার ঘরে বসে গলা ছাড়লে সে মাতৃগর্ভের শব্দ শুনতে পায়। সত্যি সত্যি নাকি ডিজিট্যাল সাউন্ড রেকর্ডিং পদ্ধতিতে মায়ের পেটের ভেতরের ওই গরগরে আওয়াজ রেকর্ড করা হয়েছে। মহিলা বলছেন, মার পেটে মাইক হাতে ঢুকতে পারলে ওই শব্দই শোনানো যাবে। যাই হোক, যাঁরা কিনছেন, তাঁরা অবশ্য বলছেন, ভাল্লুক ঠিক গার্গল-এর শব্দ করে না। বরং ওয়াশিং মেশিন চলার মতো ঝরঝর গুম্‌গুম্‌ শাঁ—আ-আ ... ইত্যাদি ধারবাহিক আওয়াজ করে। মায়েদের তাতে আপত্তি নেই বাচ্চা যদি মনে করে, মা ধারে কাছেই আছে আর কাপড় কাচছে, তা হলেও তো কান্না থামাতে পারে।

কয়েক মাসের বাচ্চা এত কিছু বোঝে কি না সন্দেহ? তবে হট্টগোলের মাঝখানে যে বাচ্চারা ভালো ঘুময়, তাদের জন্যে কেউ কেউ হট্টগোলের ক্যাসেট কিনেছেন। ওই ক্যাসেটের আবিষ্কারক হলেন দুই মহিলা। তাঁরা দীর্ঘদিন 'গবেষণা" করে দেখেছেন ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের গর্জন আর হেয়ার ড্রয়ারের শাঁ — আ ... আ আওয়াজের মধ্যে বেশ একটা "মা, মা" ভাব আছে। মানে, মা বাড়িতে থাকলেই ওই দুটো শব্দ হতে পারে। এ মুহূর্তে মা বাড়ি পরিষ্কার করছেন। ও মুহূর্তে চুল শুকোচ্ছেন। কাঁদুনে বাচ্চার পক্ষে এমন 'নিরাপত্তা'র পরিবেশই তো ভালো। ক্রমাগত ওই শব্দ শুনতে শুনতে সে নিশ্চিন্তে ঘুমবে। এই উদ্ভাবনের ফলে স্যানফ্রাসিসকোর দুই মহিলা মিলে কম্‌প্যাক্ট ডিস্ক আর ক্যাসেট বার করেছেন। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের গর্জন আর ব্লো-ড্রায়ারের শব্দ রেকর্ড করে দিব্যি ব্যবসা চালিয়েছেন। এ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ হাজারের ওপর সি. ডি. আর ক্যাসেট বিক্রি হয়েছে।

এক কাঁদুনে বাচ্চার মা ওই খবর জেনে নিজেই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালিয়ে দেখেছেন এবং আশাতীত ফল পেয়েছেন। নতুন মা হওয়ার পরে কত উৎসাহ করে ঘুমপাড়ানি গানের সি. ডি. কিনে এনেছিলেন। কিন্তু বাচ্চার প্রাণে গান নেই। চিল চিৎকারে গানে ধামা চাপা পড়ে যাচ্ছে। তখন সমুদ্রের ঢেউ-এর শব্দের ক্যাসেট কেনা হল। তারপর পাহাড়ি নদীর ছলছল শব্দের সি. ডি. কিন্তু কে কার বাজনা শোনে? বাচ্চাটা প্রাকৃতিক ধ্বনির সমঝদারই নয়। কেঁদে কেঁদে বাড়ি মাথায় করে। শেষে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালিয়ে মা তাকে ঠাণ্ডা করেছেন। যান্ত্রিক শব্দে সে চটপট ঘুমিয়ে পড়ে। রাত দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত টাইমার ঘড়ির সঙ্গে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সুইচ সেট করা

থাকে মেশিন নিজে নিজে চালু হয়। নিজেই বন্ধ হয়। রাত দুটোর পর আর ব্যাক্ গ্রাউন্ড মিউজিকের দরকার হয় না। এক বোতল দুধ খেয়ে বাচ্চাটা বাদ্যবৃন্দ ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়ে। যত কান্নাকাটি ওই প্রথম রাতে।

কিন্তু এত গর্জনের ব্যবস্থা করেও মার আর নিজের ঘরে শোওয়া হয় না। বাচ্চার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভ্যাকুয়াম চালিয়ে রাখতে গিয়ে দুর্ঘটনার ভয় পান। তাই নিজেও সে ঘরে শোন। স্বামী তো কাণ্ড কারখানা দেখে ভীষণ বিরক্ত। ছোটদের অনেক রকম অভ্যেস আর নেশার কথা শুনেছেন। কিন্তু ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের নেশা জীবনে শোনেননি। পরীক্ষা করার জন্যে মাঝে মাঝে রাতে এসে মেশিন বন্ধ করে দেখেছেন। একটু পরেই বাচ্চাটা ঘাড় তুলে কান্না জুড়েছে। বেশ বোঝা গেছে, যান্ত্রিক সম্মার্জনীর গর্জনে, তার জব্বর নেশা ধরে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে জ্যানিটর বা জমাদার না হয়।

বাচ্চাদের ঘুমের জন্য নিত্য নতুন গ্যাজেট আবিষ্কার হচ্ছে বটে। কিন্তু শিশু চিকিৎসকরা অনেকেই বলছেন — এগুলো বাজে খরচ। কাঁদুনে বাচ্চা যদি অসুস্থ না হয়, তবে অন্যভাবে তাকে ঘুমের ট্রেনিং দেওয়া যায়। হয়তো দু'একটা যন্ত্র বেশ কাজ করে। কিন্তু বাকি সবই ব্যবসাদারদের চমক। বিশেষ করে মায়ের পেটের ভেতরের শব্দ টব্দ রেকর্ড করে কত দূর কী পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, বলা শক্ত। বস্টনের চিলড্রেনস্ হসপিটালের 'পিডিয়াট্রিক স্লিপ-ডিস্ অডার্স্' বিভাগের ডাঃ ফারবার এ সম্পর্কে বলেছেন — বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্যে দু/তিনটি জিনিসই যথেষ্ট। ঘরে মৃদু আলো জ্বলবে। অন্ধকারে শিশুরা ভয় পায়। বিছানায় তার প্রিয় খেলনা, চুষি, নয়তো ছোট্ট কম্বলও ঘুমের আবেশ আনতে সাহায্য করে। এগুলি হাতে নিয়ে সে এক ধরনের নিরপত্তা বোধ করে। যে শিশু ঘুমোনোর সময় বেশি বায়না করে, বা রাতে বারবার জেগে উঠে কাঁদে, তাকে প্রথমে পাঁচ মিনিট, পরে দশ মিনিট, এভাবে সময়ের ব্যবধান রেখে একা শুয়ে থাকার অভ্যেস করাতে হবে। মনোযোগ না পেলে ধীরে ধীরে তার কান্নার স্থায়িত্ব কমে যায়।

চিরকাল এভাবেই তো ঘুমপাড়ানো হয়েছে। এখন ভুতুড়ে দোলনা, চলন্ত ঠেলাগাড়ি, নাচন্ত বিছানা, পিঠ চাপড়ানোর নকল হাত, খেলনা ভাল্লুকের গলার কেরামতি — বাচ্চাদের ঘুমাপাড়ানোর জন্যে কত ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। শব্দ দূষণও যে ঘুমের পক্ষে ভারী উপকারী — ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের আবহসঙ্গীত থেকে সে খবরও জানা গেল।

সেদিন কিন্তু 'চাইল্ড ওয়ার্ল্ড"-এ ওসব কিছু কিনিনি। স্যান্ড্রার মেয়ের বাচ্চা হলে, সে কাঁদুনে হবে, কি না হবে, এত আগে বুঝব কী করে? তার ঘুমের চিন্তা তার বাবা, মা করবে। তার কান্নাকাটি তারা বাবা, মার আবহসঙ্গীত হবে। আমরা কেন যন্ত্রপাতি কিনতে যাব? দরকার হলে ওরাই দোদুল দোলা কিনবে। আমরা বরং লেপ, কম্বল কিনে দিই। দিগম্বরের জন্যে পীতাম্বর কিনে দিই। দিগম্বরীও পরবে। হলুদ নিউট্রাল কালার। মদন জিজ্ঞেস করল — 'চেক চেক না ফুলফুল?" বললাম — "চেক্/ফুল"। তারপর নীল চোখুপির মধ্যে হালকা গোলাপি ফুল আঁকা লেপ, কম্বল, বালিশ, চাদরের বস্তা কিনে নিলাম। যদি কাঁদুনে বাচ্চা না হয় এমন সস্তার ব্যবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়বে। একটু একটু স্বপ্ন দেখবে। হাসবে, কাঁদবে। ঘুমের জন্যে গানের বদলে গর্জনের দরকার হবে না।

প্রবাসে সচ্ছলতার সন্ধানে

ভাগ্যকে যদি জীবনের নিয়ন্ত্রক বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে বোধহয় দৈবের বশে মানুষ প্রবাসে আসে। অন্যদিকে, পুরুষকার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিত্তবৈভবের মোহ — যে যেমনভাবে দেশান্তরের ব্যাখ্যা দিতে চায়। মূল কথা হল ভিন্নতর জীবন যাপনের উদ্দেশ্য বা আশা নিয়ে একদেশের মানুষ অন্যদেশে বসবাস করতে যায়। সে উদ্দেশ্য সফল হল, কি বিফলে গেল, সে সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা আপেক্ষিক বিচারের কথা। তবে 'ব্রেন ড্রেন' নামে মেধাগত স্থানান্তরের ঘটনা যে ঘটেই চলেছে 'বিশ্বব্যাংকের' দেওয়া সাম্প্রতিক তথ্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এখন প্রধানত আফ্রিকা মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে শিক্ষিত ছেলেরা আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় জীবিকার সন্ধানে যাচ্ছে। যে সব দেশের জনসংখ্যা অন্তত পক্ষে পাঁচ মিলিয়নের বেশি, তাদের ওপর ভিত্তি করে একটি তালিকা তৈরি হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে — মোট দশটি দেশ থেকে সব থেকে বেশি সংখ্যক কলেজশিক্ষিত নাগরিকরা বিদেশে চলে এসেছে। হেইতি থেকে সে দেশের ৮৪% শিক্ষিত লোক, ঘানা থেকে ৪৭%, মোজ্যাম্বিক থেকে ৪৫%, কেনিয়া থেকে ৩৮%, লাওস্ থেকে ৩৭%, ইউগ্যান্ডা থেকে ৩৬%, অ্যাঙ্গোলা থেকে ৩৩%, সোমালিয়া থেকে ৩৩%, এল সালভাদোর থেকে ৩১% এবং শ্রীলঙ্কার ৩০% কলেজশিক্ষিত লোক বিদেশে চলে এসেছে।

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের মতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকদের ব্যাপক হারে বিদেশ যাত্রার ফলে ওই গরিব দেশগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনা ও কার্যসূচির

রূপায়ণে সমস্যা দেখা দেবে। একটি দেশ থেকে কলেজশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পঞ্চাশ শতাংশ বিদেশে চলে এসেছে। জ্যামাইকা আর হেইতি থেকে চলে এসেছে ওই দুই দেশের আশি শতাংশেরও বেশি শিক্ষিত মানুষ।

এর ঠিক বিপরীত ছবি পাওয়া যাচ্ছে এশিয়ার দ্রুত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে। ভারত, চীন বা ইন্দোনেশিয়ার যত শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী আছে, তার মাত্র পাঁচ শতাংশ বিদেশে বসবাস করছে। বিদেশ বলতে এক্ষেত্রে পৃথিবীর ধনী দেশগুলির যৌথ সংগঠন "অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট" —এর তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে বোঝাচ্ছে। ভারত, চীন বা ইন্দোনেশিয়ার মতো ব্রাজিলেরও শিক্ষিত কর্মীদের মাত্র পাঁচ শতাংশ বিদেশে আছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিচারে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 'ব্রেন ড্রেন'-এর হার ক্রমশ কমে গেছে।

নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশ্বের দরিদ্র এবং ছোট ছোট দেশগুলি তাদের শিক্ষিত নাগরিকদের হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ভারত বা চীনের মতো রাষ্ট্রে শিক্ষিত ও প্রযুক্তিসম্পন্ন কর্মীর সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, পাঁচ শতাংশ বিদেশে থাকলেও কিছু এসে যাচ্ছে না। প্রথমত, আমেরিকার আউট সোর্সিং-এর সূত্রে সেখানে চাকরির বাজার খুলে গেছে। শিক্ষিত লোক আশাতীত উপার্জন করছে। দ্বিতীয়ত, একই কারণে ইনফর্মেশন টেকনোলজির সূত্রে আমেরিকায় অস্থায়ী ভিসা নিয়ে আসা বহু কর্মী এশিয়ায় ফিরে গেছে। এরই মধ্যে কিছু সংখ্যক অনাবাসী আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে। ইনফর্মেশন টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ ও গবেষণার খাতে মেধা ও অর্থ বিনিয়োগ ঘটছে।

গরিব দেশগুলির মেধা স্থানান্তরের একমাত্র সুফল হল — সে দেশের নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে বিদেশি মুদ্রার দৌলতে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আসছে। যেমন গুয়াতেমালা, মেক্সিকো বা ফিলিপিনে থাকা বহু পরিবার সম্পূর্ণভাবে ওই বিদেশি মুদ্রার ওপর নির্ভর করেই সংসার চালায়। ক্রমশ এর পরিমাণ এতে বেড়ে চলেছে যে, দেশে মোটারকম ফরেন এক্সচেঞ্জ আসছে। কিন্তু শুধু বিদেশি মুদ্রা এলেই তো হয় না। এর আবার কিছু ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে। গুয়াতেমালায় উচ্চশিক্ষার উৎসাহ বাড়ছে। সেখানে কোনও পরিবারে যখন বিদেশ থেকে পাঠানো ডলার পৌঁছায়, ছেলে-মেয়েদের

পড়াশোনার জন্যেই তার প্রধান অংশ খরচ করা হয়। বিদেশে থাকা বাবা-মা অথবা বড় দাদা, দিদি, তাদের কষ্টের উপার্জনের ডলার পাঠিয়ে পরিবারের ছেলে মেয়েদের কলেজে পড়াতে চায়। কিন্তু মেক্সিকোয় অনেক পরিবারই পড়াশোনা নিয়ে মাথা ঘামায় না। দেখা গেছে, যে সব বাড়িতে বিদেশি মুদ্রা আসে, সে সব বাড়িতেই শিক্ষাদীক্ষার পাট কমে গেছে। কারণ, মেক্সিক্যান বাবা আমেরিকায় চলে এসেছে মানে সময় হলে ছেলে মেয়েরা ও সীমান্ত পার হয়ে আসতে পারবে। আর একবার আমেরিকায় এসে পৌঁছানো মানে মাঠে-ঘাটে কাজ করেই কত রোজগার করতে পারবে। ওসব চাকরি তো অশিক্ষিত মেক্সিক্যান ইমগ্র্যান্টদের জন্যেই পড়ে থাকে। এতই যখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, কে আর শুধু শুধু লেখাপড়া শিখতে কলেজে যাবে? কুলি, মজুরের কাজের জন্যে হাইস্কুল পাশ করারও দরকার হয় না। সুতরাং 'বাজে খরচ' না করে খাওয়া দাওয়া, সাজগোজের পেছনেই বাড়তি ডলার উড়িয়ে দেয় ওই সব মেক্সিক্যান পরিবার। অথচ যাদের বাড়ির লোকেরা বিদেশে রোজগার করতে আসেনি, এমন গরিব পরিবারেও কলেজে পড়ার রেওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে।

'ব্রেন ড্রেন' বিষয়ে 'বিশ্বব্যাংক' যে তথ্য দিয়েছে তার সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে — যে সব ছেলে-মেয়ের খুব ছোট বয়সে ইমিগ্রেশন পেয়ে বিদেশে চলে এসেছে, কিংবা বিদেশে কলেজে পড়েছে, তাদের মোটেই ওই শতাংশের মধ্যে ধরা চলে না। তাদের পড়াশোনা বা মেধার বিকাশ বিদেশেই হয়েছে। যেমন আমেরিকায় বসবাসকারী জ্যামাইকানদের প্রতি দশজনের মধ্যে চারজনই কুড়ি বছর বয়সের আগে দেশ ছেড়ে এসেছে। সুতরাং বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ওই যে ৮০ শতাংশ শিক্ষিত জ্যামাইকান স্বদেশ ছেড়েছে বলা হয়েছে, তা ঠিক নয়, এর অধিকাংশই বিদেশে এসে হাইস্কুল বা কলেজে পাশ করে।

বিশ্বব্যাংক-এর এই তথ্যসংক্রান্ত গবেষকরাও একথা স্বীকার করেছেন যে বহু দেশ থেকেই ঠিকমতো হিসেব নেওয়া যায়নি।

অভিবাসী ছেলেমেয়েরা কোথায় পড়াশোনা করেছে, ব্রেন ড্রেন শব্দ দুটি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত — এসবই তাঁরা ভবিষ্যতের গবেষণায় খতিয়ে দেখবেন। গরিব দেশগুলি যে মেধা স্থানান্তরের ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে বিষয়ে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা সহমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য — শিক্ষিত লোকেরা বিদেশে চলে যাচ্ছে মানে, সেই দেশগুলির

গভীর অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিই তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। কিন্তু ফলাফল যা দাঁড়াবে, তা খুবই উদ্বেগজনক। মেধাবী, শিক্ষিত লোকেরা ব্যাপক হারে দেশ থেকে চলে গেলে, শিক্ষাব্যবস্থা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা দেখা দেবে। শিক্ষক, অধ্যাপক এবং চিকিৎসকের অভাবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং গণস্বাস্থ্য বিপন্ন হবে।

নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জগদীশ ভগবতী ছয়ের দশকের শেষাশেষি এদেশে অভিবাসন নিয়ে এসেছিলেন। ব্রেন ড্রেন প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা — এ হচ্ছে দেশত্যাগের মুহূর্তে একটি প্রতিবাদ। কোনও দেশের প্রশাসন যখন অযোগ্যতার পরিচয় দেয়, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির পথ বন্ধ করে রাখে, তখন লোকে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারকে একটু নাড়া দিতে চায়। কারণ, দেশে থেকে গেলে তো কোনওভাবেই কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই দেশ ছেড়েই প্রতিবাদ জানিয়ে যাওয়া হল।

কিন্তু একদল পণ্ডিত এবং শিক্ষাবিদ মনে করছেন — এভাবে গরিব রাষ্ট্রগুলি থেকে ব্রেন ড্রেন হতে থাকলে ক্রমশ তাদের উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে। শিক্ষিত এবং সুদক্ষ কর্মীর অভাবে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে। দুর্নীতি, শিক্ষা এবং আর্থিক সংকট এবং অযোগ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে মোকাবিলার প্রয়োজনে কারা এগিয়ে আসবে?

এ বিষয়ে দেবেশ কাপুর এবং জন ম্যাকহেল নামে দুই অধ্যাপক একটি বই লিখেছেন। বই-এর নাম 'গিভ আস ইয়োর বেস্ট অ্যান্ড ব্রাইটেস্ট'। এঁরা বলছেন — যাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়বেন, তাকে চালু রাখবেন, যাঁরা চিকিৎসা করবেন এবং হাসপাতাল পরিচালনা করবেন, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একেকটি বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান হবেন, যাঁরা রাজনৈতিক সংস্কারক হয়ে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তক হবেন — তাঁদের ছাড়া এবং অন্যান্য পেশার প্রয়োজনেও শিক্ষিত নাগরিক ছাড়া একটি রাষ্ট্র তো অচল হয়ে যাবে। শুধু এই নয় যে, প্রফেশনাল লোকেরই অভাব ঘটবে। তার সঙ্গে আরও বড় ক্ষতি হবে সামাজিক ক্ষেত্রে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে একটি দেশের যে বিরাট জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, তারও সংখ্যা কমে যাবে। দেবেশ কাপুরের ওই বইটি গত বছর অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানকার একটি গবেষক সংস্থা 'সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট' বইটির প্রকাশক। দেবেশ কাপুর ইউনিভার্সিটি অফ টেকসাসের অস্টিন শহরের ক্যাম্পাসে অধ্যাপনা করেন।

কথা হচ্ছে, এ সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে। তাহলে কি ধনী দেশগুলি অভিবাসন নীতির পরিবর্তন ঘটাবে? গরিব দেশের শিক্ষিত লোকেদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে আরও কড়াকড়ি করবে? আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া — প্রত্যেক দেশের অভিভাসন নীতির প্রধান শর্ত হচ্ছে শূন্যস্থান পূর্ণ করো। একদিকে মেধাবী, বিদ্বান প্রফেশনালদের নিয়ে এসে তাদের গবেষণা ও পেশার ক্ষেত্রে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। পরিবর্তে দেশের মেধা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের চাহিদা মেটানো।

এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালে দু'পক্ষই যে সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেই বিবেচনা থেকে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে না। অর্থনীতিবিদরা নানারকম পরামর্শ দিচ্ছেন। সাতের দশকে অধ্যাপক জগদীশ ভগবতী প্রাসঙ্গিক একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। বলেছিলেন, অভিবাসীরা যে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে, অর্থাৎ তাদের স্বদেশের সরকার তাদের কাছ থেকে নিয়মিত ট্যাক্স দাবি করতে পারে। তাদের স্কুল-কলেজের খরচ বাবদ সরকার যা দিয়েছিল, সেই হিসেবেই কিছু ফেরত চাইতে পারে।

বিশ্বব্যাংক-এর অর্থনীতি বিষয়ক জার্নালের সম্পাদকরা মনে করেন — বিদেশে নয়, স্বদেশেই ব্রেন ড্রেন প্রতিরোধ করা দরকার। সেখানে প্রফেশনাল লোকেদের উপযুক্ত উপার্জন হওয়া উচিত। সরকারের উচিত তাদের ভালো মাইনের ব্যবস্থা করা। কাজের পরিবেশ এবং পারিশ্রমিক মনমতো হলে, অনেক শিক্ষিত লোকই বিদেশে আসতে চাইবে না।

কানাডার অন্ট্যারিওতে কুইন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হলেন জন ম্যাকহেল। সেখানে বিজনেস কলেজে পড়ান। তিনি 'গিভ আস ইয়োর বেস্ট অ্যান্ড ব্রাইটেস্ট' বইটির সহ-লেখক। কয়েকজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের মতো জনও মনে করেন গরিব দেশগুলির ওই সমস্যা দূর করতে অবশ্যই সরকারি হস্তক্ষেপ দরকার। ধনী দেশগুলির উচিত বিদেশের শিক্ষিত কর্মীদের অস্থায়ী ভিসা দেওয়া। নির্দিষ্ট কয়েক বছরের মেয়াদ শেষ হলে বিদেশের উচ্চশিক্ষা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং স্বদেশের তুলনায় মোটারকম আর্থিক সঞ্চয় নিয়ে সে দেশে ফিরে যেতে পারবে।

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের এই সব উচিত/অনুচিত নির্দেশের ওপরে গরিব/বড়লোক কোনও দেশেরই সরকারি নিয়মনীতি গড়ে ওঠে না। কী সংসারে, কী বৃহত্তর জগতে — অভাব, প্রয়োজন, চাহিদার জোগান দিতে

সরবরাহ বন্ধ হলে চলে না। আমদানি/রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাজারে মেধা'র মতো কমোডিটি বা প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা আর সরবরাহ দুইই সমান থাকবে। একপক্ষ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশা-ভরসা দিয়ে ডাকবে। অন্যপক্ষ আপনি বাঁচলে বাপের নাম বলে আকাশপাড়ি দেবে। তাত্ত্বিকরা যতই বলুন, একা একা দেশোদ্ধার হয় নাকি? তার চেয়ে যুগ যুগ ধরে ফরেন এক্সচেঞ্জ পাঠালে পারিবারিক ঋণ শতগুণে শোধ হয়ে যাবে। মাতৃঋণ অপরিশোধ্য বলে, দেশমাতৃকার ক্ষেত্রেও 'ট্যাক্স' ফিরিয়ে দেওয়া বোধহয় উচিত কাজ হবে না।

খোকার চোখে ঘুম নেই

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসিদের কেন যে খাতির করে ডাকা হত, রাতজাগা মায়েরা তা বিলক্ষণ জানে। আগেকার কালে না হয় নিশিরাতে হিসি করে বাচ্চারা কাঁদত। তখৰ তো ডায়াপার আর প্ল্যাস্টিকের প্যান্টির সুবিধা ছিল না। কাঁথা ভিজলেই সাইরেন। সে সব পাল্টে দিলে বাচ্চা আবার ঘুমিয়ে পড়ত। এ যুগে সে সমস্যা নেই। কিন্তু রাতজাগা কাঁদুনে বাচ্চার দল আগের মতোই নানা কারণে কিংবা অকারণে প্রহরে প্রহরে গলা ছাড়ছে। সব দেশেই তাদের কচি কণ্ঠের সমান জোর।

আমেরিকায় নতুন মায়েরা লাগাতার নিশি জাগরণের ধকল সইতে না পেরে শিশু ঘুম বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছে। তাঁদের পরামর্শ নিয়ে বাচ্চাকে ঘুমের ট্রেনিং দিচ্ছে। বাটাভরা পানের বদলে মোটা কনসালটেন্সি ফি দিয়ে খোকা খুকুর চোখে ঘুম আনার চেষ্টা চলছে।

সাধারণত দেখা যায় যাদের 'কলিকি বেবি' বলে, তারা রাতে বারবার কেঁদে ওঠে। মায়ের দুধ বা বোতলের দুধ থেকে পেটে বায়ু হয়ে কষ্ট পায়। আচমকা সেই গ্যাসের ব্যথা শুরু হলে ঘুম ভেঙে কাঁদতে থাকে। কাঁদুনে বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রথমেই এ ব্যাপারটা অনুমান করা হয়। অনেকে আবার সন্ধে লাগতে কান্না জুড়ে দেয়। তো, এরকমই এক কাঁদুনে মেয়েকে নিয়ে তার মা রাত জেগে জেগে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুরা যে যা পরামর্শ দিচ্ছিল, সেই মতো সে মেয়েকে নানাভাবে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল। কেউ বলেছিল, চিৎ করে শোয়ালে পেটের গ্যাস বেরোয় না। বাচ্চাকে উপুড় করে শোয়াও। কিন্তু এখন ডাক্তাররা উপুড় করে শোয়াতে বারণ করেন। কারণ,

'ক্রিব ডেথ' (ঘুমন্ত অবস্থায় বাচ্চার মৃত্যু)-এর আশঙ্কা থাকে। অথচ দশ/পনেরো বছর আগেও এদেশে সদ্যোজাত শিশুকে তার নিজস্ব খাট বা ক্রিবে বালিশ ছাড়া উপুড় করে শোয়ানো নিয়ম ছিল। কারণ পেটে চাপ পড়লে বায়ু হবে না। হজম ঠিক হলে কলিক্ ব্যথা উঠবে না। চিৎ করে শোয়ালে বাচ্চা যদি ঘুমের মধ্যে দুধ তোলে বা বমি করে, তা নাকে-মুখে আটকে যেতে পারে। উপুড় করে শোয়ালে সে ভয় কম। মোটকথা নানা যুক্তি দেখিয়ে এটাই বোঝানো হত। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ঘুমন্ত শিশুর মৃত্যুর ঘটনা শোনা যেত। সুস্থ বাচ্চা কেন হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মারা গেল, তার জন্যে অটপসি করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল কোনও কারণে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এরকম মৃত্যু ঘটেছে। হয়তো নাক মুখ গুঁজে শোয়ার ফল। মাথা একপাশে কাত করে দিলেও, ঘুমের ঘোরে দু/তিন মাসের শিশুর মাথা, মুখ সরে যেতেই পারে। যাই হোক, ডাক্তাররা রায় দিলেন, উপুড় করে শোয়ানো চলবে না। মাথা সামান্য উঁচু করে চিৎ করে শোয়াতে হবে। সবচেয়ে নিরাপদ, পাশ ফিরিয়ে রাখা আর মাঝে মাঝে ঘুমন্ত শিশুর ঘরে গিয়ে তার মুখে, মাথায় কম্বল জড়িয়ে গেছে কি না দেখে আসা। যে কোনও কারণেই হোক, গত দশ বছরে 'সাড্ন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম' (সংক্ষেপে 'সিড')-এ শিশু মৃত্যুর ঘটনা আশ্চর্যভাবে কমে গেছে। প্রথম থেকেই এরকম মৃত্যুর হার কম ছিল। তাও সুস্থ সবল বাচ্চা হঠাৎ কেন ঘুমের মধ্যে মারা গেল এ সম্পর্কে গবেষণা চলাকালীন শিশুর শোয়ার ভঙ্গি নিয়েই সন্দেহ জেগেছিল।

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। ওই কাঁদুনে মেয়েকে শান্ত করার জন্যে তার মা নানাভাবে চেষ্টা করছিল। ঘুমের আগে ক্যাসেটে গানের সুর বাজিয়ে, মেয়েকে ভালো লোশন মালিশ করে, কোলে নিয়ে দুলিতে দুলিতে কতভাবে ঘুম পাড়ানো গেল। কিন্তু খানিক পরেই চিল চিৎকার। তিন মাসের মেয়ে যদি সারারাত ঘন্টায় ঘন্টায় জেগে উঠে হল্লা করে, মা-বাবার তো ঘুমের বারোটা। মা না হয়, সারাদিনে একটু বিশ্রামের সময় পায়, বাবা প্রায় ঢুলতে ঢুলতে অফিস যায়। অফিস মানে অপারেশন থিয়েটার। বাবা হচ্ছে হার্ট সার্জন। বাইপাস সার্জারি করতে গিয়ে ডাক্তার যদি ক্রমাগত হাই তোলে, রুগির বিপদটা চিন্তা করুন।

নিরুপায় হয়ে মা তখন বাড়িতে একজন মাসাজ থেরাপিস্টকে ডাকল। সে মহিলা নানা কায়দায় বেবি অয়েল দিয়ে দলাই মালাই করেন। তারপর ঈষৎ

উষ্ণ জলে থাবড়ে থাবড়ে বাচ্চাটাকে চান করিয়ে দেন। সে পর্যন্ত বাচ্চাটা ট্যাঁ ফোঁ করে না। তারিয়ে তারিয়ে শিশুসেবা উপভোগ করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এত কাণ্ডের পরেও রাত জাগার কামাই নেই।

এবার মা চলল শিশুঘুম বিশেষজ্ঞের কাছে। সেই 'স্লিপ কনসালটেন্টে'র নাম জিল স্পিভ্যাক। তিনি সব শুনে একটা রুটিন তৈরি করে দিলেন। দু/চারদিন সেই মতো চেষ্টা করতেই কাজ হল। তবে ঘুমপাড়ানি মাসির দক্ষিণা কিছু কম নয়। জিল স্পিভ্যাকের শিশুঘুম কোম্পানির নাম 'চাইল্ড স্লিপ'। প্রথমবারের কনসালটেনশন ফী হচ্ছে ২৯৫ ডলার। ওই বাটার জুতোর দামের মতো। শুনতে একরকম, দিতে আরও বেশি।

ঘুম নিয়ে এরকম ব্যবসা আমেরিকার নানা শহরেই চলছে। ক্লান্ত মা, বাবারা মরিয়া হয়ে মোটা ফি দিয়ে তাদের উপদেশ কিনছে। মেডিকেল ইনসিওরেন্স থেকে এর খরচ দেয় না। না দেয় না দিক, একটু ঘুমিয়ে তো বাঁচা যাবে। কত রাত জেগে নিদ আঁখিপাতে গাওয়া যায়?

কিন্তু কীভাবে বাচ্চাগুলোর স্বভাব বদলায়? সত্যি সত্যি কাজ হচ্ছে বলেই তো মনে হয়। ঘুম বিশেষজ্ঞরা 'কেস' বুঝে বুঝে দাওয়াই বাতলান। নাঃ কোনও ওষুধের ব্যাপার নয়। কতকগুলো নিয়ম মানতে হবে। যেমন প্রধান নিয়ম হচ্ছে শিশুদের নিজে নিজে ঘুমিয়ে পড়া শিখতে হবে। কারণ, এ তাদের সহজাত ক্ষমতা। অভ্যেস করালেই কাজ হবে। রাতে যখনই কাঁদবে, তাদের নিয়ে পায়চারি করা, দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়ানো, কোলে নিয়ে বসে থাকা, বারবার মায়ের দুধ বা বোতল দেওয়া — এরকম বদ অভ্যেস করালেই মুশকিল। প্রথম থেকে কয়েকটা নিয়ম করতে হবে। সন্ধেবেলা তেল মালিশ করলে বাচ্চার শরীর মন স্নিগ্ধ হয়। অলিভ অয়েল ছাড়া অন্য কোনও বেবি অয়েল না মাখানোই ভালো। কারণ মিনারেল অয়েল থেকে চামড়ায় অ্যালার্জি হতে পারে। আর তেল যদি একান্তই সহ্য না হয়, তবে স্নানের পরে বেবি লোশন দিয়ে একটু মালিশ করা যায়। এদেশে দিনের বেলা নয়, রাতে ঘুমোনোর আগে বাচ্চাদের স্নান করানো হয়।

এরপর ঘুমপাড়ানি গান। বাচ্চার ঘরে মৃদু আলো জ্বলবে। মা রকিং চেয়ারে বসে বাচ্চাকে বুকে নিয়ে গুন গুন করে গান গাইবে। আধঘণ্টা বাদে সে ঘুমোক, না ঘুমোক, আলতো করে তার ছোট্ট বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে। প্রতি রাতে ঠিক একই সময়ে এসব করতে হবে। বাচ্চা যদি কান্নাকাটি করে, তাকে

কিছুক্ষণ কাঁদতে দিলে ক্ষতি নেই। কয়েকদিনের মধ্যে দেখা যাবে সে কান্নার সময়টা নিজেই কমিয়ে আনছে। এবং সপ্তাহখানেক বাদে ওই একই রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে নিজে নিজে ঘুমিয়ে পড়ছে. মাঝরাতে জেগে উঠলেও ওই একটুখানি গান গাওয়া আর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া, ক্রমশ সে নিজে নিজে শুয়ে থাকা আর খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়তে শিখবে।

কথা হচ্ছে, বাচ্চারা কি শুধু শুধু কাঁদে? এমনও হতে পারে, তার হয়তো কোনও শারীরিক কষ্ট থাকে, যার ফলে একটানা ঘুমোতে পারে না। শিশুরোগের চিকিৎসকরা বলেন, কাঁদুনে আর রাত জাগা বাচ্চার ঘুমের সমস্যা কেন, সেটা আগে দেখা দরকার। একটি বড় উপসর্গ হচ্ছে 'স্লিপ অ্যাপনিয়া'। টনসিল, অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড অনেক কিছু থেকেই বাচ্চারা ঘুমের মধ্যে নাক দিয়ে ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারে না। ফলে হঠাৎ হঠাৎ শ্বাস আটকে গিয়ে জেগে ওঠে। এই সমস্যাটি তাকে একটানা ঘুমোতে দেয় না। ইদানীং শিশুদের এই উপসর্গ নিয়ে নানা গবেষণা চলছে। এছাড়া পেটে কলিক ব্যথা, অ্যাসিডিটি বা অ্যাসিড রিফ্লাক্স-এর অস্বস্তি (বাচ্চাদেরও অম্বল হয়) এগুলোও ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণ হতে পারে। অতএব আগে তার শারীরিক কষ্টগুলো দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা, আলো, শব্দ, বিভিন্ন কারণে বাচ্চাদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে।

কাঁদুনে আর রাতজাগা বাচ্চাদের সমস্যা বোঝবার জন্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নানা গবেষণা শুরু হয়েছে। একে বিশেষ উপসর্গ বলেই ধরা হচ্ছে। কারণ পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে শিশুর শরীর ও মনের বাড়-বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। আর এক সমস্যা হচ্ছে মা, বাবার ঘুমের বারোটা বেজে যাওয়ার ফলে, তারা ক্লান্ত হয়ে অফিসে যাচ্ছে। কাজকর্ম করতে কষ্ট হচ্ছে। বাড়িতে থাকলেও ইচ্ছেমতো ঘুমোনো যায় না। আসলে এ যুগে পড়াশোনা শেষ করে, চাকরি-বাকরিতে একটু গুছিয়ে নিয়ে ছেলে মেয়েরা একটু দেরিতেই বিয়ে করছে। সন্তান জন্মাচ্ছে তারও কিছু পরে। ফলে মধ্য-ত্রিশের বাবা, মায়ের পক্ষে লাগাতার মাসের পর মাস ঘুমের ব্যাঘাত সহ্য করা আরও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

একথা ঠিক যে, বাচ্চাকে অন্তত ছ'মাস বয়সের পর থেকে তার নিজের খাটে শুইয়ে রেখে ঘুমোনোর অভ্যেস করানো যায়। প্রথম দু/চারদিন কান্না জুড়বে। তারপর কেউ আর কোলে নিচ্ছে না বুঝে আপনিই ঘুমোতে শিখবে।

এদেশে বহুকাল ধরে অন্তত ৯০% শিশু এ ভাবেই, হয় মুখে চুষি নিয়ে কিংবা তুলোর নরম কুকুর বেড়াল হাতে নিয়ে একা ঘরে নিজেই ঘুমোয়। ওভারনাইট ডায়াপার পরানোর জন্যে শরীর ভিজে যায় না। অর্থাৎ সোয়াস্তির সব রকম ব্যবস্থা করে বাচ্চাকে শুইয়ে দিলে সাধারণত সপ্তাহখানেক চেষ্টাতেই সে নিজে ঘুমোতে শেখে।

শিশুঘুম বিশেষজ্ঞদের মতে, সেরকম কোনও শারীরিক উপসর্গ না থাকলে, এ ভাবেই ঘুম পাড়ানো উচিত। তাতে কাজ না হলে আরও প্রক্রিয়া আছে। ফিলাডিলফিয়ার চিলড্রেন্স হসপিটালে স্লিপ ডিস অর্ডার সেন্টার আছে। বাচ্চাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। স্লিপ কনসালটেন্টরা বাচ্চার হালচাল বুঝে মা, বাবাকে নানা পরামর্শ দেন। হালচাল বলতে তারা জানতে চান বাড়ির পরিবেশ এবং পরিস্থিতি কেমন। বাচ্চা ঠিক কতক্ষণ ঘুমোয় এবং কোন সময় জেগে থাকে। তার বাড়বৃদ্ধি কেমন হচ্ছে তা দেখাও খুবই জরুরি। এই সব বুঝে শুনে তাঁরা বাচ্চার জন্যে একটা রুটিন লিখে দেন। একটা নিয়ম হচ্ছে, রাতে ঠিক ঘড়ি ধরে একই সময়ে শোওয়াতে হবে। দিনে কতবার দুধ, সিরিয়াল ও অন্যান্য সলিড খাবার খাবে এবং কতক্ষণ শোওয়াতে হবে — একরম কিছু নিয়ম তাঁরা মেনে চলতে বলেন। যেমন — ওই যে জিল স্পিভ্যাকের কথা লিখেছি, উনি সেই কাঁদুনে মেয়ের মাকে রুটিন লিখে দিয়েছিলেন। বিকেল পাঁচটার পরে বাচ্চাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। তারপর খাইয়ে, চান করিয়ে সন্ধে সাতটা নাগাদ তাকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে। তারপর মাঝে মধ্যে ঘরে ঢুকে একবার দেখে আসা ছাড়া তাকে একা রাখতে হবে।

ঘুমের আগে কোনও মৃদু বাজনা বা একটানা শব্দ বাচ্চাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করতে সাহায্য করে। ফ্যানের আওয়াজ, এয়ার কন্ডিশনের শব্দ, শীতকালে ঘরের মধ্যে হিউমিডিফায়ার চালানোর ফলে বাষ্প ওঠার যে মৃদু শব্দ শোনা যায় — এ সবই শিশুদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকে বিশ্রাম দিতে পারে। ঘুমপাড়ানি গান আর মৃদু চাপড়ের মতোই ঘুম পাড়াতে সাহায্য করে।

ঘুম বিশেষজ্ঞ মাসি পিসিদের দক্ষিণা কিছু কম নয়। ক্যালিফোর্নিয়ার মার্শা পড নামে এক মহিলা ওই পরামর্শের জন্য ঘণ্টা পিছু পারিশ্রমিক নেন। তবে সুবিধে হচ্ছে টেলিফোনে এঁদের যখন তখন ধরা যায়। রাত-বিরেতেও ফোনে উপদেশ দেন। দরকার হলে বাচ্চাটির মা অথবা বাবার অফিসে লাঞ্চের সময় গিয়ে দেখা করার অ্যাপায়েন্টমেন্ট দেন। মনে হয় ঘুমের পরামর্শ দেওয়াটাই

এঁদের ফুলটাইম পেশা। এঁরা মনে করেন বাচ্চাদের তিন মাস থেকে ছ'মাসের মধ্যে ঘুমের ট্রেনিং শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে নয়। কারণ তখন বোধশক্তি তৈরি হয় না। বাচ্চাদেরও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শুধু এরা নন, শিশুরোগের চিকিৎসকরা মনে করেন — অন্তত দু বছর বয়স পর্যন্ত ছোটদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেরো/চোদ্দো ঘণ্টা ঘুমের দরকার।

মেরিল্যান্ডে কিম ওয়েস্ট নামে এক ঘুমপাড়ানি মাসির এখন দারুণ পশার। তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্য ছ'সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়। সারা আমেরিকা থেকে নিদ্রাহীন মা, বাবারা তাঁকে ই-মেল করেন। ফোন করেন। দিনের দুশোটি ই-মেল-এর জবাব দিতে হয়। পঞ্চাশটি ফোনের উত্তর দিতে হয়। অনেকেই এঁর পরামর্শে সুফল পেয়েছেন। জেনিফার নামে এক মহিলার আট মাসের ছেলে কিছুতেই সহজে ঘুমোতে চাইত না। যদি বা একটু চোখ বুঝল, তো আবার হঠাৎ জেগে উঠে হল্লা। অধৈর্য, ক্লান্ত মা শেষে কিম ওয়েস্টকে ফোন করে উপদেশ নিলেন। কিম বোঝালেন — সকালের দিকে ছেলেটাকে কয়েকবার শুইয়ে দিতে হবে। বিকেলে খানিকক্ষণ জাগিয়ে রেখে সন্ধে সাতটা নাগাদ আবার ওর ছোট বিছানায় শুইয়ে দিন। যদি প্রচণ্ড চেঁচায়, তবে ওর খাটের পাশে চেয়ারে টেনে বসে থাকবেন। তিন দিন পরে চেয়ারটা দরজার কাছে নিয়ে বসবেন। দেখবেন ছেলেটি দূরত্বে তেমন আপত্তি করছে না। খাটে শুয়ে মাকে দেখতে দেখতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ছে। এক সপ্তাহ পরে আর ওকে শোয়ানোর পর ঘরে বসার দরকার হবে না।

এত সহজে অবশ্য ছেলেটার ট্রেনিং হয়নি। দিন পনেরো খুব হাহাকার করেছিল। মা তখন কিমের উপদেশে ঘরের দরজার বাইরে থাকতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তাঁরও নাকি দুঃখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু এত খরচ করে বিশেষজ্ঞ ডেকে, তার উপদেশ না নিলে তো ডলারগুলোও জলে যাবে। তাই ছেলের চোখের জল, নাকের জল উপেক্ষা করে ঘরের বাইরে দম ধরে বসে থাকছিলেন। এবং তাতেই কাজ হয়েছে। ছেলেটার এখন দশ মাস বয়স। রাতে জেগে উঠলেও বিশেষ ট্যাঁ ফোঁ করে না। আবার আপনমনে ঘুমিয়ে পড়ে।

আমাদের কাছাকাছি নিউইয়র্ক শহরে আছে 'সোহো পেরেন্টিং সেন্টার'। এখানে দুজন কাউন্সেলর ঘুম উপদেষ্টা হিসেবে আছেন। এঁদের 'আর্লি চাইল্ড এডুকেশন' আর 'ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজি'তে ডিগ্রি আছে। এক ঘণ্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর পরবর্তী এক সপ্তাহের উপদেশের জন্যে পারিশ্রমিক নেন

২২৫ ডলার। ওয়েবসাইট নম্বর হচ্ছে www.sohoparenting.com। মেরি ল্যান্ডের অ্যানাপোলিস শহরে ওই মহিলা কিম ওয়েস্ট 'ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক' নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। প্রতি ঘণ্টার পারিশ্রমিক ১২৫ ডলার ওয়েব সাইট নম্বর www.sleeplady.com। ক্যালিফোর্নিয়ার নোভ্যাটো শহরের মার্শা পড পেশায় রেজিস্টার্ড নার্স। 'মেটারন্যাল ইনফ্যান্ট কেয়ার' বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। ওঁর অফিসের নাম 'সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভ পেরেন্টিং'। পারিশ্রমিক ঘণ্টায় একশো ডলার। লস এঞ্জেলসে আছে 'চাইল্ড স্লিপ কোম্পানি'। তিনজন মহিলা মিলে কাজ করেন। তিনজনেরই 'স্যোশাল ওয়ার্ক'-এ মাস্টার্স ডিগ্রি আছে। প্রথমবারের দেড় ঘণ্টার জন্যে পারিশ্রমিক নেন ২৯৫ ডলার। তারপর পাঁচ দিনের উপদেশের জন্য ১৯৫।

কথা হচ্ছে বাচ্চার ঘুমের জন্যে সত্যি কি এত খরচ করে বাইরের লোকের পরামর্শ নেওয়া দরকার? মা-বাবা কি নিজেরা সামাল দিতে পারছেন? আসলে ক্রমশই দেখা যাচ্ছে এ যুগের বাবা-মায়েরা ছোটখাট সমস্যাতেও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চান। সন্তান পরিচর্যা, প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নিজেদের মা মাসি পিসির চেয়ে তাঁরা প্রফেশনাল উপদেষ্টাদের আরও বেশি শিক্ষিত, অভিজ্ঞ আর নির্ভরযোগ্য বলে ভাবেন। যেমন হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময় ল্যাকেটেশন নার্স আসে। ঘুমের সমস্যার জন্যে চাইল্ড স্লিপ স্পেশ্যালিস্ট আর পুষ্টির জন্যে চাইল্ড ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নেওয়া হয়। যে মায়েরা এদের ওপর বেশি আস্থা রাখে তাদের যুক্তি হল — আমি যা জানি না বা বুঝতে পারি না, তার জন্যে শিক্ষিত উপদেষ্টাদের কাছে যাব। নিজের অজ্ঞতার জন্য বাচ্চাকে ভুলভাবে মানুষ করতে চাই না। যুগে যুগে অনেকে থিওরি বদলে যাচ্ছে। আমাদের মায়েদের কথাও শুনব। এ যুগের উপদেষ্টাদের পরামর্শও নেব।

সুতরাং বাজারে ঘুমপাড়ানিদের চাহিদা বাড়ছে। তবে এ বিষয়ে কিন্তু অনেক বইও বেরিয়েছে। কারণ শিশুদের অনিয়মিত ঘুমের ব্যাপারটা ডাক্তারি শাস্ত্রমতেও তো সমস্যারই বিষয়। একটি জনপ্রিয় বই-এর নাম 'ফারবারাইজিং'। ডাক্তার রিচার্ড ফারবারের লেখা ঘুমের বই। তিনি বস্টনের চিলড্রেনস হসপিটাল সেন্টার ফর পিডিয়াট্রিক স্লিপ ডিসঅর্ডারস' এর বিভাগীয় প্রধান। তিনিও এই এক উপদেশ দিয়েছেন। বাচ্চাকে কোলে ঘুম পাড়ানো বা নিজেদের খাটে পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়ানোর বদলে তার ছোট্ট বিছানায় একা রেখে রেখে

ঘুমের অভ্যাস করানো ভালো। সে নিজে ঘুমোতে শিখলে মাঝরাতে জাগলেও ফের আপনি ঘুমিয়ে পড়বে। বারবার কোলে তুললে সে অভ্যাস তৈরি হতে চায় না। তখন মা বাবা বাচ্চা কারুরই ঠিকমতো ঘুম হয় না।

কিন্তু এইসব পরামর্শ কেউ কেউ সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন, বাচ্চাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ঘুম পাড়ানো ঠিক নয়। তাতে তার মনের দুঃখ থেকে স্থায়ী মানসিক ক্ষতি হতে পারে। উইলিয়ামস সিয়ার্স নামে এক মনোবিজ্ঞানী 'অ্যাটাচমেন্ট পেরেন্টিং' নামে একটা ঘুমের বই লিখেছেন। তাঁর উপদেশ — বাচ্চাদের মা বাবার কাছে শোয়াতে হয়। নিরপত্তাবোধ আর স্বস্তি থেকে সে আরামে ঘুমোয়। উইলিয়াম সিয়ার্সের মতো কিছু লোকের বক্তব্য — স্লিপ কনসালেটেন্টরা ব্যবসার নামে কী মহাকার্য করছে? তারা বাচ্চাদের ঘুমের শিক্ষা দেয় না। বাচ্চাদের জবরদস্তি শুইয়ে রাখে। এভাবে একা ঘরে শুইয়ে রেখে কাঁদালে তো বাচ্চাদের কাছে ঘুমোতে যাওয়ার ব্যাপারটাই ভীতিকর মনে হবে।

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসিদের লাগসই জবাব হচ্ছে — তাহলে আর আমাদের কাছে এত লোক পরামর্শে চাইতে আসত না। একেক জন উপকার পাচ্ছে আর মুখে মুখে আমাদের ঘুমপাড়ানোর পদ্ধতির প্রচার হচ্ছে। আমরা বাচ্চাদের শুধু নয়, রাত জাগা, ক্লান্ত মা-বাবাকে ঘুম ফিরিয়ে দিচ্ছি। তাতে তারা অফিসে ঠিকমতো কাজকর্ম করতে পারছে। কোম্পানির প্রোডাকটিভিটি বাড়ছে। যাকে বলে দেশ আর দশের উপকার করছি।

হ্যাঁ, বাটাভরা পানের বদলে মোটা দক্ষিণা নিয়ে নিজেদেরও যথেচ্ছ উপকার করছেন।

খুদে ফেরিওয়ালা

খুদে ফেরিওয়ালাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে বহু সংকল্প নিয়েছি। কিন্তু বেশিরভাগই বৃথা হয়ে গেছে। প্রায়ই বিকেলের পরে দরজায় টুং টাং ঘণ্টা। কাচের ভেতর থেকে ডিঙি মেরে উঁকি দিচ্ছে ছোট্ট মাথা। শীতকালে টুপির বল নড়ছে দেখতে পাই। হয়তো বাইরে বরফ পড়ছে। দরজা খুলতেই শীতে কালিয়ে যাওয়া ছোট্ট একখানি মুখ। কচি গলায় আবেদন — "চকলেট কিনবে? আমাদের স্কুল থেকে চার্চকে হেল্প...." বেশি কথা শোনার সময় নেই। এক ডলারে একটা বড় চকলেট গছিয়ে চলে গেল বাচ্চাটা। বাড়িতে যেহেতু কুচো কাঁচা কেউ নেই, অতএব ক্যালোরি গণনা উপেক্ষা করে সেই আমাকেই পয়সা উশুল করতে হয়। শুধু কি চকলেট? গার্লস্কাউটের বিকট নারকোল কুচি মাখানো নানখাটাই মার্কা বিস্কুট, বয়স্কাউটের চকলেটের পোঁচড়া বোলানো কুকি, পাড়ার সাঁতার ক্লাবের "বেক সেল"-এর জন্যে আনারসের জেলি পোরা মায়ের হাতের কেক — তাবৎ শর্করাপ্রধান খাদ্য আমার বরাতে বাঁধা। একে তো মার্কিন সমাজে 'ফান্ড রেইজিং" জাতীয় মহৎ কমিটির প্রচলন খুব বেশি। স্কুলে, চার্চে, গালর্স স্কাউটের মেয়েদের প্রাথমিক ক্লাব "ব্রাউনি" দলে, স্কাউট দলে সব সময় ছোটদের দিয়ে চাঁদা তোলা আর সেই টাকায় নানা জায়গায় সাহায্য পাঠানো, নানা পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করে তোলা প্রায় জাতীয় কর্তব্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অবশ্য জোর জবরদস্তির কোনও প্রশ্ন নেই। চাঁদা না দিলে কেউ আপনার চিঠির বাক্স ভেঙে দিয়ে যাবে না বা দরজায় ঝোলানো নেমপ্লেট উড়িয়ে দেবে না। অর্থাৎ হুমকির কোনও ভয় নেই। কিন্তু আপনার তো

সর্ষের মধ্যেই ভূত। কারণ ওই বালখিল্য বিক্রেতাদের মধ্যে কোনও না কোনও সময়ে আপনার, আমার বাড়ির খুদে সদস্যরাও তো থাকছে। তারা, তাদের বন্ধুর করুণ মুখের ভাইবোনেরা, তাদের মায়াময় চাউনির বন্ধুরা — এদের সমবেত আবির্ভাব এবং প্রত্যেকের বাক্স বোঝাই বিস্কুট, চকলেট, ফুলগাছ, ক্রিসমাসের কাগজের মোড়ক, আপনি কোন প্রাণে তাদের খেদিয়ে দেবেন? স্কুল ফেরত একবার আমার মেয়ে বাড়ি এল সঙ্গে এক বিরাট কাগজের বাক্স। কী ব্যাপার? না ক্রিসমাসের সময় কোন অনাথ আশ্রমে গরিব ছেলেমেয়েদের নতুন জুতো আর খেলনা কিনে দেওয়া হবে ওদের প্রাথমিক স্কুল থেকে। সে জন্যে শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে তিরিশখানা চকলেট বিক্রি করতে দিয়েছে। একটি নির্দিষ্ট তারিখের পর বিক্রির টাকা জমা নেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং কেনাকাটি শেষ করে যথাসময়ে অনাথ আশ্রমে উপহার পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ছেলেমেয়েরা নিজে হাতে বড়দিনের কার্ড তৈরি করে সঙ্গে পাঠাবে।

আমার মেয়ে বড়দিনের কার্ড এঁকে তার ডিউটি শেষ করে ফেলল প্রথমেই। তারপর সেই বাদামের জেলি পোরা অসংখ্য চকলেট নিয়ে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ শুরু হল। কারণ তার আগে থেকে সে বাড়িতে জড় করেছে নারকোল কোরা দেওয়া 'ব্রাউনি" দলের বিস্কুট। আমরা ভারতীয়রা দ্বিতীয় প্রজন্মকে মোটেই একঘরে করে রাখতে চাই না। অন্যান্য আমেরিকান ছেলেমেয়েরা যা যা শিখছে, যেখানে যেখানে ভর্তি হচ্ছে, এদেরও সেসব সুযোগ দেওয়া দরকার। তা "ব্রাউনি" ক্লাবে ভিড়েছে যখন (গার্লস স্কাউটে ভর্তি হবার আগের স্তরের ক্লাব) বিস্কুট বিক্রির পবিত্র কর্তব্য সারতেই হবে তাকে। এখন তাকে না তার মাকে, সেটাই প্রশ্ন। আমাদের সাবধানী মানসিকতা তো সহজাত। ওইটুকু মেয়েকে বিস্কুট বেচতে দোরে দোরে একা পাঠানো আর হয়ে উঠছিল না। বেশি ঠাণ্ডায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলে নির্ঘাৎ তার কান কটকট করবে। সঙ্গে হেঁটে হেঁটে আমারও টনসিলের ব্যথা চাগাড় দিতে পারে। এইসব উটকো ঝামেলার ভয়ে সেই বাদাম বিস্কুটের বাক্স ক্রমশ চক্ষুশূল হয়ে উঠছিল। এর ওপর শাকের আঁটি হয়ে এল নতুন চকলেটের বাক্স। কিছু ডলার তুলে দিতেই হবে। নয়তো বিক্রির ব্যর্থতায় এবং লজ্জায় মেয়ে মুখ নিচু করে ইস্কুলে যাবে। মার্কিন প্রতিবেশীদের তো ঘরে ঘরে এক অবস্থা। যাদের যত ছেলেমেয়ে বেশি, বিশেষ করে ক্যাথলিক পাড়ায়, তাদের

ঘরে ইস্কুল ফেরৎ বাক্সও ঢুকেছে তত বেশি। ফলে কে কাকে বিক্রি করে? বাঙালি আড্ডায় দেখতাম অনেক বাচ্চা এই সব বাক্স নিয়ে আসে। মাসি, মেসোর দল দয়াপরবশ হয় কিনে নেন একটা, দুটো বাক্স। অনেকে আবার ক্যালোরির দুশ্চিন্তায় "চকোলেট"টা কিনে নিয়ে আবার সেই খুদে বিক্রেতাকেই দান করে দেন। কিন্তু সব জায়গায় তো গছানো যায় না এভাবে। কোনও কোনও বাচ্চা বাবার শরণাপন্নও হয়। আমেরিকান বাবারা অফিসে খানকতক চালিয়ে দেন অনায়াসে। সহকর্মীরা দু/চারজন কিনে নেন দিব্যি। কিন্তু বাঙালি বাবাকে অফিসে চকলেট বিস্কুট বিক্রি করতে বলা মানে অকারণ মান নিয়ে টানাটানি। প্রথমত তাঁর সময় নেই, দ্বিতীয়ত তাঁর ইচ্ছে নেই। তৃতীয়ত "ঝুড়ি ধরে ইস্কুলে ফেরত দাও। কী ইমপোজিশন। আরে তোরা চার্চে দান করবি তো আমাদের ঘাড় ভাঙবি কেন..." ইত্যাদি সংলাপেই খালাস। নিত্য, এই ভাঙা কুলো মায়েদের মতো তো স্কুলে, স্কাউটের মিটিং-এ গিয়ে সম্মুখ সমরে সামিল হতে হয় না তাঁদের। অতএব বাক্স বাক্স বিস্কুট, চকলেট নিয়ে মার গজগজানি, শিশুর মুখ ভার। শেষমেশ ভারী বুদ্ধির পরিচয় দিতে শিশু বলে — "একটা কাজ করো না। তুমি আমাকে ব্রাউনির জন্যে একটা তিরিশ ডলারের চেক লিখে দাও। আর স্কুলের জন্যে আর একটা আলাদা চেক। ওদের দিয়ে দেব।" মা সমাধান বুঝতে না পেরে বলেন — "তারপর? আমাদের তো ষাট ডলার চলে গেল। তুই তো মাত্র বারোটা বিক্রি করলি। আর বাদবাকি বিক্রি করবে কে?" শিশুর সরল সমাধান — "আর বিক্রি করব না। তুমি আর আমি মিলে সব কুকি, চকলেট খেয়ে নেব অনেকদিন ধরে। বাবাকে একটুও দেব না। আমাকে হেল্প করেনি কেন?"

ক্রমাগত এইভাবে ঘরে বাইরে শিশুদের দাক্ষিণ্য দেখাতে দেখাতে হাবিজাবি জিনিসে ঘর ভরে গেল। ক্রিসমাসের আগে আগে আরও জ্বালতেন। তখন আবার অর্ডার বুক আর পেনসিল নিয়ে গুটি গুটি এসে হাজির হবে এপাড়া ওপাড়া থেকে। হয়তো প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে আছি, তার মধ্যে বই হাতে আমড়াগাছি। কীই বা বয়স ওদের! দুটো একটা জিনিস কিনলে কী কী সব সুবিধে পায় ওদের নানা সংস্থার কাজে। সবই নাকি জনসেবার কাজ। সে সময় অর্ডার বুকে যা যা পাওয়া যায়, বেশিরভাগই ক্রিসমাস সংক্রান্ত জিনিস এবং উপহার। তাড়াহুড়োর মধ্যে বইটা

কোনওমতে উলটে পালটে দেখলাম, জিনিস পছন্দ করলাম তো সেই খুদে ক্যানভাসার বসল ফর্ম ফিল আপ করতে। হয়তো সর্দিতে হাঁসফাঁস করছে। ক্রমাগত টিস্যু পেপার দিয়ে নাক মুছছে আর গম্ভীর মুখে ফর্মে লিখে নিচ্ছে আমার নাম, ধাম, টেলিফোন নম্বর, অর্ডার নম্বর, ডলারের দাম ইত্যাদি যা যা লেখা দরকার। সেই কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং-এর নীচে আবার আমার সই চাই। প্রথম প্রথম সন্দেহ হত, আদৌ কিছু ডেলিভারি দিতে আসবে কি না। কিন্তু বরাবর দেখেছি ঠিক ক্রিসমাসের সপ্তাহ দুই আগে আবার এসেছে সেই ছোট্ট সেলসম্যান। ফুলের টব, মোমবাতির প্যাকেট, নয়তো উপহার জড়ানোর কাগজ — যা কিছু অর্ডার দিয়েছিলাম। ঠিক ঠিক মতো দরজায় পৌঁছে দিয়ে গেছে।

এইভাবে ক্লাব বা স্কুলের জিনিস বিক্রি করতে করতে অল্পবয়সেই এদের বেশ ব্যবসা বুদ্ধি খোলে নিশ্চয়ই। কারণ এর পর এরা নিজেদের গরজেই ফেরিওলা হয়ে বসে। দরকারের চেয়ে ঝোঁকটাই বড় হয়ে ওঠে। হাতে কিছু নগদ পাবার লোভ আর কি? আমেরিকার ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে নিজে কিছু রোজগার করতে চায় কেন এনিয়ে অনেক রকম উত্তর দেওয়া যায়। প্রধান কারণ হচ্ছে আর্থিক স্বাধীনতা। বাড়তি রোজগার মানেই ইচ্ছেমতো খরচ করার সুযোগ। কিন্তু যে বয়সের ছেলেমেয়েদের কথা এখানে লিখছি, তারা ছ/সাত বছর থেকে নয়/দশ বছরের ছেলেমেয়ে। এরা পারিবারিক উৎসাহে কিংবা প্রয়োজনের জন্যে রোজগার করে না। সেটি শুরু হয় বারো বছর বয়স নাগাদ। ছেলেরা 'পেপার বয়' হয়ে কাগজের হকার হয়েছে এবং বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ বিক্রি করছে, নয়তো শীতকালে পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ির বরফ পরিষ্কার করছে, কিংবা গ্রীষ্মকালে বাগানের কাজ করছে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৩ বছর বয়স থেকে "বেবি সিটিং" তো আছেই। তবে এগুলিও হাত খরচের জন্যে বাড়তি উপার্জনের মতো। ঠিক আর্থিক অভাবের জন্যেও নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কারণ সাধারণত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ ধরনের কাজকর্ম করার শখ হয়। রোজগার করেই তা দিয়ে সিনেমা দেখে, পিৎজা খেয়ে, শখের জিনিস কিনে খরচ করে ফেলে উদ্বৃত্ত অংশটুকু। পারিবারিক প্রয়োজনের জন্যে হাইস্কুলের শেষ ধাপে অর্থাৎ ষোলো বছরের পরে এরা সাধারণত পার্ট টাইম কাজ করে উইক এন্ডে কিংবা স্কুলের ছুটি পরে সপ্তাহে দু-তিন দিন। সুতরাং আর্থিক

ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে চাইছে, এমন বয়সি ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গ এটি নয়। যাদের প্রসঙ্গে শুরু করেছি, তারা নেহাতই ছোট এবং হুজুগের বশেই দোকানদারি দোকানদারি খেলার নেশায় মেতে ওঠে। বন্ধুদের অনুপ্রেরণাই আসল। সময় কাটানোও বটে। স্কুলে এদেশে আড়াই মাস টানা গরমের ছুটি। বেশিরভাগ বাড়িতে হয়তো মা, বাবা দুজনেই চাকরিতে চলে যান। দাদা, দিদিরা তেমন আমল দেয় না। সুতরাং নিত্যনতুন মজার খোরাক তো কিছু চাই। ফোন তুলে সব শলাপরামর্শ হল। কি না রাস্তার মোড়ে একটা শরবরতের দোকান দেওয়া যাক। মিশেল বলল "আমি বাড়ি থেকে ক'টা চেয়ার আর একটা ছোট্ট টেবিল নিয়ে যাচ্ছি।" দাদা, দিদিরাই বয়ে বয়ে পৌঁছে দিয়ে এল ফার্নিচার। খানিকক্ষণ নিজেদেরও মুক্তি। ভেরোনিকা নিয়ে এল মায়ের ভাঁড়ার হাটকে এক কৌটো চিনি। বিলি জলের জগ আর লেমনেডের গুঁড়ো পাউডার। ভিরা পেপার গেলাস আর বরফ দেওয়া জল। ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই। দাদা দিদিদের পটিয়ে মাথার ওপর দুটো বড় গার্ডেন আমব্রেলা লাগানো হল গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি দড়া ঝুলিয়ে। নয়তো দোকানিদের মুখগুলো যে তেতে পুড়ে যাবে। তারপর মহা সমারোহে দোকান খোলা হল। অনবরত হাঁকছে — "কুল লেমনেড, টেন সেন্টস্, টেন সেন্টস।' দশ পয়সায় এক গেলাস লেবু ও চিনি গোলা শরবত খেতে গাড়িগুলো থামেও —আশ্চর্য! আবার টুকটাক খদ্দের আসছে হাঁটা পথেও। তাদের বয়স ওই দোকানিগুলোর মতো। কেনার আগে নানা প্রশ্ন। লেমনেড ছাড়া আর কিছু আছে কি না? পঁচিশ পয়সায় তিন গেলাস দেবে কি না? দোকানিরা সকালের দিকে দামের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করলেও বিকেলের দিকে আক্ষরিক অর্থে জলের দরে জল বিকোয়। কারণ বাড়ি ফেরার তাড়া আছে। চিনি চোর খুব শঙ্কিত। পেপার গেলাস যে এনেছিল, তারও মনে হচ্ছে সমবণ্টনের ব্যবসা হলেও বোধ হয় নিজের ইনভেস্টমেন্ট কিছু বেশি হয়ে গেছে। কারণ একশো খানা গেলাসের মধ্যে অর্ধেকই তো নিজেরা লেমনেড খেয়ে খেয়ে পাশে রাখা গারবেজ ড্রামে ফেলে দিয়েছে। ক্রেতার সংখ্যাও কম ছিল নাকি? এখন কটামাত্র গেলাস নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই দেখি পাকা গিন্নি হয়ে সব সামলাচ্ছে মেয়েরা। ছেলেগুলো মাথায় একটা টুপি উলটো করে পরে অনবরত গুবলেট করছে। ওদের ওপর শরবত বানাতে দিয়ে ভরসা পাচ্ছে না মেয়েরা। জল ও গুঁড়োর

মাপের গণ্ডগোল করে সব ডোবাচ্ছে। তার চেয়ে ওরা বরং অনবরত বাড়ি গিয়ে বরফ আনুক, জল আনুক জগ ভরে ভরে। তা না কেবল সর্দারি আর শরবত গোলবার চেষ্টা। বিলিকে একদম ভরসা করা যায় না। বরফ আনতে গিয়ে আর ফেরেই না। এদিকে গাড়ি থামিয়ে খদ্দের বসে আছে। খুব রেগে গরগর করতে করতে ভিরা বিলির বাড়িতে গিয়ে দেখে সে বরফের ট্রে হাতে একমনে টিভিতে কার্টুন দেখছে। বিলিতে ভিরাতে হয়ে গেল এক চোট। বিকেলে পয়সা ভাগ করার সময় পঁচিশ পয়সা কম নিতে রাজি হয়ে গিয়ে বিলি পাকাপাকিভাবে কার্টুন দেখতে বসে গেল। ওদিকে বিকেলে কারও মা এসে দেখছেন সারা বাড়ি জল, কাদা আর চিনি গুঁড়ো মিশে চটচট করছে। কেউ দেখছেন ফ্রিজে এক টুকরোও বরফ নেই। বাগানের ছাতাগুলো মোড়ের গাছে ঝুলছে। টেবিল চেয়ার ফেলে দোকানিগুলো কোথায় খেলছে। তাদের খোঁজপত্র করে সব যার যার বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হল। শরবতের 'ব্যবসা'র খবর নিতে দাদা দিদিরা হিসেব নিকেশ চাইল। কখনও সামান্য লাভ। কখনও রীতিমত ক্ষতি, কারণ হয়তো সেদিন বেশি রোদে জগিং করতে লোক বেরয়নি। তাদের তৃষ্ণা নিবারণী শরবত ভাঙা হাটে অপেক্ষমান কিছু শিশু ক্রেতাদের জলের দরে দেওয়া হয়েছে। আর এই রোদের মধ্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে গিয়ে ওরা নিজেরাও কি শুকনো গলায় বসে থাকবে?

সব সময় যে শান্তিপূর্ণভাবে দোকান চলে তাও নয়। দোকানিদের ভাই বোন, তাদের বন্ধুরা এসে করুণ মিনতি করবে। দু'টুকরো বরফ বাড়তি দাও পাঁচ পয়সা কম পড়েছে, নিও না। চিনি কম লাগছে বলে লেমনেডে আরও দু চামচে চিনি দাও। আবার মিষ্টি বেশি হয়ে গেল তো জল বাড়াও। হাজার বায়নাক্কা! অথচ বাড়িতে কোক, ড্রিঙ্কস-এর অভাব নেই। হিসেবি মায়েদের প্রভাবেও বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে ব্যবসা লাটে উঠে গেছে কতবার। শরবতের ব্যবসা ছারখার একেবারে! বারবার শুধু চেয়ার টেবিল আনার ফন্দি করবে কেন মিশেল? ওদের তো কোনও খরচ লাগছে না। আর ভেরোনিকার মা কেনই বা সমানে চিনির ঠোঙা সাপ্লাই দেবে? চিনির দাম নেই? সুজ্যানের মা তো রীতিমত মেয়েকে শাসিয়েছে — "খবরদার আমাদের বাগান থেকে নতুন ছাতা খুলে নিয়ে দোকানের ছাদ বানাবে না।"

আমার মেয়ে বলা বাহুল্য এসব ব্যবসায়ে ভিড়েছিল ২/১ বার। একবার

পাড়ার দলের প্রেরণায় ভ্যানিলা শরবরতের দোকানে বসেছিল। সারাদিন ধরে অনবরত "এসেন্স অব ভ্যানিলা" চাইতে আসছে। দামি নির্যাস বলে কথা! বারবার কত সাপ্লাই দেওয়া যায়? শেষে ভ্যানিলার শিশি ফুরিয়ে যেতে এক শিশি অরেঞ্জ এক্সট্র্যাক্ট হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম — "এবার অরেঞ্জ ড্রিংক বিক্রি করোগে যাও।" ঠিক রাজি হচ্ছিল না। ধমক খেয়ে শিশি হাতে চলে গেল। একটু বাদে মুখ লাল করে হনহনিয়ে এসে হাজির। —"বিলি, অ্যানথনি বলেছে, ওরা পোস্টার চেঞ্জ করবে না। আমরা একবার লিখেছি "ভ্যানিলা পার্লার।" এখন আবার "অরেঞ্জ পার্লার" লেখা পোস্টার কেউ বানিয়ে দিচ্ছে না।" মেয়ের হুজুগে আর কত তাল দেওয়া যায়? ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট শেষ হয়ে গেছে, তবু কমলার সুগন্ধ নেবে না! শেষে লাভের গুড় পিঁপড়েরা খাব বলে রণে ভঙ্গ দিয়ে তাকে নিয়ে বেড়াতে চলে গেলাম। সে ঠিকমতো অর্ডার সাপ্লাই দিতে পারেনি বলে বোধহয় পরবর্তী ব্যবসায়ে তার নাম কাটা গিয়েছিল। আর হুড়মুড়িয়ে বর্ষা নেমে যাওয়াতে এমনিতেই শরবতের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল সেবার।

আবার ক্রিসমাস আসছে। যিশু বলেছিলেন প্রতিবেশীদের ভালোবেসো। প্রতিবেশী বলতে ওই কচিকাঁচাদেরও বোঝায়। ভালোবাসা বড় গভীর কথা। তবে মায়া মমতার মতো কিছু অনুভূতি কি একেবারে উবে যাওয়া সম্ভব যখন দেখি — কচি কচি পায়ে সিঁড়ি ভেঙে, বগলে ক্যাটালগ বই আর চেক জমা নেবার কাগজের খাম হাতে আসছে একটা দুটো ছোট ছেলে মেয়ে? আবার রেফারেন্স সঙ্গে নিয়ে আসে মাঝে মাঝে। বলে — "হাই! আমার নাম ক্যারল হিগিন্স। আমার দিদির বন্ধু জেসিকা তোমার মেয়ের পিয়ানো ক্লাসের বন্ধু ছিল..."। ভাবি সে কোনকালের কথা? জেসিকাই বা কে ছিল? হবে নিশ্চয়ই কেউ। আর চেনাশোনা না থাকলেই বা তাড়াব কোন সুবাদে? আমারও তো সর্ষের মধ্যে অতীত কালের ভূত বসে আছে। বড়দিনের ছুটিতে কলেজ থেকে বাড়িতে এসে জেরা শুরু করবে — "ক্রিসমাসের র‍্যাপিং পেপার, ফ্রুটকেক, টডের বোন এরিকার কাছে কিনেছিলে তো? ক্যান্ডল দিতে কে এসেছিল এবার?" খুদে ক্যানভাসাররা বাড়িতে শুধু আসে না, তাদের সস্তার সম্ভারে জানলার তাক সাজিয়ে আমাকে প্রমাণ করতে হয় — এরিকা নামে লাল চুলের ছোট্ট মেয়েটার কাছে সুগন্ধী মোমবাতি কিনেছি। ক্রিসমাস ট্রির নীচে রাখা উপহারগুলোর সস্তার খসখসে রঙিন মোড়কের

কাগজ কিনেছি নাম ভুলে যাওয়া আর একটা খুদে সেলসম্যানের কাছে। ফ্রুট কেক টডের বোনের কাছে না কিনলেও স্টেফানের বোন গছিয়ে গেছে। নিজের বদান্যতায় মুগ্ধ হবার সুযোগ পাই না। সরষের ভূত ক্রমাগত বুঝিয়ে গেছে — এই বিক্রিবাটার পয়সায় নাকি বাচ্চাগুলোর নিজস্ব কোনও স্বার্থ থাকে না। সেসব তারা জমা দেয় নানা প্রতিষ্ঠানে। হয়তো সমষ্টিগত সুবিধে সামান্য পায়। গরিব শিশুদের অনাথ আশ্রমে দান ধ্যান করতে যাবার দিন বড় একখানা স্কুল বাসা ভাড়া করতে হয় তো তার খরচটা নিয়ে নিল ওই তহবিল থেকে। কথাগুলো মিথ্যে নয় জানি। কারণ চেক ক্যাশ হয়ে যাবার পর সেই প্রতিষ্ঠানের রবার স্ট্যাম্প দেখতে পাই।

এইসব ছোট ছোট 'হর্ষবর্ধন'দের মহান দান ধ্যানের জন্যে শীত বর্ষা মাথায় করে বাড়ি বাড়ি ঘোরা বড় কম কাজ নয়। সুতরাং তাদের হর্ষ বর্ধন করতে আমার জানলার তাকগুলো ভূষিমালেই ভরে থাক। খুদে ফেরিওয়ালাদের সওদা না নিয়ে আমার নিস্তার নেই এবারের বড়দিনেও।

গবেষণার বিষয়বস্তু

আমেরিকায় এখন গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে এমন টানা হেঁচড়া চলেছে যে, ছাত্রছাত্রীরা অভিনবত্বের সন্ধানে পৃথিবীর আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখছে। কোথায় সে গুহায় নিহিত তত্ত্ব? বিদ্যানুরাগ এমনই জিনিস। ঐতিহ্য অনুসারী মার্কিন আর ইমিগ্র্যান্ট পরিবারের ছেলেমেয়েরা অবশ্য বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেই ধরাবাঁধা পথেই চলেছে। গণিত, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রযুক্তি বিদ্যা, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন আর বিশ্ব রাজনীতির অতল সমুদ্রে নেমে গিয়ে পি এইচ ডি-র মণিমুক্তো তুলে আনতে ব্যস্ত। কিন্তু জ্ঞানের ভাঁড়ার ঘর এত ছোট নাকি? বনবাদাড়ে কত রহস্য রয়েছে না? দুর্গম গিরি কান্তার মরুতে? রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেটি' কি অকারণে মাঠে ঘাটে চরে বেড়াত? আমেরিকাতেও ওর মতো লোক এত আছে যে নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি নিয়ে গুরুভার থিসিস লেখা কোনও ব্যাপার নয়। গুরুভার এ কারণে, যে ৪৭৪ পৃষ্ঠার ডক্টরাল ডিসার্টেশন-এর ওজন বিচার করলেও তাকে 'লঘু' বলা অন্যায় হবে। আর চিন্তাশীলতার ঘনত্ব ভাবলে তো ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে আমার।

হাসির কথা নয়। ইউনির্ভাসিটি অফ পেসিলভানিয়া থেকে ক্যাথরিন নামে এক মহিলা সদ্য পি এইচ ডি শেষ করেছেন। বিষয় হল 'গেঁড়ি গুগলি বেকিং করার আসাধারণ উপায়!' গবেষণার জন্যে তিনি বস্টনের ধারে কাছে ঘুরেছেন দীর্ঘদিন। ম্যাসাচুসেটস পেরিয়ে আরও উত্তরে ভারমন্ট, নিউহ্যাম্পশায়ার, মেইনে পর্যন্ত চলে গেছেন। যেখানে যত সি ফুড রেস্তোরাঁ দেখেছেন, সেখানেই গেঁড়ি গুগলির ছাল ছাড়ানো থলথলে করুণ মাংস নিয়ে গভীর চিন্তা করেছেন। রাত জেগে নোট লিখেছেন। মোট পাঁচ বছর সময় লেগেছে তাঁর 'গুগলি

রিসার্চ' প্রজেক্ট শেষ করতে। এখন তিনি ডক্টরেট পেয়ে গেঁড়ি বেকিং নিয়ে পড়ানোর চাকরি খুঁজছেন। তাঁর মতে এই আপাত নিরীহ বিষয়টির মধ্যে লুকিয়ে আছে আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাস থেকে শুরু করে সংস্কৃতি রাজনীতি ইত্যাদি বড় বড় ব্যাপার। গেঁড়ি গুগলির বেকিং কিছু সামান্য উদ্ভাবনা নয়। কে প্রথম গুগলির শাঁসকে খাদ্য বলে জেনেছিল? এখানেই তো সমুদ্র যুগের ইতিহাস এসে গেল। বেকিং-এর পন্থা আবিষ্কার করেছিল কে? বিলেত থেকে জাহাজ ভর্তি হয়ে আসা পিলগ্রিমরা? আগে কি তারা টেমসের ধারে বসে গেঁড়ি ঝলসে খেত? এসব তো গেল ইতিহাস আর নৃতত্ত্বের ব্যাপার। কিন্তু বর্তমানে গেঁড়ি সেদ্ধ করে কারা? আভেন জ্বেলে বসে বসে গেঁড়ি বেক করে যারা কেনই বা তারা জলে সেদ্ধ করার মতো কায়দায় ওগুলো খোলাসুদ্ধ বেক করে না? চিমড়ে হবার পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও শাঁস নধর হয় কেন? কী সেই মন্ত্রগুপ্তি? কাঁচা অবস্থায় খোলা ছাড়ায় কী কায়দায়? সমুদ্রে এত প্রাণী থাকতে হঠাৎ গেঁড়ির এত কদর হল কেন?

এই সব তথ্য সাজিয়ে কত বড় তত্ত্বের জন্ম হয়ে গেল ক্যাথরিনের হাতে। তাঁর নামের আগে ডক্টরেটের অলংকার শোভা পাচ্ছে এখন। বিষয়টা এমন কিছু বড় কথা নয়। সকলেই কি আইনস্টাইনের মতো অধরার সাধনায় মগ্ন থাকবেন নাকি? অথবা এডিসনের মতো গেয়ে বেড়াবেন — 'দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎ লতা'...। বহু মানুষের কাছে চেখে দেখা এবং চোখে দেখার আবেদন অনেক বেশি। সুতরাং শামুকের মাংসের পাক প্রণালী নিয়ে গবেষণা করার এক্তিয়ার তাঁদের অবশ্যই আছে।

আসলে গবেষণার জন্যে মৌলিক বিষয় পাওয়া এখন রীতিমতো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আমেরিকাতেই এখন আছেন অর্ধ লক্ষেরও বেশি ডক্টরেট মানুষ, যাঁরা অধিকাংশ মণি মুক্তো তুলে নিয়ে পালিয়েছেন। বাদ বাকি ছাত্রছাত্রীদের বরাতে রিসার্চের জন্যে 'গেঁড়ি' সভ্যতার ক্রমবিকাশই বরাদ্দ থাকছে। অথচ একশো বছর আগে বিষয়ের জন্যে ভাবতে হত না। সমুদ্র তখন রত্নগর্ভা। ১৮৬১ সালে যে প্রথম তিনজন আমেরিকান ডক্টরেট হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জেমস মরিস হুইটন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেছিলেন। তাঁর রিসার্চ-এর বিষয় ছিল ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য। বিষয়ের নাম নাম ছিল 'শিল্প অবিনশ্বর, জীবন নশ্বর।' ১৮৭৩ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেট হয়েছিলেন যিনি তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল —

'সূর্যের উত্তাপ'। কিন্তু এখন ডক্টরেট করার আগে প্রথম শর্ত হিসেবে মৌলিক চিন্তার ব্যাপারটি যখনই আসছে, ছাত্রছাত্রীদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে নতুন বিষয় খুঁজে পাওয়া। বিশেষ করে হিউম্যানিটিজ গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে তাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হবার উপক্রম। কতরকম বিষয় নিয়েই যে ইদানীং তারা পি এইচ ডি করছে। পাথুরে টিলায় চড়ার শখ যাদের, তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে পি এইচ ডি করেছেন একজন। মনে রাখবেন, পর্বত আরোহীদের নিয়ে নয়, পাথর বেয়ে বেয়ে ওঠা এবং ছোট্ট টিলায় চড়ে বসে থাকা লোকেদের প্রবণতার ওপর থিসিস লেখা হয়েছে। মিনি কৈলাসবাসীদের মানসিকতা নিয়ে গবেষণা আর কি? আবার একজন পি এইচ ডি করেছেন রক অ্যান্ড রোল গাইয়েদের দৈহিক অঙ্গভঙ্গি ও তার নিগুঢ়ার্থ নিয়ে। মাইক হাতে নিয়ে ওই যে লাট খেয়ে খেয়ে পড়ছে, শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আগু পিছু আসছে, যাচ্ছে — এর নিহিতার্থ কী? তারই ওপর থিসিস লেখা এবং পি এইচ ডি পাওয়া হয়ে গেছে। আরও বিচিত্র বিষয় নিয়ে ডক্টরেট করেছেন কতজন। কেউ করেছেন — 'মেয়েদের বাজার করার সমাজ তাত্ত্বিক তাৎপর্য' নিয়ে। একজনের বিষয় ছিল — 'স্কুলের হেড মাস্টারের দৈহিক ওজনের সঙ্গে কর্মকুশলতা সম্পর্ক।' মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র 'মহিলাদের গলফ খেলার প্রাথমিক কৌশল' নিয়ে পি এইচ ডি-র থিসিস তৈরি করেছেন। একজন আবার ব্যায়াম শিক্ষার ক্লাসের জনপ্রিয়তার ওপর ডিগ্রি করেছেন। গভীর পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ! ব্যায়াম শিক্ষকের আন্তরিক ব্যবহার আর শারীরিক গঠন কি বেশি কার্যকর হয়? শেষে, গবেষণাকারী সিদ্ধান্তে এসেছেন যে — ব্যায়াম শিক্ষক যতই আকর্ষণীয় হোন না কেন, হেলথ স্পা' চালাতে হলে তাঁর কার্যসূচি আর জায়গাটি সুবিধাজনক হতে হবে। সময় আর আখড়াটি পছন্দমাফিক হলে হু হু করে লোক আসবে। নয়তো শুধু শুধু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মাস্টার কিছু করতে পারবে না। ফাঁকা মাঠে বাজনা বাজিয়ে লম্ফ ঝম্ফ সার হবে। কেউ বা বিষয় খুঁজতে খুঁজতে সোজা চার্চে পৌঁছে গেছেন। চার্চে যেসব ভলান্টিয়ার দরকার হয়, তাদের শিক্ষা দিতে গেলে ট্রেনারদের কেমন হতে হবে? গবেষণাকারী ছাত্রী বহু বিচার বিবেচনার পরে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ট্রেনারকে যিশুর প্রতি অনুরক্ত হতে হবে, বাইবেলে বিশ্বাসী হতে হবে। এবং ভলন্টিয়ারদের ভীষণ ভালোবাসতে হবে।

কিন্তু এই ধরনের বিষয় নিয়ে কিছু পণ্ডিত মানুষ প্রবল আপত্তি জানাচ্ছেন।

তাঁদের বক্তব্য — পি এইচ ডির মতো কঠিন এবং শ্রম সাপেক্ষ পাঠক্রম নিয়ে ইদানীং যেন ছেলেখেলা শুরু হয়েছে। উচ্চশিক্ষার মান বলে আর কিছু বজায় থাকছে না। গভীর, জ্ঞানগর্ভ এবং বুদ্ধি সম্পর্কিত গবেষণার দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে পুরস্কার পাওয়ার কথা, তার পরিবর্তে শুধুমাত্র নতুনত্বের দাবি নিয়ে এই তুচ্ছ বিষয়গুলি জাতে উঠে যাচ্ছে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সময় থেকে ডক্টরাল ডিসার্টেশনের সূত্রপাত হয়েছিল, সে সময় এর নিয়মাবলী ছিল এইরকম — কোনও একজন ছাত্র কোনও বিশেষ বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। এবং তার মৌলিক তথ্য নিয়ে সর্বসাধারণের তর্কের অবকাশ থাকবে। প্রয়োজন অনুসারে নিজের তথ্যকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে। এ যুগে আর সেরকম পরিস্থিতি নেই। সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ২৫ জন অধ্যাপকের সামনে ছাত্রকে নিজের থিসিসটি পড়ে শোনাতে হয়। অনুমোদনের পরে থিসিস-এর জায়গা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত লাইব্রেরির কোনও একটি বই-এর তাকে। মূল উদ্দেশ্য অবশ্য বজায় থাকে। অর্থাৎ ডক্টরেট পেতে গেলে ছাত্রছাত্রীকে নিজস্ব অবদান কিছু রাখতেই হবে। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে অন্তত এক কণা শস্য সংযোজন করতে হবে। সেই হিসেবে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হয়।

ক্রমশ পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে কত রকমের শস্যই জমা পড়ছে। এক আমেরিকান মহিলা জমা দিয়েছেন তাঁর স্বোপার্জিত জ্ঞানের কয়েকটি দানা। গবেষণার বিষয় ছিল — 'আমেরিকার স্লাম্বার পার্টিতে কিশোরীদের সংলাপ'। স্লাম্বার পার্টি হল ঘুমের নামে রাত জাগা পার্টি। সাধারণত মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রীরা ছুটির দিনে দল বেঁধে এরকম পার্টি করে। কোনও একটি মেয়ের বাড়িতে সন্ধে থেকে জমা হয়ে তারপর রাতে সারি সারি স্লিপিং ব্যাগ পেতে শুয়ে পড়ে। রাতভর হা হা, হি হি, গল্প, হাসি, একে ওকে ভূতের ভয় দেখানো চলতে থাকে। ভোরবেলা ঘুমিয়ে কাদা। তা ওই মহিলা স্লাম্বার পার্টিতে গিয়ে হাজির হতেন। শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকে মটকা মেরে পড়ে থাকার কারণ হল ডক্টরেট পাবার জন্যে রসদ সংগ্রহ করা। ওয়াশিংটনের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করার সময় তিনি ৩০১ পৃষ্ঠার থিসিস লেখার জন্যে মোট ১১০ ঘণ্টা নানা স্লাম্বার পার্টিতে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে ছিলেন। জিনস আর সোয়েটার চাপিয়ে বগলে স্লিপিং ব্যাগ আর বালিশ নিয়ে হাজির হতেন।

সঙ্গে টুথপেস্ট, ব্রাশ আর নোটবই, পেনসিল। রাতভর জেগে থাকতে হবে বলে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিতেন। পি এইচ ডি করার ধকল কম নাকি? তারপর পার্টিতে বসে বসে উঠতি বয়সের মেয়েদের উচ্ছ্বাস পূর্ণ কথাবার্তা লাগাতার টুকতে হতো। কখনও জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্যে কিশোরীদের পেছন পেছন প্রথম রাতে উঠে আইসক্রিম পার্লারে গিয়ে বসতে হত। নয়তো সিনেমা হলে আড়ি পেতে বসে কোনও কিশোরের সঙ্গে কিশোরীর ফিসফাস কথা শুনে নিয়ে মুখস্থ করতে হত। গবেষণায় সব দরকার হয়।

তাঁর থিসিস আছে যে — কিশোরীরা স্লাম্বার পার্টিতে ভূতের গল্প বলতে আর শুনতে অসম্ভব ভালবাসে। এছাড়া তাদের নামে কে কোথায় কী কী ভালো আর মন্দ কথা রটিয়েছে সে সব নিয়ে আলোচনা করবেই। তারপর তারা কীভাবে কতরকম সমস্যার সমাধান নিজের বুদ্ধি দিয়েই করতে পারে, সেও অবশ্যই বলবে। এরপর আছে পরস্পরকে নিয়ে খেপানোর প্রবণতা। আজে বাজে নাম দিয়ে এ ওকে ডাকবে। ক্যাবলা চণ্ডী, বোকারাম, নেকু, মোটু ইত্যাদি নামে ডাকাডাকি চলবে। স্লাম্বার পার্টিতে হাস্যরসই মূল উপাদান। তা বলে একে ছ্যাবলামোর পর্যায়ে ফেলা যাবে না। এরা ছ্যাবলা কিশোরী নয়। স্লাম্বার পার্টির পরিবেশে এদের সূক্ষ্ম এবং আধুনিক রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আরও জানা যায় যে এরা অসহায় নারী জাতির উত্তরসূরি নয়। এরা মার্জিত ভাষায় কথা বলা বয়ঃসন্ধিক্ষণের মার্কিন ষোড়শী...

এত সব বিশ্লেষণ করে ওই মহিলা দিব্যি ডক্টরেট হয়ে বসেছেন। এখন আবার পোর্টল্যান্ডের স্টেট ইউনিভার্সিটিতে 'স্পিচ কমিউনিকেশন' বিভাগে পড়াচ্ছেন।

কোনও কোনও ডক্টরেট নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে তাঁদের গবেষণার বিষয়টি বেশ মামুলি পর্যায়ের। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ ভূষিমাল ছেড়েছেন বলে স্বীকার না করলেও, তাঁদের গবেষণার প্রসাদ না পৌঁছলে যে কোথাও কিছু খামতি হত, সে কথা মনে করেন না। আসলে তাঁদের খেদ এ জন্যে যে — গবেষণার উপযুক্ত নতুন বিষয় পাওয়াই ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। মনে করুন এই শতকের নাটক নিয়ে গবেষণা করতে চাইলেন। দেখবেন এমন কোনও ফাঁক ফোকর পাচ্ছেন না, যেখানে নতুন করে কিছু লেখার সুযোগ আছে। থিয়োরিতে থিয়োরিতে ছয়লাপ। তখন মাথা খাটিয়ে একটা উপায় বার করতে হবে। পি এইচ ডির থিসিস লিখুন 'থিয়েটারে প্রকৃতির প্রভাব' নিয়ে।

ব্যস গাদা গাদা সূত্র টেনে আনুন। শীতকালে লোকে বেশি নাটক দ্যাখে? নাকি গ্রীষ্মকালে? যাত্রা তো নাটকেরই মাসতুত ভাই। যাত্রা প্রসঙ্গে, গ্রামে গ্রামে নবান্নের ধান কাটা সারা হলে ফাঁকা মাঠ, মোটা শতরঞ্জি বিছানোর সুবিধে, বর্ষাকালে যাত্রা বন্ধ, শহরেও তখন গলিতে গলিতে জল জমে বলে থিয়েটারের মন্দা দশা, গ্রীষ্মকালে লোডশেডিং ও ভাঙা ফ্যানের ঘড় ঘড় আওয়াজে ডায়ালগ শুনতে না পাওয়ার ক্ষোভ ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে ৩৪০ পৃষ্ঠার থিসিস লিখে ফেলুন। তারই মধ্যে চালাকি করে নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যেও কোথায় কোথায় ঝড় বৃষ্টি, শীত, বসন্তের গান টান আছে, ঢুকিয়ে দেবেন। এক ঢিলে দুই পাখি। তারপর ২৫ জন বাঘা বাঘা নাট্য বিশেষজ্ঞের সামনে দাঁড়িয়ে পেপার পড়ার সময় যা একটু হাঁটু কাঁপার ব্যাপার থাকবে। তা বলে কি পি এইচ ডি আটকে থাকবে? এইভাবেই কত কিছু করা যায়। রাজপথের বদলে এঁদো গলি নিয়ে বাঁকুড়ার মন্দিরের বদলে বটতলার চাতাল নিয়ে? হাজার দুয়ারির বদলে চিলেকোঠার ছাদ নিয়ে রিসার্চ করছে না লোকে? আপনি জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করে দেখবেন। সেই দর্শন থেকেই পেয়ে যাবেন ডক্টর অফ ফিলজফি উপাধি।

তিন চার বছরের প্রচণ্ড পড়াশোনার পরে এদেশে একজন পি এইচ ডি করলেন 'শিক্ষা জগতে শিক্ষকের পোশাক ও সফলতা' নিয়ে। তিনি প্রমাণ করলেন — যেসব মাস্টারমশায়রা স্কুলে স্যুট টাই পরে যান, ছাত্ররা তাঁদের বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন আর পণ্ডিত বলে সমীহ করে। মামুলি জামাকাপড় পরলে সামান্য লোক বলে ভাবে। এ নিয়ে স্কুলে স্কুলে ঘুরে ছাত্রদের মতামত সংগ্রহ করেছিলেন। ভালো জামাকাপড় পরা দিদিমণিদেরও নাকি ছাত্রছাত্রীরা বেশি মান্য করে। ভালো বলতে সব সময় দামি নয়, ''ট্র্যাডিশনাল ড্রেস' বোঝায়। বছর দুই আগে ইস্কুলের হেডমাস্টারদের কর্মদক্ষতা নিয়ে পি এইচ ডি করতে গিয়ে একজন থিসিসে লিখলেন — কুঁড়ে আর ব্যায়াম বিমুখ হেডমাস্টার মোটেই ঠিক ভালোভাবে ইস্কুল চালাতে পারেন না। তার চেয়ে ব্যায়ামবীর হেডমাস্টারের কর্মক্ষমতা আর ভাবমূর্তি দুইই বেশি প্রশংসা পায়। বিষ্টু ঘোষমশাই ইতিহাস হয়ে গেলেও মনোতোষ রায় তো আছেন। পশ্চিমবাংলার শিক্ষা বিভাগ তাঁকে হেড অফ দ্য হেড মাস্টারস করে দিলে কেমন হয়? বিশ্বশ্রীর দৌলতে ইস্কুলে ইস্কুলে নির্ঘাৎ শান্তশ্রী বিরাজ করবে।

বছর তিনেক আগে এক মহিলা পি এইচ ডি করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ

কলোরাডো থেকে। এডুকেশন বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধের বিষয় ছিল — 'যাদুঘরে ডাইনোসেরাসের কঙ্কাল প্রশর্দন। বহু তথ্য, প্রমাণ সহযোগে লিখেছিলেন দায়সারা ভাবে ডাইনোসেরাস দেখা হয় না। যারা যাদুঘরে ঢুকে তীর আঁকা চিহ্ন ধরে ধরে এগোয় আর গোড়া থেকে ডাইনোর মুখদর্শন শুরু করে, তারা কত কিছু বেশি জানতে পারে। দাঁত, খুলি পর্যবেক্ষণেই বহুত সময় লেগে যায়। আর যারা কোনও নিয়ম মানে না, হন হন করে এঘর ওঘর দিয়ে ডাইনোর ঘরে এসে হাজির হয়, তাদের কোনও জ্ঞান হয় না। ল্যাজের দিকের কাঁটাগুলো দেখতে দেখতে উলটো পথে বেরিয়ে যায়। ডাইনোর জীবনী, বংশধারা, ইতিহাস জানা দূরে থাক, চোয়ালের গড়ন পর্যন্ত লক্ষ না করে অন্য ঘরে হাতি দেখতে চলে যায়। মহিলার বক্তব্য — যাদুঘরে বিশেষ করে ডাইনোর ঘরে আগু পিছু ঘুরে যে যতটা সময় কাটাতে পারবে, ক্ষুদে অক্ষরের সব লেখা খুঁটিয়ে মুখস্থ করবে, তার তত জ্ঞান বাড়বে। তবে দর্শকদের মানসিকতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ডাইনোর ইতিহাস পড়ার চেয়ে তার কঙ্কাল দেখতে দেখতে কল্পনায় তাকে সশরীরে দেখার প্রবণতা নাকি ভারী প্রবল থাকে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই।

এই তথ্য জোগাড় করতে মহিলা দু'বছর পরিশ্রম করেছেন। প্রধান কাজ ছিল যাদুঘরে গিয়ে দর্শকদের হাবভাব লক্ষ করা এবং খাতায় লিখে নেওয়া। তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। কথাবার্তা টেপ করেছেন। কে কতক্ষণ জীবজন্তুর মমি দেখে সময় কাটায় তার হিসেব রেখেছেন। এমনকি কাচের বাক্সের গায়ে নাক ঠেকিয়ে কে কতক্ষণ দাঁড়ায়, যারা কাচের গায়ে হাতের আঙুলের ছাপ ফেলে দাঁড়ায় — সব টুকে নিয়েছেন। নাকের ছাপ আর হাতের ছাপ থেকেই তো দর্শকের আগ্রহের গভীরতা, অনুসন্ধিৎসার প্রাবল্য ধরা পড়ে।

মহিলা এখন কলোরাডোতেই পড়াচ্ছেন। যাদুঘরে মৃত জীবজন্তু সাজিয়ে রাখার উপযুক্ত পন্থা প্রসঙ্গে কোর্স দেন। তাঁর থিসিসের উদ্দেশ্যে ছিল যাদুঘরের প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসাধারণকে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা। মোট ৪৯১ পৃষ্ঠার থিসিস লিখেছেন। খুব আশা করছেন যে আমেরিকার নানা যাদুঘরে সংরক্ষণকারী কর্মীরা সেটি পড়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন।

বড় বড় পাথর বেয়ে বেয়ে টিলায় চড়ে বা অভিযাত্রীদের আচরণ প্রসঙ্গে যে ছাত্রটি ওহায়ো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি করেছিল সেও কম পরিশ্রম করেনি। অনেকবার দলের পিছু পিছু হামাগুড়ি দিয়ে তাকে মিনি

কৈলাসে চড়তে হয়েছে। বিশেষ পর্যবেক্ষণের পরে সে নিজের থিসিসে লিখেছে — যারা ঘন ঘন টিলায় ওঠে আর বারোমাস অসমতল ভূমিতে বাস করে, তাদের দৌড় অনেক বেশি। আর যারা হুজুগে পড়ে হামাগুড়ি দিতে আসে একটুতেই তাদের দম ফুরিয়ে যায়। যতবার উঠবে, নামবে। তত চড়াই-এর ক্ষমতা বাড়বে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল অভিজ্ঞ আরোহীরা মোটেই সহজ পথে যেতে চায় না। বেশ খাড়াই পাথর আর বিপজ্জনক খাঁজে খোঁজে পা রেখে, গড়ানো পাথরের ওপরেই ব্যালেন্স করে করে অ্যাডভেঞ্চারে মেতে ওঠে। কিন্তু ভিতুরা একদম ঝুঁকি নিতে চায় না। দেখে শুনে মন্দিরের সিঁড়ির মতো চ্যাটালো পাথর বেছে নেয়। তাও হেঁটে ওঠার চেয়ে বরং উবু হয়ে বসে বসে ওঠে নয়তো হামাগুড়ি দিয়ে তেনজিং হতে চেষ্টা করে।

পি এইচ ডি পাবার পরে ছেলেটি এখন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটিতে 'বনভূমি নিয়ন্ত্রণ ও কর্মপন্থা বিষয়ে পড়াচ্ছে। সে স্পষ্টই বলেছে যে — তার থিসিস সম্পর্কে বেশিরভাগ লোকেরই কোনও আগ্রহ না থাকতে পারে। কিন্তু যারা মানুষের ক্রীড়ামূলক কার্যকলাপের পশ্চাৎপটে তার সামাজিক মনস্তত্ত্বের খবর পেতে চায়, তাদের কাছে এ থিসিসের মূল্য আছে।

একটি বিষয় স্পষ্টই বোঝা যায় যে এদেশে মানুষের আগ্রহ এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনও কিছুরই গুরুত্ব কম নয়। পরিণত বয়সেও বহু মানুষের পড়াশোনা করে পি এইচ ডি প্রোগ্রামে যুক্ত হচ্ছেন। চাকরি এবং সংসারের পরে উদ্বৃত্ত সময়ে কলেজ আর লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা আর তথ্য সংগ্রহ করছেন। তারপর বহু পরিশ্রমের পরে নিজের থিসিস জমা দিচ্ছেন। কোনও বিশেষ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান নিশ্চয়ই এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এবং অনুমোদন লাভ করছেন। বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে অন্তত সর্ষে প্রমাণ শস্যও দান করার অধিকারী হয়েছেন।

এই মানুষদের প্রবল জিজ্ঞাসা এবং অধ্যবসায়ের কথা চিন্তা করে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ প্রেরণা পাই। কিন্তু আমাদের বাঙালি মহলে এমন কাউকে পাই না, যিনি এই ধরনের বিষয় নিয়ে থিসিস করেছেন। আত্মীয়, বন্ধু মহলে যত ডঃ উপাধিকারী আছেন, তাঁদের গবেষণার বিষয়গুলো ছিল বড্ড খটোমটো। আমার সহপাঠী ছিল অমিতাভ বাগচি। সম্পর্কে আত্মীয়ও বটে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছিল। এখন এখানে সে ডঃ অমিতাভ। কি না, পার্টিকল ফিজিক্সে পি এইচ ডি করে বসে আছে। কানপুরে থাকতে একটি ইস্কুলে পড়া

ছাত্রকে চিনতাম। সে এখন এদেশে এসে হয়ে গেল ডঃ রণবীর বসু। কি না অপারেশন রিসার্চে পি এইচ ডি হয়ে বসে আছে। তার ভাই অরিজিৎ ছিল আরও ছোট। সে এসে করে বসল কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পি এইচ ডি। এখন এম আই টিতে পড়ায়। ফিলাডেলফিয়ার স্কুলে পড়া মেয়ে সুনন্দিতা ব্যানার্জি চোখের সামনে মলিকিউলার বায়োলজিতে ডক্টরেট সেরে ফেলল। বাঙালি মহলে শুধুই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, আর কমপিউটার সায়েন্সের খেলা। ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণাতেও ভারী আগ্রহ তাদের। এইসব রামধাক্কা খেয়ে আমি পিছু হঠতে থাকি। সত্যেন বসু, জগদীশ বসু ট্র্যাডিশনে আমার কোনও ঠাঁই নেই। মনে ভাবি এমন বাঙালি কাউকে কি খুঁজে পাব না যে বেশ একটা অভিনব বিষয়ে ডক্টরেট করেছে? ইদানীং একটা বিষয় যে আমার মাথায় দানা বেঁধে উঠেছে, উপযুক্ত সমঝদারের অভাবে আলোচনাই করতে পারছি না।

মানুষ ভালোমতো খুঁজলে কি না পায়? শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম এক বাঙালিনীকে। নামের আগে ডঃ লিখতে একদম ভোলেন না। মধ্যবয়সে সদ্য পি এইচ ডি শেষ করে ভারী গর্বে ঘুরে বেড়ান। বিষয়টাও দারুণ। 'ইতিহাসে ভারতীয় রমণীর কেশচর্চা।' চার বছর ধরে রসদ সংগ্রহের জন্যে অনবরত দেশে যেতেন। খাজুরাহো কোনারকের মূর্তির মাথায় চাকার মতো খোঁপা থেকে শুরু করে, সংস্কৃত সাহিত্যের এক বেণীধরা বিরহিনী নায়িকার প্রসঙ্গ তো আছেই। তারপর বিনুনির জালে আবদ্ধ চ্যাটালো খোঁপা, বিড়ে খোঁপা, হাত খোঁপা, এলো খোঁপা, বড়ি খোঁপা, মন্থরা ঝুঁটি, কী নেই? কেশচর্চার মধ্যে বব ছাঁট, কদম ছাঁট, বাবরি — সব টেনে এনেছেন। চুলে ডক্টরেট। 'বঙ্গ সম্মেলন'-এর সেমিনারে 'নারী প্রসঙ্গে' বলতে ডাকেনি বলে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ। গোঁফ দিয়ে যদি পুরুষকে চেনা যায়, তবে নিঃসন্দেহে চুল দিয়ে নারীকে। তবে কোন সাহসে উদ্যোক্তারা ডঃ মরালী মজুমদারকে বাদ দিয়ে নারীদের নিয়ে সেমিনারে করে?

ডঃ মরালী আমার মনে চাপা উৎসাহ জুগিয়েছেন। ভাবছি নিজের নামের আগে একটা ডঃ জুড়ে নেওয়া যায় না? নাঃ ফাঁকি দিয়ে কোনও অলঙ্কার নেব না। রীতিমতো পরিশ্রম আর পড়াশোনা করতে হবে। বিষয়টা এমন বেছেছি যে এমনিতেই বেশ জ্ঞান আছে আমার। এর ওপর রসায়নবিদ আর সাবান কোম্পানির লোকেদের উপদেষ্টা হিসেবে পেলেই যথেষ্ট। বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও নেহাত কম হয়নি। আগে তো ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে হাজির হই। একে একে সব করে ছাড়ব।

গবেষণার বিষয় ভেবেছি — 'ইমিগ্র্যান্ট বাঙালি রমণী ও ক্ষার পদার্থ।' এ নিয়ে গভীর চিন্তার সুযোগ আছে। এই যে আমরা দেশে থাকতে কখনও গাদা গাদা বাসন মাজিনি, গোলা সাবান দিয়ে বস্তা বস্তা কাপড় কাচিনি, নানা সলিড লিকুইড ডিটারজেন্ট ঢেলে সারা বাড়ির মেঝে, বাথরুম, বেসিন, কমোড, বাথটব, টাইলস, সানমাইকার কাউন্টার ঘষে মেজে ঝকঝকে করিনি, কার্পেটের ওপর যত রাজ্যের ছাপ রগড়ে রগড়ে ওঠাইনি, রান্নাঘরে তেল মশলার ছোপ সাফ সুতরো করিনি, আভেনের মধ্যে জমে ওঠা গ্রিজ, ক্যাবিনেটের বুকে আটকে থাকা পাঁচফোড়নের দানা, স্টোভের মুখে ছিটকে পড়া তেলের দাগ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করিনি, অথবা মাছের আঁশটে গন্ধ তাড়াতে ব্লিচিং পাউডার মাখানো স্পঞ্জ দিয়ে ঘষিনি — এর কারণ নিয়ে অনেক কথা লেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক পটভূমি, কাজের লোকের সুবিধে, তাদের মধ্যে জাগরণের অভাব, কংগ্রেসি রাজ্যে ফিউড্যালিজম্, মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীর আলস্য, মেদিনীপুরে লাগাতার বন্যা ও অন্য জায়গায় খরার রুটিন, বাস্তুহারা সমস্যা ইত্যাদি ছাড়াও কলতলায় তেঁতুল ও ছাই সহযোগে বাসন মাজার সাবেকি প্রথা, সমাজে ধোপার অবদান, 'মেথর' কবিতার সারাংশ মিলিয়ে মিশিয়ে অনেক লিখে যাব। তারপর আনব পাশ্চাত্য প্রসঙ্গ। প্রবাসে বঙ্গ রমণীর নিঃসঙ্গতা। খাদ্য রুচি এবং কর্মে অধিকার। ধনতান্ত্রিক দেশে সমাজ তন্ত্রের জয়গান। আমি আছি গৃহবাসে তাই আছে রুচি... গান্ধীজি ও অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি ইত্যাদি ক্রমশ আসবে ক্ষার প্রসঙ্গ। তার গুণাগুণ কম জানি আমি? ডিসার্টেশনের সময় চারশো পাতার থিসিস নিয়ে দাঁড়াতে পারব না? সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, রসায়নবিদ, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ আর সাবান কোম্পানির লোকজন, মিলিয়ে পঁচিশ জন হয়ে যাবে নির্ঘাৎ। যদি সানফোরাইজ্ড মার্কা একখানা থিসিস ঠুকে দিতে পারি, ডঃ মরালী মজুমদারের কাছে মান বাঁচবে। অমিতাভ, রণবীর, অরিজিত, সুনন্দিতাদের মতো বাঘা বাঘা সাবজেক্টে ঢোকার ক্ষমতা না থাক, সাবানের ফেনা নিয়ে ফেনাতে পারব না? ওরা বিজ্ঞানের পথে গেছে। ডঃ মরালী গেছেন নারীর কেশবন্ধনের জগতে। আমি চলে যাব মার্জন ও ঘর্ষণের গবেষণায়। তারপরেও তো সেই 'দর্শনের'ই ডিগ্রি পেয়ে যাব। ডক্টর অফ ফিলজফি। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে সাবান জলের বুদবুদ উড়িয়ে দিয়ে যাব।

আমেরিকায় নিরীশ্বরবাদী লেখক

নাস্তিকদের নাকি বিশ্বাস করা যায় না। যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, তাদের সম্পর্কে আমেরিকার নব্বই শতাংশ আস্তিক লোকের কিছু সংশয় আছে। আমেরিকায় নাস্তিক্যবাদ নেই — এমন কথা কোন যুগে লিখেছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রনেতা ও দার্শনিক বেনজ্যামিন ফ্লাংক্লিন। ১৭৮২ সালে তিনি বিদেশিদের এখানে বসবাসের আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন — আমেরিকায় নিরীশ্বরবাদের অস্তিত্ব নেই। বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার ঘটনা শোনাই যায় না। যদি বা ঘটে, তা গোপন থাকে। সুতরাং যারা এ দেশে সারাজীবন বাস করবে, তারা সম্ভবত কোনও দিনই নাস্তিক অথবা বিশ্বাসঘাতক লোকেদের সংস্পর্শে আসবে না।

এত বছর পরেও দেখা যাচ্ছে এ দেশে নাস্তিক্যবাদীরা নেহাতই সংখ্যালঘু। মাত্র এক শতাংশ লোক ঈশ্বর অথবা কোনও ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস করে না। এদের মধ্যেই কিছু বিদগ্ধ তথা ধর্মবিশ্বাসহীন পণ্ডিত লোক বিতর্কমূলক বই লিখে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। বেস্ট সেলার বই-এর তালিকা আর বই বিক্রির হিসেব থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে রিচার্ড ডকিন্স-এর "দ্য গড ডিলিউশন" বইটির কথা ধরা যাক। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার বেস্ট সেলার বই-এর তালিকায় "দ্য গড ডিলিউশন" গত মাসেও ছিল দশ নম্বরে। এছাড়া ইন্টারনেটে অ্যামাজন কম-এ ছিল সাত নম্বরে। স্যাম হ্যারিস নামে আর একজন লেখকের ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত তর্কমূলক বই এর নাম "লেটার টু আ ক্রিশ্চান নেশন" এ বছরে প্রচুর বিক্রি হয়েছে। স্যাম হ্যারিসের লেখা "দ্যা এন্ড অফ ফেইথ, রিলিজিয়ন, টেরর অ্যান্ড দ্য ফিউচার অফ রিজন্" দু'বছর আগে বেস্ট সেলার তালিকায় উঠেছিল।

২০০৫-এর শেষে প্রকাশিত হল ড্যানিয়েল ডেনেটের "ব্রেকিং দ্য স্পেল ঃ রিলিজয়ন অ্যাজ এ ন্যাচারাল ফেনোমেনন"। ডারউইনের বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে ডেনেট জীবজন্মরহস্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আস্তিক সমাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা সত্ত্বেও বইটির আশাতীত চাহিদা হয়েছে। মনুষ্যজন্মের আধ্যাত্মিক কার্যকারণ বোঝার চেয়ে, বাঁদর থেকে মানুষ হওয়ার থিয়োরি যে ভারী সরল এতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তাই সোজা কথায় পাঠক বইটি ভালোই খেয়েছে। এসব বই ছাড়াও এন পি আর ওয়েবসাইটে নিয়মিত পড়া যাচ্ছে "দিস আই বিলিভ" নামে গল্পগুচ্ছ। লিখেছেন এক নাস্তিক জাদুকর পেন জিলেট। ভগবান যে নেই তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি লাগাতার লিখে যাচ্ছেন। লোকেরা আগ্রহ নিয়ে পড়ছে।

তাহলে আস্তিক লোকেরাও কি কৌতূহলী হয়ে বইগুলো পড়ছে? দেশের মাত্র ১% লোক যদি নিরীশ্বরবাদী আর ৯% লোক নাস্তিক/অনাস্তিক কিছুই না হয়, তব বইগুলোকে বেস্ট সেলার বলা হচ্ছে কোন্ পাঠকদের ভিত্তিতে? এ বিষয়ে নিরীশ্বরবাদী লেখকদের বক্তব্য — লোকেরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সত্যি কথা বলে না। মুখে বলে ভগবান মানি। মনে মনে সন্দেহ থাকে। ক্রিস্টোফার হিচেন নামে এক ব্রিটিশ লেখক "গড ইজ নট গ্রেট" নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি যখনই ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে টিভিতে "টক-শো" করেন, তখনই সব থেকে বেশি দর্শক পান। এবং সবচেয়ে প্রশংসা পান। অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা দিলে এত সাড়া জাগে না। এসব অবশ্য এঁদের নিজস্ব ধারণা। গণসমীক্ষা নিলে দেখা যায় ধর্মভীরু লোকের সংখ্যা সেই নব্বই শতাংশের মতোই আছে। তবে এ কথা ঠিক যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আস্তিকদের মধ্যেও বিশ্বাসের তারতম্য আছে। সম্প্রতি কিছু সংখ্যক লোকের মতামত অনুযায়ী একটি সমীক্ষার ফলাফল হচ্ছে, এদের মধ্যে ৪২% প্রাপ্তবয়স্ক লোক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত নয়। তিন বছর আগে ৩৪% লোক এরকম মনে কত। অর্থাৎ, এরা সংশয়ের দোলাচলে আছে।

এমন হতে পারে, সারা বিশ্বে ধর্মের নামে এত হানাহানি আর রক্তপাত দেখে এদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সংশয় দেখা দিচ্ছে।। "দ্য গড ডিলিউশান'-এর লেখক রিচার্ড ডকিন্স সেরকমই মনে করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "পাবলিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব সায়েন্স" পড়ান। তাঁর বক্তব্য — আমেরিকায় বুশের জমানায় একদিকে যেমন ক্রিশ্চান

থিয়োক্রেসি বা ধর্মতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করছে, অন্যদিকে সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলামের মৌলবাদ প্রবলভাবে বিদ্বেষ ও হিংসা প্রচার করছে। এই পরস্পরবিরোধী ধর্মশক্তি যেন পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। দু'পক্ষের চরমপন্থী মনোভাবের দাপটে অশান্তি বেড়ে চলেছে। যার ফলে, উদার চিন্তাধারার ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোকেদের মনে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহ জাগছে। চরমপন্থীদের এ কোনও সাময়িক প্রবণতা বা বিচ্যুতি নয়, ধর্মের নামে বারে বারে এমন ঘটনা ঘটছে।

প্রশ্ন, রিচার্ড ডকিন্স-এর মতো নিরীশ্ববাদী লেখকরা কি কোনও নতুন কথা বলছেন? নাকি ভোলটেয়ার অথবা জার্মান দার্শনিক নিটসের চিন্তাধারার অনুসরণ নতুন সংশয়বাদ প্রচার করছে? ভোলটেয়ারের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরসের বিশ্লেষণ অথবা নিটসের মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা কি এঁদের মতবাদ ও রচনাকে প্রভাবিত করছে?

দেখা যাচ্ছে, নবনাস্তিকদের চিন্তাধারা অনুযায়ী সর্বধর্ম পরিত্যাজ্যই বোধ হয় সার কথা। এঁরা বলছেন, ধর্ম শুধু মানুষের মননশক্তিকে দুর্বল করে না, নৈতিক দিক থেকেও এর কোনও উপযোগিতা নেই। সামাজিক দিক থেকে ধর্মের কোনও প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বড় কথা, ধর্মই এখন জীবন বিপন্ন করছে। মানুষের বেঁচে থাকা আর আত্মরক্ষার লড়াই-এ ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু।

ভোলটেয়ার বলেছিলেন ধর্মের নামে অন্যায়, অপরাধ দূর করতে হবে। আমেরিকার স্থাপক রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে কয়েকজন, বিশেষত তৃতীয় রাষ্ট্রপতি থমাস জেফারসনও চেয়েছিলেন — যৌক্তিক একেশ্বরবাদ এবং দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয়ই হবে ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা। সেখানে এক অদৃশ্য মহাশক্তি এবং তাঁর সৃষ্টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক ঘটনা, অজস্র দৈব অভিজ্ঞতার কাহিনী, নীতি, উপদেশ ইত্যাদি বর্জন করতে হবে। কেননা, যা যুক্তি বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তা ধর্ম নয়।

কিন্তু এ যুগের নবনাস্তিকদের কাছে ধর্মের ওই সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়। যৌক্তিক একেশ্বরবাদ ও দার্শনিক ব্যাখ্যা তাঁদের বিচারে অযৌক্তিক। ডকিন্স অথবা স্যাম হ্যারিস তাঁদের বইতে সেই কথা লিখেছেন। যদিও হ্যারিস স্বীকার করেছেন — প্রাচ্য ধর্মের কিছু আধ্যাত্মিক নীতি-নির্দেশ ও নিয়মশৃঙ্খলাকে অনুসরণ করা যেতে পারে। কারণ, মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে তা সাহায্য

করে। কিন্তু দুই লেখকই একটি বিষয়ে দৃঢ়মত পোষণ করছেন। তা হল — ধর্মের ভূমিকাকে সীমিত নয়, সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা দরকার।

মডারেট রিলিজিয়ানকেই মৌলবাদীরা সুযোগ বুঝে ব্যবহার করছে। যখন বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে, তখন এরা জনমানসে কৌশলে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ধর্মের নামে বিধিনিষেধ, কুসংস্কার, পরমত অসহিষ্ণুতা এবং নির্বিচারে আনুগত্য শেখায়। এরাই জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। এদের উপদেশ হল, বৈজ্ঞানিক মতবাদ বা তত্ত্বকে বিচারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা বা যাচাই করার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে তা অনাবশ্যক। ধর্মকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে হয়। লেখক স্যাম হ্যারিসের বক্তব্য — এভাবেই মৌলবাদীরা সাধারণ অর্থে ধর্মভীরু লোকেদের মগজ ধোলাই করে। কিন্তু ধর্মভয় যদি না থাকে, তখন তো আর এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে যাবে না। অতএব ধর্মকে বাদ দিলেই সমাজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল হবে। হ্যারিস নিজে নিউরোসায়েন্সে মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আর নিজের ঠিকানা গোপন রেখেছেন। বোধহয় ইসলাম মৌলবাদীদের ভয়ে। কারণ, বইতে তাঁদের সম্পর্কে এত দুর্বাক্য লিখেছেন যে, সমাজের মঙ্গল করতে গিয়ে তাঁর পক্ষে লুকিয়ে থাকাই মঙ্গল।

ধর্ম আর বিজ্ঞানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে বই লিখেছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত জীববিজ্ঞানী স্টিফেন জে গোওল্ড। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল — এই দুই প্রমাণ্য বিষয় কখনও পরস্পরকে অতিক্রম করেনি। দুই-ই স্বমহিমায় থেকে পরস্পরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু স্টিফেন জে গোওল্ড-এর বিশ্লেষণ নবনাস্তিকদের পছন্দ নয়। ডকিন্স বলছেন ধর্মের আধিপত্য চিরকাল তার গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধর্মের অলৌকিক আবরণ দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু ডকিন্স-এর লেখায় দার্শনিক ভাবনা-চিন্তার বিশেষ প্রতিফলন নেই। সেদিক থেকে ইংরেজ দার্শনিক ফ্র্যান্সিস বেকনের বিখ্যাত উদ্ধৃতিটির তুলনা দেওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন — সামান্য একটু দর্শন বা ফিলসফি মানুষের মনকে নাস্তিকতার দিকে চালনা করে। কিন্তু সেই মন যখন দর্শনের গভীরে প্রবেশ করে, তখন ধীরে ধীরে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়।

ডকিন্স এবং অন্যান্য নবনাস্তিক লেখকদের রচনাগুলি যে পাঠযোগ্য

হয়েছে, তার একটি কারণ তাঁদের চ্যালেঞ্জের বিষয় এবং মোকাবিলার ধরন বা স্টাইল। এঁরা আস্তিক লোকেদের নির্বিচারে বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলছেন, এরা মনে করে ধর্মই শুধুমাত্র নৈতিক এবং উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের পথ দেখায়। অথচ ডকিন্স ও অন্যান্য লেখকরা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন — আমেরিকার যেসব রাজ্যে অধিক সংখ্যক ধার্মিক লোকের বসবাস, সেখানেই অনৈতিক কাজকর্ম বেশি ঘটে।

কিন্তু আমেরিকার রিলিজিয়নিস্ট বা ধর্মের সমর্থকরা ওই হিসেব বা তথ্যকে অসংগত এবং লেখকদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা বলে মনে করছেন। তাঁরাও গণসমীক্ষা ও পরিসংখ্যন ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করতে চাইছেন — ধর্মভীরু লোকেদের আচার-ব্যবহার নাস্তিকদের চেয়ে অনেক ভালো হয়। একদিকে এঁরা বলছেন — ধর্মের শিক্ষা এবং উপদেশই মানুষকে সমাজের উপযোগী করে তোলে। ধর্মনিষ্ঠ মানুষ সমাজের উপকারে লাগে। অন্যদিকে, ডকিন্সের মতো লেখকদের বক্তব্য — ধর্মের সঙ্গে "ভালোমানুষ" হয়ে ওঠার কোন সম্পর্ক নেই। কোনও লোকের সামাজিক অবদান, নৈতিক চরিত্র কখনই ধর্মের ওপর নির্ভর করে না। সবই তার নিজস্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এখানে নাস্তিক-আস্তিকের কোনও ব্যাপার নেই। হ্যারিসের বইতে আছে — ধর্মের যুক্তি দিয়ে মহামারী প্রতিরোধের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা-ও অনৈতিক কাজ। এইডস্-এর সংক্রমণ ঠেকাতে জন্মনিরোধক কনডোম বিলি করতে গিয়ে ভলানটিয়াররা বাধা পাচ্ছে। ক্রিশ্চান সমাজের গোঁড়া লোকজন সেখানে গিয়ে আন্দোলন করছে। নীতিবাগীশরাও ওই লজ্জাকর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে। ধার্মিকরা চিরকাল নীতিকথা শোনাতে পারে। প্রচুর জ্ঞান আর উপদেশ দিতে পারে। কিন্তু মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে না।

এইসব কারণ ও যুক্তি দেখিয়ে নবনাস্তিক লেখকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে — ধর্ম যেহেতু সমাজের কোনও উপকার করছে না, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এবার তার বিদায় নেওয়া উচিত। তাঁরা এ কথা জানেন যে রাজনৈতিক আদেশ দিয়ে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া যাবে না। একমাত্র পথ নাস্তিকের রুখে দাঁড়ানো। ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠা। এঁদের মধ্যে হিচেন্স্ নামে এক লেখক অবশ্য তেমন আশাবাদী নন। তাঁর ধারণা, ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা সম্ভব নয়। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে।

'ব্রেকিং দ্য স্পেল"-এর লেখক ড্যানিয়েল ডেনেট লিখছেন — আমি ধর্মবিশ্বাসী লোকেদের সঙ্গে আপস করতে রাজি আছি যদি তারা যুক্তিতর্কে আগ্রহী থাকে। ভগবান কবে কী বলে গেছেন, কেন তা নীতিকথা বলে অন্ধের মতো মেনে নেওয়া হচ্ছে, তার যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ চাই। আমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী তাদের সেই ঈশ্বরবাক্যের ব্যাখ্যা, প্রমাণ সব কিছু দিতে হবে। যুক্তিই প্রধান কথা।

এঁদের বইগুলি বিক্রিও যেমন হচ্ছে, তেমন বিরূপ সমালোচনাও শোনা যাচ্ছে। ধর্মকে অভিযুক্ত করতে গিয়ে তাঁরাই এখন বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের দায়ে পড়েছেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট রাইট বলেছেন — ধর্মকে যদি পৃথিবী থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়, তাহলেই কি যুদ্ধবিগ্রহ থেমে যাবে? জোট বেঁধে লড়াই করা বন্ধ হবে? জাতীয়তাবাদও পশুর জন্ম দিতে পারে। মানুষকে হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করতে পারে। অধ্যাপক রাইট তাঁর "দ্য এভলিউশন অফ গড" নামে বইতে ধর্মের পরিবর্তন ও বিবর্তন সম্পর্কে লিখছেন। তাঁর বক্তব্য জাগতিক এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুযায়ী ধর্মীয় অনুশাসন এবং বাইবেলের বাণীগুলির ব্যাখ্যা হয়। ধর্মযুদ্ধের পরিস্থিতিও সেইভাবে সৃষ্টি হয়। জোট বেঁধে লড়াই করার পরিবর্তে কীভাবে এই সংঘাতকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ধর্মের অন্ধ আবেগ, উত্তেজনাকে প্রশমিত করা যায়, এখন সেই গবেষণার ওপরেই গুরুত্ব দিতে হবে। "ঈশ্বর নেই" বলে প্রচার করার অর্থ — আমেরিকার এই সভ্যসমাজ গড়ে তোলার মূলে ধর্মের আদর্শ ও শিক্ষাকে অস্বীকার করা। আমরা তা সমর্থন করি না।

ধর্মহীন রাষ্ট্র যে নৈতিকতার বিচারে কোন পর্যায়ে নামতে পারে, লন্ডনে ভূতপূর্ব রাশিয়ান স্পাই অ্যালেকজান্ডার লিটভিনেনকোর ভয়ংকর পরিণতি তার প্রমাণ। কেজিবির এই প্রাক্তন গুপ্তচর বিষাক্ত রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থের সংক্রমণে লন্ডনের হাসপাতালে মারা গেলেন। শেষ সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে গেছেন। এবং দায়ী করেছেন রাশিয়ার সরকার ও রাষ্ট্রনেতাকে। নবনাস্তিকদের ইচ্ছে অনুযায়ী ঈশ্বরকে নির্বাসনে পাঠালেও যুদ্ধবিগ্রহ কি কখনও থামবে?

অরণ্যের অধিকারী

আমাদের শহরে এ বছরে মোট তিনটি ভাল্লুক ঢুঁ মেরে গেছে। এদের সঙ্গে সার্কাস পার্টির কোনও সম্পর্ক নেই। ডুগডুগির তালে তালে পথে ঘাটে পা তুলে তুলে নেচে বেড়ানোর ট্রেনিংও এদের নেই। একেবারে সোজা বন থেকে বেরিয়ে পড়ে একা একা উদাসভাবে হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির। প্রতিবছর কাছাকাছি জঙ্গল থেকে দুটো চারটে ভাল্লুক এদিকে বেড়াতে চলে আসে। আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হয়নি বটে। তবে স্থানীয় কাগজে ছবি দেখেছি। হাইওয়ের চলন্ত ট্র্যাফিকের মাঝে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাল্লুক। কখনও শপিং সেন্টারে বিশাল পার্কিং লটে আনমনে হাঁটছে। বন্ধু মেরি অ্যান থাকে পাশের শহর পমপটন লেকসে। ওর প্রতিবেশীর বাগানে ঢুকে গারবেজ ক্যানের ঢাকনা তুলে একটা ভাল্লুক মা উৎসাহে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। সারা পাড়ার লোক ফোনে ফোনে বার্তা পেয়ে যে যার রান্নাঘরের জানলা ধরে স্ট্যাচু। মেরি অ্যানও নিজের চোখে দেখেছিল, কীভাবে ব্যর্থ মনোরথ ভাল্লুক ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গিয়েছিল। পার্ক রেঞ্জার খবর পেয়ে এসে তার টিকিও দেখতে পায়নি।

নিউজার্সির উত্তর অংশের পাহাড় জঙ্গলে ভাল্লুকদের বহুকালের বসবাস। বনবিভাগের হিসেব অনুযায়ী কাছাকাছি কয়েকটি রিজার্ভেশন মিলিয়ে তিনশোর বেশি ভাল্লুক আছে। এখান থেকে পনেরো মাইল উত্তরে গেলেই তাদের সাম্রাজ্য শুরু হয়ে যায়। ওদের কাছে নাকি পনেরো, কুড়ি মাইল কোনও ব্যাপার নয়। শীতকালের শেষে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হলে মাঝে মাঝে পদব্রজে বেরিয়ে পড়া আর লেকের জলে নেমে মাছ চুরি, লোকালয়ে হানা

দিয়ে খাবার দাবার হাতানোর চেষ্টা — এসব ওরা বরাবরই করে আসছে। আগে আগে শহরে ভাল্লুক এসেছে শুনে বিশ্বাস হত না। তারপর খবরের কাগজে হুমদো ভাল্লুকের স্থির চিত্র আর স্থানীয় টি ভি-তে তার গড়াগড়ি দেওয়া, ঘুমের ওষুধ মাখানো তীর খেয়ে ঘুমঘোরে চ্যাংদোলা অবস্থায় ফরেস্ট রেঞ্জারের গাড়িতে উঠে অরণ্যে ফিরে যাওয়া — এসব দেখতে দেখতে এখন আর আশ্চর্য হই না। আমাদের ভয় পাওয়াও বারণ। তাতে নাকি ভাল্লুকের বিপদ হতে পারে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আর 'জীবে-প্রেম' থিওরিতে নিবেদিত প্রাণ লোকেরা বলে দিয়েছে — ভাল্লুককে দেখে ভয় পাবে না। তাকে ভয় দেখাবে না। সে লোকালয়ে আসতেই পারে। একে তো শীতের শেষে জমা খাবারের স্টক শেষ। মরা ডালে ফল পাকুড় ধরেনি। লেকের জল জমে বরফ না হলেও মাছ ধরা শক্ত। তখন ভাল্লুকে পেটের দায়ে শহরে আসবে না? এলেও কিছু তোমাদের বুকে জাপটে ধরছে না! আপন মনে পথে ঘাটে খাবার খুঁজে যাচ্ছে। হাইওয়েতে তাকে চাপা না দিয়ে গাড়ি নিয়ে কেৎরে বেরিয়ে যাবে। হাঁটা পথে মুখোমুখি হলে তুমিও সহজভাবে হেঁটে চলে যাবে। তোমার গায়ে কিছু মহুয়ার গন্ধ বেরয় না যে বুনো ভাল্লুক তোমাকে খেয়ে মাতাল হবার তাল করবে। বাড়ির গারবেজ ক্যানে কখনও বাসি খাবার জমিও না। ভাল্লুকের প্রলোভন হতে পারে। তখন সে টেনে টেনে সেসব বের করতে চাইলে ঢিল মারা, চ্যালাকাঠ ছুড়ে মারার চেষ্টা তো করবেই না, তাতেই বরং সে তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করতে চাইবে। বন্দুক চালালে তো নির্ঘাৎ জেলের রুটি বরাদ্দ হয়ে যাবে। তবে তোমার কর্তব্য কী? শহরের পার্ক অ্যান্ড রিক্রিয়েশন বিভাগকে ফোন করে ভাল্লুক সংবাদ জানিয়ে দেওয়াই নাগরিকের একমাত্র কর্তব্য। তারপর তারা রেডিও মেসেজ, ওয়াকিটকি, ফার্স্ট এইড বক্স (অবশ্যই ভাল্লুকের জন্যে) ঘুমপাড়ানি ওষুধ সহযোগে কাজে নেমে পড়বে। দূর থেকে পটাশ করে ওষুধের তীর মেরে দিলেই ভাল্লুক ধরাশায়ী। তখন রেঞ্জারদের সাহস দেখে কে? কোলে মাথা নিয়ে বসে আছে একজন। অন্যজন ভাল্লুকের কানের সঙ্গে সেলাই করা নম্বর দেখে মিলিয়ে নিচ্ছে সে কোন বন থেকে এসেছে, রেকর্ড মিলিয়ে দেখা হচ্ছে তার জীবনী। ইতিহাস, ওজন, লোমের ঘনত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি হিসেবমতো মিলছে কি না। তারপর চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তুলে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া। ঘণ্টা দুই পরে তন্দ্রা ভাঙলে ভাল্লুক দেখবে সে আবার নিজের ডেরায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। অবশ্যই ফল মূল, মাছ,

রুটি ইত্যাদি বস্তা করে রেখে যাবে রেঞ্জাররাই। সাধারণত একবার নাগরিক অভিজ্ঞতার পরে সে বছরে আর সে ও পথ মাড়ায় না।

একবার স্থানীয় টি ভি চ্যানেলে রেঞ্জারদের সঙ্গে একদল মায়ের কী ঝগড়া লেগে গেল। এভাবে হঠাৎ ভাল্লুক হানা দিলে বাচ্চাদের বিপদ হতে কতক্ষণ? কেনই বা কাছাকাছি জঙ্গল থেকে সব কটাকে আমেরিকার অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে না? ক্রমশ শহরের পরিধি বেড়ে যচ্ছে। মানুষের প্রাণের কথা ভেবেও জঙ্গল থেকে হিংস্র জন্তুদের বাস ওঠানো দরকার। কিন্তু রেঞ্জার থেকে শুরু করে ভাল্লুকপ্রেমী দল কেউ কিছুতেই মানতে রাজি নয় যে, ভাল্লুক কাউকে খুন করতে আসে। তাদের এক কথা — ভালুক জানে বাসতে ভালো। আজ পর্যন্ত লোকালয়ে এসে তারা কোনওদিন কাউকে বুকে পিষে মারতে চায়নি। আঁচড়ে কামড়ে দেয়নি। কালে ভদ্রে একটা দুটো ভাল্লুক টহল মেরে যায়। এনিয়ে এত উত্তেজনার কী আছে? কথাটা সত্যি। এই শহরে আছি আজ আঠারো বছর। ভাল্লুকের আনাগোনার খবর শুনেছি তার মধ্যে অনন্তপক্ষে দশবার। কিন্তু কোনও উপদ্রব করেছে বলে শুনিনি। তবে ভয় পাওয়ার এক্তিয়ার থাকবে না, এমন সৃষ্টি ছাড়া আবদার মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। এরা আমেরিকার সেই ভয়ংকর গ্রিজলি বেয়ার না হলেও বড় বড় বুনো ভাল্লুক তো বটেই। আক্রমণ করবে না বলে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নাকি? তবে, ওই কালে ভদ্রেই আবির্ভাব ঘটে আর লোকালয়ে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় বলে রক্ষে।

এদিকে ভাল্লুক তো ওদিকে নেকড়ের জন্যে হামদর্দ। ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে 'নেকড়ে বাড়াও' অভিযান নিয়ে তর্ক বিতর্ক জমে উঠেছে। ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস আর পরিবেশ সংরক্ষণকারী দল মিলে সমস্বরে জিগির তুলেছে — ইয়েলোস্টোন পার্কে আর পশ্চিমের বন জঙ্গলে নেকড়ের বংশবৃদ্ধি হওয়া নাকি বিশেষ জরুরি। কিন্তু সেখানকার খেত খামারের মালিকরা রেগে খুন! হাঁস, মুরগি, শুয়োর, গোরু, বাছুর, ভেড়া প্রতিপালন করতে গেলে নেকড়ের অত্যাচার সহ্য করা যায়? নেকড়ের বংশ বৃদ্ধি মানে ভেড়াদের লাগাতার স্বর্গপ্রাপ্তি।

কিন্তু মনট্যানা স্টেটের এক পরিবেশ সংরক্ষণকারী ভদ্রলোক নেকড়েদের মঙ্গলের জন্যে দারুণ এক উপায় আবিষ্কার করেছেন। তাঁর নাম হ্যাংক ফিশার। তাঁর বক্তব্য — উপযুক্ত পুরস্কার পেলে খামারবাড়ির

মালিকরাই নেকড়েদের আহ্বান করে আনবে। হ্যাংকের পরামর্শ "ডিফেন্ডার অফ ওয়াইল্ড লাইফ" নামে একটি সংস্থা নেকড়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে। শর্ত হচ্ছে —যদি কোনও জমির মালিক দেখাতে পারেন যে তাঁর নিজস্ব জমিতে এক দঙ্গল নেকড়ের বাচ্চা খেয়ে দেয়ে বড় হচ্ছে এবং বহাল তবিয়তে আছে, তবে তিনি পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার পাবেন। তবে পুরস্কারের লোভে দু-চারদিনের জন্যে নেকড়ে ছানাদের খুব আদর যত্ন করলে হবে না। পাঁচ হাজার ডলার হাতিয়ে নিয়েই তাদের খেদিয়ে দেওয়া হল — এ চালাকি চলবে না। মাঝে মাঝেই ইউ এস ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিসের কর্মচারীর পরীক্ষা করতে আসবে। খামার বাড়ি সংলগ্ন বন বাদাড়ে ঢুকে ঢুকে দেখে আসবে সেই নেকড়ের দল গোকুলে বাড়ছে কি না।

ডিফেন্ডার অফ ওয়াইল্ড লাইফ অবশ্য আগে এরকম অভিনব পন্থার কথা চিন্তা করেনি। গত বছরে তারা আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছিল। ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে নেকড়েদের বংশবৃদ্ধির দাবি নিয়ে সরকারকে খুব নাড়া দেবার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু ফ্র্যাংক ফিশারের পরিকল্পনায় কোনও ফাঁকি নেই। এমন টোপ ফেলা হয়েছে যাতে র‍্যান্‌চের মালিকরা মহা উৎসাহে নেকড়ে ছানা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। তাদের ধরে বেঁধে এনে নিজের জমিতে থাকতে দেয়। খুবই 'অস্তিত্ববাচক' পরিকল্পনা! এছাড়া যদি কোনও খামার বাড়িতে নেকড়েদের লোভের শিকার হয়ে হাঁস মুরগি, ভেড়াদের প্রাণবধ হয়, তবে প্রমাণ দেখাতে পারলে মালিক তার জন্যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন। ওই সংস্থা এই ক্ষতিপূরণের জন্যে এ পর্যন্ত এক লক্ষ ডলার চাঁদা তুলেছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এঁরা দশজন মালিককে মোট বারো হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন।

এখনও পর্যন্ত এরকম পরিকল্পনা কতদূর সফল হবে বলা শক্ত। তবে নেকড়ে পুরস্কার আর ভেড়ার ক্ষতিপূরণ পেলে জমির মালিকরা নিশ্চয়ই নেকড়ে বাহিনীকে বিপদের বদলে সম্পদ বলেই ভাবতে শুরু করবেন। র‍্যানচারদের কোনও আর্থিক ক্ষতি হবার প্রশ্ন নেই। ওদিকে যাঁরা নেকড়ে বাড়াও অভিযানে মেতে উঠেছেন, তাঁদের তোলা চাঁদা থেকে সব খরচও উঠে যাবে। ডিফেন্ডারস অফ ওয়াইল্ড লাইফ সেদিক থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য আর্থিক দায় দায়িত্ব নিয়ে নেকড়েদের বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করে এরা কাজটি

সফল করতে চাইছে। সে তুলনায় নেকড়ে বাড়াও প্রকল্পে মার্কিন সরকারের অবদান মোটেই যথেষ্ট নয়। অন্তত নেকড়ে বাড়াও অভিযানে শামিল হয়েছেন যাঁরা তাঁরা স্পষ্টই বলছেন যে ডিফেন্ডারস অফ ওয়াইল্ড লাইফ-এর অবদান অনেক বেশি।

এঁদের ধারণা — ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস নাকি অনেক ক্ষেত্রেই গাফিলতির প্রমাণ দিচ্ছে। বাইসন আর হরিণদের জন্যেও কোনও চিন্তা ভাবনা করে না। ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে এসব প্রাণীদের দেখা শোনার দায়িত্ব নিয়েও ঠিকমতো যত্ন নেয় না। কখনও বলছে বাইসন আর হরিণ সরকারি সম্পত্তি নয়। আবার কখনও বলছে এদের দেখাশোনা করার অধিকার একমাত্র মার্কিন সরকারেরই আছে। যত্ন করবে না, আবার দাবিও ছাড়বে না। এজন্যে এখন পরিবেশ সংরক্ষণকারীরা বেশ বিরক্ত।

কখনও কখনও শীতকালে বরফের মরশুমে বাইসন আর হরিণরা ইয়েলেস্টোন ন্যাশনাল পার্ক ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের অভাব হয়ে যায়। লোকালয়ের কাছাকাছি চলে আসার দরুন খেত খামারে পোষা জন্তু জানোয়ারদের সংস্পর্শে আসে। ব্রুসেলসিস নামে এক ধরনের ছোঁয়াচে অসুখে আক্রান্ত বাইসন আর হরিণরা রোগ ছড়িয়ে দেয় ওইসব প্রতিপালিত জীব জন্তুদের শরীরে। গর্ভবতী গাভীর ওই রোগ সংক্রমণের ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়।

তিনবছর আগে ইয়েলোস্টোনের জঙ্গলে আগুন লেগে অনেক গাছপালা এবং তৃণভূমি নষ্ট হয়ে গেলে শীতের মুখে জীব জন্তুরা খাবারের খোঁজে বাইরে চলে এসেছিল। বিশেষ করে ক্ষুধার্ত বাইসন, হরিণ প্রায় সময়ই খামার বাড়ির আশপাশে চরে বেড়িয়ে ঘাস পাতা খেত। কেন্দ্রীয় সরকারের পার্ক সার্ভিস হাত ঘুটিয়ে বসেছিল। এদিকে মন্ট্যানা স্টেটে বিরাট উত্তেজনা। বাইসনরা গর্ভবতী গাভীর শরীরে ব্রুসেলসিস ছড়িয়ে দিলে তাদের গর্ভ নষ্ট হয়ে যাবে। অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীরাও বুনো বাইসনের কাছাকাছি থেকে ওই রোগে আক্রান্ত হবে। মহা চিন্তা। তখন রাজ্য থেকে শিকারীদের ঢালাও অনুমতি দেওয়া হল, যে যত পারো বাইসন মারো। শিকারীদের তো পোয়া বারো। বাইসন দেখছে আর গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই নিষ্ঠুরতার খবর পেয়ে বিরাট আন্দোলন শুরু করাতে রাজ্য সরকার ভয় পেয়ে বাইসন নিধন যজ্ঞ বন্ধ করে দিল। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের টনক পড়ল। ন্যাশনাল

পার্ক সার্ভিসের কর্মচারীদের ওপর হুকুম হল বাইসন আর হরিণদের যে করে হোক ঝুঁটি ধরে ইয়েলোস্টোনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। সেখানে তৃণভূমি আর বড় গাছপালা দেখে তাদের বিচরণ ক্ষেত্র তৈরি করে দাও। তার পরেও যদি কিছু অবাধ্য বাইসন মন্ট্যানা স্টেটে ফিরে এসে ঘাসে মুখ দেওয়ার তাল করে তো গুলি চালিয়ে দুটো একটাকে খতম করে দাও। বাকিরা শিক্ষা পেয়ে জঙ্গলে ফেরত যাবে। ইয়েলোস্টোনের বাইসন হয়ে মন্ট্যানার ঘাস চিবনো চলবে না। কর্মচারীরা হুকুম মেনেছিল।

আমেরিকাতে এনডেনজারড স্পিশিস অ্যাক্ট-এর আওতায় পড়ে এমন বন্য জন্তুদের অযত্ন করলেই মুশকিল। তবুও সরকারের অযোগ্যতা নিয়ে সমালোচনা যথেষ্টই শোনা যাচ্ছে ইদানীং। সরকার নাকি এইসব জানোয়ারদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে না। ওই অ্যাক্ট অনুযায়ী এমন নিয়ম মানতে হবে যে যদি আমার জমিতে কোনও প্রাণী বাস করে যার বংশধররা প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে, তবে ওই জমিতে তাকে সযত্নে বসবাস করতে দিতে হবে। নিজের ব্যক্তিগত কোনও প্রয়োজনে ওই জমি ব্যবহার করা যাবে না। ফলে সরকারের কোনও দায় তো মোটেই থাকছে না, এদিকে জমি নিয়ে মালিকের দায় আরও বেড়ে যাচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণকারী দল, সরকার সবাই মিলে তার নিজস্ব জমি ভোগ করার সুবিধে বরবাদ করে ছাড়বে। এত বড় স্বার্থত্যাগ করার ইচ্ছে সকলের না থাকতেই পারে। কেউ কেউ অবশ্য 'জীবে প্রেম'-এ বিশ্বাসী হয়ে নিজস্ব জমি-জমা অনাবাদী রেখে দেয় এবং সেখানে ওই ধরনের প্রাণীদের সানন্দে বাস করতে দেয়, কিন্তু আর্থিক প্রয়োজনে অনেকের ক্ষেত্রেই এতখানি ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হয় না। চাষ আবাদ বন্ধ করে দিয়ে কিংবা বাড়ি-ঘর তৈরি না করে জায়গাটিকে শুধুমাত্র রুপোলি ছিটছিট মার্ক প্রজাপতি, নয়তো টাক মাথা ঈগলপাখি, গায়ে টিপটিপ দাগওলা, ভুরু কুঁচকোনো প্যাঁচা কিংবা ক্যালিফোর্নিয়ার মশা খেকো পোকাদের জন্যে দান করে দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। এরা প্রাণী হিসেবে আমেরিকায় সংখ্যায় নগণ্য হয়ে আসছে ভেবেও ঝট করে অভিভূত হয়ে পড়া মুশকিল। ধরা যাক একজন কাঠের ব্যবসায়ী জানে তার বাগানের গাছের গায়ে টিপ টিপ দাগওলা প্যাঁচাদের ঘর সংসার আছে। এসব গুপ্ত খবর জানাজানি হবার আগেই সে চাইবে প্যাঁচাদের উচ্ছেদ করে গাছাগাছালি কেটে ফেলতে। না হলে তার ঘর সংসার চালাবে কোথা থেকে? গাছ বেচেই তার সংসার চলে। যদি সে মায়া

মমতা দেখাতে গিয়ে প্যাঁচাদের জন্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে, তবে নিজের ব্যবসা তো লাটে উঠে যাবে। সরকার আর প্রকৃতি প্রেমিকরা মিলে মিশে কোনও দিন তাকে আর গাছ কাটতে দেবে? একবার প্যাঁচা আবিষ্কার হলেই হয়েছে আর কি?

দেখা যাচ্ছে অবলুপ্ত প্রায় প্রাণীসমাজের জন্যে জমি জমা ফেলে রাখার যাবতীয় দায় এখন খেত খামারের মালিক, নয়তো জমির মালিকদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। সরকার শুধু অ্যাক্ট তৈরি করে খালাস। সে তুলনায় নেকড়ে বাড়াও অভিযানকারীরা অনেক বেশি সহৃদয়। তারা পুরস্কার দিয়ে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমির মালিকদের কত ভাবে উদ্বুদ্ধ করছে। এরপর কার না নিজের জমিতে নেকড়ের পাল চরাতে ইচ্ছে হয়? পরিবেশ সংরক্ষণও হল, আবার পোষা ভেড়াটা নেকড়ের ভোগে লাগলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।

নেকড়েদের জন্যে ডিফেন্ডারস্ অফ ওয়াইল্ড লাইফ যত সদয়, অন্যান্য প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্যে যদি সেরকম বিবেচনা করে, তবে যাদের জমিতে টেকো ঈগল কিংবা দাগী পেঁচা আস্তানা গেড়েছে, তাদেরও অনেক সুবিধে হতে পারে। এক জোড়া দাগী প্যাঁচাকে বাগানে থাকতে দিলে বা এনে বসিয়ে দিলে যদি কোনও কাঠের ব্যবসায়ীকে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে সে খুশি মনে বাগানের কিছু গাছ কোনও দিনই কাটবে না! সেই গাছে প্যাঁচারা নির্ভয়ে বসে থাকবে আজীবন। বংশ বৃদ্ধি করে করে প্রজাতিকে অবলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করবে। তিন পুরুষও টিকে যেতে পারে। আমেরিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিধি নিষেধের চেয়ে এরকম আর্থিক প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি অনেক বেশি কার্যকর হতে পারবে।

কলোরাডো স্টেটে বোল্ডার শহরে হচ্ছে আমেরিকার ন্যাশেন্যাল অডোবন্ সোসাইটির — হেড অফিস। জীবজন্তু এবং নিসর্গ প্রেমিক এই সোসাইটির প্রধান কাজ হল প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্যে মানুষকে সচেতন করে তোলা। সারা আমেরিকায় এদের পাঁচশোটি আঞ্চলিক শাখা আছে। প্রত্যেক শাখাতেই প্রচুর বইপত্র, ভ্রমণ সূচি মজুত থাকে। পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া, সামুদ্রিক প্রাণী দেখতে জলপথে বেরিয়ে পড়া — ইত্যাদি বহু আকর্ষণমূলক ট্যুরের ব্যবস্থা থাকে। কোন কুয়াশাচ্ছন্ন হ্রদের ধারে ভীষণ লাজুক ধরনের এক ভাল্লুক থাকে, কোন সমুদ্রের নীচে প্রবাল দ্বীপের মধ্যে ময়ূরকণ্ঠী রং-এর পাখাওলা মাছ ভেসে বেড়ায়, সাউথ ড্যাকোটায়

কোন গুহাতে স্ফটিকের স্বচ্ছ দেওয়াল দেখতে পাওয়া যায়, কোথায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীর জীবাশ্ম আঁকা আছে — এ সবই তারা জানিয়ে দিতে চায়। এই সোসাইটির সদস্য হওয়া মানেই তোমাকে নিসর্গশোভা বজায় রাখার জন্যে পবিত্র কর্মভার দেওয়া হল। ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট, সেভ দ্য আর্থ, অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্ক ইত্যাদি নানা পবিকল্পনায় যুক্ত হতে হবে। কিছুদিন আগে লং আইল্যান্ডের সমুদ্রে সি ব্যাস নামে খুব সুস্বাদু এক জাতের মাছ ধরা বন্ধ করতে উঠে পড়ে লাগল একদল অ্যাকটিভিস্ট। কী ব্যাপার? না সি ব্যাস্ খেতে হাঙররা ভীষণ ভালবাসে। জেলেরা যদি ওই মাছ ধরে ধরে কেবল মানুষদের খাইয়ে দেয় তো হাঙ্গরদের বঞ্চিত করা হবে। অতএব ভেজা বালির ওপর সদলবলে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকল। বালিতেই পুঁতে দিয়েছে নানা পোস্টার — "হাঙরের খাদ্য কেড়ে নিও না।"

"সি ব্যাস্ খাওয়া বন্ধ হোক" "জলের মাছ জলেই থাক, হাঙর কুমির বেছে খাক।"

জেলেরা পড়ল মহা সমস্যায়। আমেরিকায় এখন মাছ খাওয়ার যুগ এসেছে। তবু সব মাছ ধরা চলে না। রাসায়নিক দূষণের কারণে কিছু কিছু মাছ ধরে বিক্রি করা বেআইনি। নিরাপদ মাছেদের মধ্যে সামুদ্রিক ব্যাসের দারুণ কাট্‌তি। অনেকটা তেলাপিয়া ধরনের দেখতে। স্বাদ অনেক ভালো। তা সেই মাছ নাকি হাঙরদের জন্য সমুদ্রেই রেখে আসতে হবে। মানুষদের জন্যে ধরে আনা যাবে না। জেলেরা সেই স্লোগানধারীদের সামনে নিরুপায় হয়ে নৌকায় বসে আছে। মাছ ধরে এনেও নামাতে ভয় পাচ্ছে। হাঙরবন্ধুদের লেক্‌চারে ভারী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এমন সময়ে ধীবরবন্ধু হয়ে আবির্ভূত হলেন নামকরা রক সিঙ্গার বিলি জোল। তাঁর মতো জনপ্রিয় শিল্পী আমেরিকায় খুব বেশি নেই। লং আইল্যান্ডের বিচে নেমে জেলেদের নৌকো থেকে দুই হাতে ঝুলিয়ে নিলে দুটি মস্ত মস্ত সি ব্যাস। তারপর হুংকার ছাড়লেন — তোমরাও নৌকো থেকে সব মাছ নামিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো। দেখি কারা পথ আটকায়? একদল মানুষের রুজি রোজগার বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলন করা হচ্ছে? হাঙরদের জন্যে মায়া মমতার শেষ নেই না? সমুদ্রে তাদের খাবার জিনিসের অভাব আছে?" মাছ দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে ওপরে উঠে লেন রকস্টার বিলি জোল। যেন কোলাঘাটে গঙ্গার পাড় থেকে জোড়া ইলিশ নিয়ে উঠছেন। পেছন পেছন মাছের জাল টানতে টানতে ধীবর সম্প্রদায়। হাঙরবন্ধুরা বিষণ্ণ চিত্তে ফিরে গেল।

আমার বন্ধু গৌরী সাপের চামড়ার ব্যাগ কেনে না। ফার কোট পরে না। কারণ, শৌখিনতার জন্যে অকারণ প্রাণী হত্যা ওর পছন্দ নয়। কিন্তু চামড়ার জুতো পরে। অবশ্য জুতো পরা। শৌখিনতার পর্যায়ে পড়ে না। তিন চারটে কস্‌মেটিক্‌স কোম্পানি আর ওষুধের কোম্পানির সামনে হাত তুলে তুলে স্লোগান দিয়েছেন বেশ কয়েকবার। কারণ সেখানেও কেমিস্টরা জীবজন্তুর চামড়ার ওপর মেকাপ পরীক্ষা করে। নানা রং চং-এর প্রতিক্রিয়া দেখতে ইঁদুর টিদুরকে সং সাজানো হয়। তাতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। রুজ, লিপস্টিক মাখা ধেড়ে ইঁদুর নানা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় শয্যা নেয়। ওষুধের কোম্পানি তো নেংটি ইঁদুর, গিনিপিগ আর বাঁদরদের নিয়ে কী নিষ্ঠুর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। মানুষদের মঙ্গলের ছুতো করে ইঁদুর, বাঁদরের ওপর এরকম অত্যাচার গৌরীর সহ্য হয় না। তবে গৌরী নিজে শাকাহারী নয়। প্রাণীজ প্রোটিন দেহের পক্ষে উপকারী বলে মাছ, মাংস, ডিম সবই খেতে হয় ওকে। একবার গৌরীর সঙ্গে নিউইয়র্কে নাটক দেখতে গিয়ে কী অশান্তি! "গরম ভাত ও নিছক ভূতের গল্প" নাটকে হঠাৎ একটা জ্যান্ত খরগোশকে দড়িতে ঝুলিয়ে নিয়ে স্টেজে ঢুকল একজন। খরগোশটাকে এই অবস্থায় দেখে গৌরী সোজা গ্রিনরুমে ধাওয়া করল। তাদের দাবড়ে দিতে তারাও হেসে দু-কথা শুনিয়ে দিল। কস্‌মেটিকস তৈরি করতেও নাকি কী সব জন্তুর তেল লাগে। আমরা যখন অন্তত লিপস্টিক মেখেছি, তখন আর জ্যান্ত খরগোশের দুঃখে নাটক বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হাস্যকর ইত্যাদি ইত্যাদি। পালটা দাবড়ানি খেয়ে আবার নাটক দেখতে বসে গেলাম। নেকড়েরা ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে বংশ বৃদ্ধি করার ভালোই সুযোগ পাচ্ছে। আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে খেত খামারেও তাদের পোষার জন্যে প্রাইজ দেওয়া হবে। আর আমাদের শহরে ভাল্লুক এলে ভয় পাওয়া বা ভয় দেখানো দুটোই বারণ। সে তার খেয়াল খুশি মতো আবার পয়দল জঙ্গলে ফিরে যাবে। ভাল্লুককে ভয়টয় দেখানোর কোনও প্রক্রিয়াই আমার জানা নেই। সেই অর্থে আইন অমান্য করব না। তবে সামনা সামনি কোলাকুলি করতে এলে যে ভয় পাব না কিংবা অজ্ঞান হয়ে যাব না — এ গ্যারান্টি দেওয়া অসম্ভব। গত আঠারো বছরে একবারও সে আমার ছায়া মাড়ায়নি। তবে যদি কখনও দেখা হয়, ভির্মি খেয়ে পড়ার আগে তাকে আমি গৌরীর ঠিকানা বলে যাব।

বাঘবন্দি

নিউইয়র্ক হার্লেম অঞ্চলে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে বেশ কিছু পরিবার থাকে। তাদেরই মধ্যে এক বাড়িতে মা আর ছোট্ট মেয়ের মধ্যে কথা হচ্ছিল। মেয়ে মাকে এক বিচিত্র সংবাদ দিয়েছে। সে নাকি ওদের ওপরতলার একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় ফাঁক দিয়ে পেল্লায় এক বাঘ দেখতে পেয়েছে।

মার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। এও কি সম্ভব নাকি? শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় হাইরাইজ বিল্ডিং-এর মধ্যে বাঘ আসবে কোত্থেকে? মেয়ে কী দেখতে কী দেখেছে! মেয়ে কিন্তু সমানেই বলে যাচ্ছে — হ্যাঁ, মা। একটু আগে নিজের চোখে দেখলাম। গার্লস স্কাউট কুকি বিক্রি করার জন্যে যখন সব অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় নক করছিলাম, হঠাৎ দেখলাম একটা লোক চাবি খুলে ঢুকল। ওর অ্যাপার্টমেন্টের খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাকে দেখলাম। কার্পেটে শুয়েছিল। লোকটা তক্ষুনি দরজা বন্ধ করে দিল। ঠিক আমাদের ওপরের ফ্লোরের অ্যাপার্টমেন্টেই দেখলাম মনে হচ্ছে।

মার মনে খটকা রয়ে গেল। তাহলে কি কেউ বন বেড়াল বা কুগারের বাচ্চা-টাচ্চা পুষেছে? এদেশে তো লোকেদের উদ্ভট শখের অভাব নেই। অ্যাপার্টমেন্ট সাপ পুষছে, ব্যথটবে কুমির ছানা পুষছে। কত কিছুই তো টিভি'র খবরে দেখায় নাঃ ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে।

খেয়াল রাখতে গিয়েই ধরা পড়ল বাড়িতে ইদানীং বিটকেল গন্ধ ছড়াচ্ছে। জানলা খুললেই কেমন বুনো বুনো উগ্র গন্ধ আসছে। এমনিতেই ওপরতলার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মাঝে মাঝে জল চুঁইয়ে পড়ে নিজেদের বাথরুমের সিলিং ভিজে যায়। এখন সেখান থেকে প্রচণ্ড ঝাঁঝওলা খয়েরি খয়েরি জল পড়ছে। বাঘের হিসি নয়তো?

মা একজন বিল্ডিং সুপারকে খবর দিলেন। সেও তেমনি কুঁড়ে আর ফাঁকিবাজ। গুণ্ডা, মস্তানদের পাড়ায় সস্তার ভাঙাচোরা অ্যাপার্টমেন্টের দেখাশোনার জন্যে সুপারই বা কী এমন মাইনে পায়? সেও তাই হিসির উৎস সন্ধানে উৎসাহিত হচ্ছিল না। তাছাড়া, বাসিন্দাগুলোর চাল, চলন তো জানে। কার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরবে, তখন আবার ঝামেলা। আসলে সুপার এটুকু জানত যে, পাঁচ তলার ওই অ্যাপার্টমেন্টে অ্যান্টয়েন ইয়েটস নামে ওই লোকটার একটা হিংস্র পিট বুল ডগ আছে। এছাড়া পাঁচ ফুট লম্বা "কেইম্যান" (মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কুমির জাতীয় সরীসৃপ) ও পুষেছে। সুপার আসলে লোকটাকে ঘাঁটাতে চাইছিল না।

কিন্তু বাঘের গন্ধ বাতাসে ভেসে ভেসে পুলিশের নাকে গিয়ে পৌঁছাল। সেদিন অক্টোবরের চার তারিখ। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ড্রু হ্যামিলটন হাউসিং-এর বাসিন্দারা দেখল গোটা পাড়া পুলিশের গাড়িতে ছেয়ে গেছে। তার সঙ্গে দমকলের ট্রাক, নিউইয়র্কের বিখ্যাত চিড়িয়াখানা "ব্রংক্স জু"-র পশু চিকিৎসকের ভ্যান, সব সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পুলিশ বাহিনী দু-তিন দিকে ভাগ হয়ে গেল। প্রথমে একদল গিয়ে পাঁচতলার ওই অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় মস্ত একটা ফুটো করল। সেখানে চোখ রাখতেই ব্যাঘ্র দর্শন। শুধু দর্শন নয়, তার গর্জন, আস্ফালন সবই শোনা যাচ্ছে। নেহাত ছোটখাট বাঘ নয়। অন্তত চারশো, সাড়ে চারশো পাউন্ড ওজনের বিশাল রয়েল বেঙ্গল টাইগার ভেতরে তাণ্ডব লাগিয়েছে। কুমিরটাকে অবশ্য দরজার ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না তাদের মালিককেও। পুলিশ আসলে লোকটার অনুপস্থিতির সুযোগেই হানা দিয়েছে।

কিন্তু পুলিশে খবর দিল কে? সত্যিই তো আর বাঘের বোঁটকা গন্ধ বিধুর সমীরণে মোহিত হয়ে পুলিশ এসে হাজির হয়নি। তাদের কাছে খবর গিয়েছিল। এক ডাক্তার গোপনে থানায় ফোন করে দিয়েছিলেন। ওই যে লোকটা অ্যান্টয়েন ইয়েটস — সে হঠাৎ দু'দিন আগে পুলিশে ফোন করে বলেছিল, তার পোষা বুলডগ ভীষণ রকম কামড়ে দিয়েছে। হাত, পা কেটে রক্তারক্তি। তাই পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য চাই। পুলিশ যখন তাকে সাহায্য করতে গেল, সে নীচের লবিতে এসে বসে আছে। হাতে পায়ে বীভৎস কামড়ের দাগ। রক্ত ঝরছে। পুলিশ কুকুরটাকে দেখবে বলে ওপরে

যেতে চাইছিল। অ্যান্টয়েন রাজি হল না। তাকে তখন হার্লেম হসপিটালে ভর্তি করা হল। তিনদিন পরে ছাড়া পেল। কিন্তু তার আগেই পুলিশ বাঘ ধরতে চলে গেছে। কারণ হার্লেম হসপিটালের এক ডাক্তার পুলিশে জানিয়েছেন — অ্যান্টয়েন ইয়েট্স-এর শরীরের ক্ষত পরীক্ষা করে তিনি সন্দেহ করছেন যে, তাকে পিট বুল ডগ নয়, আরও বড় কোনও হিংস্র জন্তু কামড়েছে। আঁচড় দেখে মনে হচ্ছে বাঘে আঁচড়ে দিয়েছে।

একে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তার ওপর পুলিশ ছুঁয়েছে। ডবল হয়ে ছত্রিশ রাগিণীর খেলা। অ্যান্টয়েন বাঘের খপ্পর থেকে পুলিশের খপ্পরে পড়ে গেছে।

পুলিশ নাকি আরও দুটো একটা সূত্রে খবর পেয়েছিল যে, লোকটা বাঘ পুষেছে। ওই অ্যাপার্টমেন্টে অনেক পরিবার ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। তারা ওই হিংস্র পিট বুল-এর জন্যেও ভয়ে ভয়ে থাকত। বেআইনিভাবে হিংস্র জন্তু জানোয়ার পুষছে জেনেও লোকটাকে কিছু বলা যেত না। কারণ ও পাড়ায় নিয়ম ভাঙাটাই দস্তুর। গুণ্ডা মার্কা ভাড়াটেদের কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না। কিন্তু পুলিশ যখন ভেতরে ভেতরে খোঁজ নিতে লাগল, তখন ওই ছোট মেয়েটি আর তার মা ভ্যালেরি টমপকিনস জানাল যে প্রায় দু, তিন মাস ধরে তারা ওপরের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছে। বাথরুমের সিলিং-এর ছোপ ধরা দাগ দেখাল। মেয়েটি পুলিশকে বারবার বলল — আমি স্পষ্ট দেখেছি। ওটা বাঘ ছাড়া কিছু হতে পারে না।

চারতলার আর এক ভাড়াটে পুলিশের কাছে বলল — বাঘ আছে কি না জানি না। তবে লোকটা সাপ, কুমির, পিট্ বুল্ পোষে। জন্তু জানোয়ার বলতে পাগল! ভয় ডরও নেই।

এরপর পুলিশ আর অপেক্ষা করল না। দরজায় ফুটো করে বড়ে মিঞা দর্শন করে, একেবারে অ্যাকশনে নেমে পড়ল। বাঘকে গুলি করা চলবে না। গায়ে ঘুমের ওষুধের তীর মেরে আগে ধরাশায়ী করতে হবে। পাঁচ তলার ওপরের জানলায় চড়ে বসে ওইভাবে তাক করে বাঘের গায়ে তীর মারা কি সোজা কথা? সে তো বীর বিক্রমে দরজায় তার বিশাল হাঁ মুখ উঁকি দেয়, তো পর মুহূর্তে পাশের ঘরে ল্যাজের আছাড়ানি। দরজা ভেঙে ঢোকা যায় না। কোথা থেকে হালুম করে কোন পুলিশের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, এ ঝুঁকি নেওয়া যায় না। অকুপেশনাল হ্যাজার্ডের কেস হয়ে যাবে।

অতএব বন্ধ বাড়িতে বন্দি বীরকে বাতায়ন থেকেই তীর মারতে হবে। বাঘের প্রচণ্ড গর্জন শুনে চারদিকে লোক জমে গেছে। পুলিশ অফিসারের জান, মান দুই-ই খতরার মুখে। তিনি হচ্ছেন এ ধরনের বিপজ্জনক অভিযানের উপযুক্ত স্নাইপার অফিসার। কিন্তু রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে মোকাবিলার ট্রেনিং বা অভিজ্ঞতা কোনওটাই নেই।

বাঘ ঘুরছে পাঁচতলায়। কিন্তু চারতলা থেকেই তোড়জোড় শুরু হল। নীচের অ্যাপার্টমেন্টের জানলা গলিয়ে লম্বা একটি খুঁটির মাথায় ভিডিও ক্যামেরা ফিট করে সোজা ওপরে পাঁচতলার কাছের জানলার গায়ে রাখা হল। পাশের স্ক্রিনে বাঘের পায়চারির ছবি উঠছে। কখন কোথায় ঘুরছে দেখা যাচ্ছে। ওদিকে সাততলায় পৌঁছে গেছে পুলিশের আর একটা দল। তারা কোমরে দড়ি পরে ওপরের জানলা থেকে ঝুলে ঝুলে পাঁচতলার ওই অ্যাপার্টমেন্টের জানলার কাছে পৌঁছাবে। তারপর বাঘের গায়ে ঘুমের ওষুধ মাখানো লম্বা তীর ছোঁড়া হবে।

ওই যে স্নাইপার অফিসার, তাঁর নাম মার্টিন ডাফি। তিনি এবার সম্মুখ সমরের জন্যে তৈরি হলেন। কোমরে আর উরুর খাঁজে মোট্‌কা দড়ি বেঁধে নিলেন। দড়ির দোলনায় দুলতে দুলতে পাঁচতলার জানালার কাছে পৌঁছলেন। এক বগলে গুলি ভরা রাইফেল। অন্য বগলে ওষুধ মাখানো ডার্ট গান।

এবার তীর ছোঁড়া শুরু হল। প্রথমবার ফটাশ করে শব্দ হতেই বাঘ তুমুল গর্জন করে উঠল। হুংকার শুনে ফুটপাতে জমা হওয়া লোকেদের কী রোমাঞ্চ। চিড়িয়াখানার বাইরে এরকম জীবন্ত বাঘের গর্জন জীবনে কেউ শুনেছে? বাঘটা কবে এ বাড়িতে ঢুকেছিল, কী করে সকলের চোখের আড়ালে পাঁচতলার অ্যাপার্টমেন্টে সেঁধিয়েছিল, লোকেরা ভেবেই পাচ্ছে না।

স্নাইপার অফিসার বেশ কয়েকবার ডার্ট গান ছোড়ার পর বাঘের তম্বি থেমে গেল। তাও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ভিডিও স্ক্রিনে দেখা গেল বাঘটা পেট চিতিয়ে পড়ে আছে। গুলি ভাঁটা চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন।

পুলিশরা এবার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। চিৎপাত বাঘ বাবাজি ঘুমঘোরে। পিট বুল কুকুরটা ধারে কাছে নেই। হয়তো মালিক হাসপাতালে যাবার আগে সেটাকে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর সেই কুমিরটা বাথরুমের জল ভর্তি বাথটবে মটকা মেরে পড়ে আছে। বাড়িতে এত কাণ্ডের পরেও তার স্থিতপ্রজ্ঞ ভাব।

ঘটনার অনেকটাই আমরা টিভি'র বিকেলের খবরে সরাসরি ঘটে যেতে দেখেছি। মানে যখন থেকে পুলিশের দল হার্লেমের ওই বাড়িতে হানা দিয়েছে, টিভি'র রিপোর্টাররাও পেছন পেছন হাজির। বাঘ বন্দি করার ঘটমান বর্তমান ছবি দেখানোর জন্যে তিনটে বড় বড় টিভি চ্যানেল মেলা লোকজন নিয়ে জুটে গিয়েছিল। আমরা টিভিতেই দেখলাম কীভাবে স্নাইপার অফিসার দড়ির দোলনায় চড়ে পাঁচ তলার জানলার খাঁজে পা রাখছেন। পটাপট ওষুধের তীর মারছেন। কিন্তু বাঘের গর্জন শুনতে পাইনি। পরে দেখলাম হাতে, মুখে দড়ি পরিয়ে ঘুমন্ত বাঘটাকে নীচের রাস্তায় নামানো হল। ব্রংক্স জুর পশু চিকিৎসক তাকে নাকে, মুখে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি বনের পশুর এরকম বন্দি দশা দেখে খুবই ক্ষুব্ধ। প্রথমত, ওইটুকু অ্যাপার্টমেন্টে ভাঙা চোরা ফার্নিচারের মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে আটকে রাখা মানে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা। দ্বিতীয়ত বাঘটা যদি কোনও রকমে দরজার বাইরে বেরিয়ে আসত, কোথায় কার ঘাড় মটকাত কে জানে?

ওই লোকটার মতো পুলিশরাও বাঘ আর কুমিরকে এক ঘাটে জল খাইয়ে ছেড়েছে। দুটোকেই ধরে বেঁধে নিউইয়র্কের একশো দশ স্ট্রিটের "সেন্টার ফর অ্যানিমাল কেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রোল"-এ চালান করে দিয়েছিল।

পরে শুনলাম বাঘটাকে রাজ্যছাড়া করা হচ্ছে। ক'দিন আগে সে ওহায়োর একটা অ্যানিমাল কনজারভেশনে চলে গেছে।

ওদিকে তার মালিক তো মিং মিং করে অস্থির। হ্যাঁ, বাঘটার নাম মিং। অ্যান্টোয়েন ইয়েট্স শেষ পর্যন্ত মামলায় ফেঁসে গেছে। তার বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক শহর কর্তৃপক্ষ "রেকালেস এনডেনজারমেন্টের" মামলা ঠুকে দিয়েছে। কিন্তু অ্যান্টোয়েনের এক কথা — মিং-কে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ও আমার ভাই, প্রাণের বন্ধু। সত্যি বলতে কি মিং ছাড়া আমার কোনও বন্ধুই নেই...।

ব্যাঘ্রবন্ধুর আবেদন নিবেদন গ্রাহ্য হয়নি। হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে একদিন টিভি'র ইন্টারভিউতে এসেছিল। ন্যাড়া মাথা কালো যুবকটি বড় বড় চোখ ভাসিয়ে দিয়ে বলছিল — বিনা দোষে মিংকে কেড়ে নিয়ে গেল। আমাকে তো কামড়ায়নি। খেলা করতে করতে একটু আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছিল...।

বাঘের মামলা লড়ার জন্যে সে একজন উকিল ধরেছে। উকিলের বক্তব্য — পুলিশ থেকে অ্যান্টোয়েন ইয়েট্সকে ওয়ার্নিং দিতে পারত। পোষা বাঘ

নিয়ে সে কী করবে, নিজেই সিদ্ধান্ত নিত? এভাবে পোষা জন্তু আর মালিকের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

হার্লেমের ওই অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দারা নিশ্চয়ই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তবে মিং-এর হালত কেমন কে জানে? শহরের বাঘ কি আর মফঃস্বলে গিয়ে ভালো থাকবে? কোথায় হার্লেমের কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের পরিবেশ। জ্যাজ আর হিপহপ মিউজিক শুনেই হয়তো বাঘটার কত সন্ধে কেটে গেছে। এখন নিশীথ সংগীত বলতে শুরু উচ্চিংড়ের কোরাস।

এটা তো একটা ঘটনা। কিছুদিন আগে লাস ভেগাসের "এম জি এম মিরাজ" হোটেলে বাঘের খেলা দেখতে গিয়ে রয় হর্ন নামে একজন লোক সাংঘাতিক আহত হলেন। তিনি ৬০০ পাউন্ড ওজনের একটি সাইবেরিয়ান সাদা বাঘের সঙ্গে শো করেছিলেন। দেড় হাজার দর্শক খেলা দেখেছে। হঠাৎ বাঘটা রয় হর্নের ঘাড় কামড়ে ধরল। দর্শকেরা প্রথমে ভেবেছে বুঝি ওটা খেলারই ব্যাপার। তারপর বোঝা গেল বাঘটা সত্যি সত্যি মরণ কামড় দিয়েছে। লোকটিকে মাটিতে ফেলে বীভৎস ভাবে আক্রমণ করছে। শেষে বাঘকে আগুন নেভানোর স্প্রে দিয়ে দূরে সরিয়ে রয় হর্নকে উদ্ধার করা হল। এখনও হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন। অ্যারিজোনায় বাঘের কামড়ে আহত হয়েছে সারা রয় নামে একটি মেয়ে। সে ওখানে একটি ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল স্যাংকচুয়ারিতে কাজ করত। পরপর এরকম বাঘের কামড়ের ঘটনা শোনা যাচ্ছে। টেকসাসে নিজেদের পোষা বাঘের কামড়ে মারা গেল দুটি ছোট ভাইবোন। গত পাঁচ, ছ-বছরে অন্তত সাতজন লোক পোষা বাঘের আক্রমণে মারা গেছে। কুড়ি, বাইশ জন আহত হয়েছে।

আমেরিকায় বাঘ, সিংহ, কুগার ইত্যাদি পোষার ব্যাপারটা এত বেড়ে গেছে যে দুর্ঘটনার হারও বাড়ছে। তবে সব রাজ্যে এরকম হিংস্র জন্তু পোষা যায় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় বা গৃহপালিত জন্তু হিসেবে মোট ষোলোটি রাজ্যে ওই হিংস্র প্রাণীদের পোষা যায়। তার জন্যে কোনও আইনের বিধিনিষেধও নেই। পশ্চিম প্রান্তে ওয়াশিংটন, নেভাডা, আইডাহো, মধ্য-পশ্চিমের রাজ্য ক্যানসাস, এছাড়া মিনেসোটা, আয়ওয়া, উইসকন্‌সিন, মিসৌরি, আরক্যানসাস, লুইসিয়ানা, অ্যালাবামা, কেন্টাকি, ওহায়ো, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, নর্থ, ক্যারোলাইনা ও সাউথ ক্যারোলাইনা রাজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় বাঘ, সিংহ পোষা যায়। নিয়ম কানুনের কোনও কড়াকড়ি নেই।

যে সব রাজ্যে বাঘ পুষতে গেলে সরকারের অনুমতি লাগে অর্থাৎ লাইসেন্স বা পারমিট দরকার হয়, সেগুলি হচ্ছে ওরিগন, অ্যারিজোনা, মনট্যানা, নর্থ ড্যাকোটা, সাউথ ড্যাকোটা, ওকলাহোমা, টেকসাস, ইন্ডিয়ানা, মিসিসিপি, পেনসিলভ্যানিয়া, নিউইয়র্ক ও মেইন রাজ্য।

আমেরিকার বাদ বাকি রাজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় বাঘ, কুগার, সিংহ ইত্যাদি পোষা আইনত নিষিদ্ধ। যেমন — ক্যালিফোর্নিয়া, হাওয়াই, অ্যালাস্কা, ইউটা, ওয়াইওমিং, কলোরাডো, নিউ মেক্সিকো, নেব্রাস্কা, ইলিনয়, টেনেসি, মিশিগান, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, ভার্জিনিয়া, ডেলাওয়্যার, মেরিল্যান্ড, নিউজার্সি, কানেটিকাট, রোড আয়ল্যান্ড, ম্যাসাচুসেট্স, ভারমন্ট এবং নিউহ্যাম্পশায়ার।

এত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আমেরিকার প্রায় দশ হাজার বাঘ বিভিন্ন লোকের নিজস্ব জমি বাড়িতে পোষা জানোয়ার হিসেবে রয়েছে। এর অর্ধেক সংখ্যক বাঘ (কুগার, বব ক্যাট, মাউনটেন লায়ন ইত্যাদি) রয়েছে আমেরিকার বনে জঙ্গলে। এছাড়া পোষা হচ্ছে সিংহ, কুগার ইত্যাদি হিংস্র জানোয়ার।

কেন লোকে বাঘ পোষে? কেউ চায়, হিংস্র বন্য জানোয়ারকে নিজের বশে রেখে আনন্দ পেতে। কেউ বলে তারা নাকি ব্যাঘ্র প্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করছে। কেউ মনে করে বাঘের ছানার মতো মিষ্টি তুলতুলে জীব আর হয় না। ছোটবেলায় আদর করে পুষতে গিয়ে মায়া পড়ে যায়। তখন বড় বাঘকেও আর ভয়ঙ্কর মনে হয় না। পোষমানা বাঘটা কুকুর, বেড়ালের মতোই থেকে যায়। তবে এমন অনেক মালিক আছেন, যাঁরা বাঘ বড় হবার পর ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল কনজারভেশনের এলাকায় পাঠিয়ে দেন। নয়তো টুরিস্টদের দ্রষ্টব্য সাফারি পার্কে দিয়ে আসেন। বন্যপ্রাণীকে বাড়িতে রেখে বিপদের ঝুঁকি নিতে চান না।

প্রশ্ন হচ্ছে আমেরিকায় এত বাঘ আসে কোথা থেকে? এদেশে তো রয়েল বেঙ্গল টাইগারও জন্মায় না, সাদা বাঘও জন্মায় না। তবে মোটা কেঁদো বাঘ বলতে এদেশের বন বাদাড়ে যা ঘুরে বেড়ায়, তাও খুবই হিংস্র। যেমন বব ক্যাট। উত্তর আমেরিকার পার্বত্য এলাকার জঙ্গলে এদের দেখা যায়। গায়ের রং লালচে হলুদ। সর্বাঙ্গে কালো চাকা চাকা দাগ। ছোট ল্যাজ। আর একটি বন্য জন্তুর নাম কুগার। খয়েরি রঙের বিশাল চেহারা। এক সময় আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে এরা বংশ বিস্তার করেছিল। এখন সংখ্যায় কমে

যাচ্ছে। এদেরই আর এক নাম মাউনটেন লায়ন, প্যানথার, অথবা পিউমা। প্যানথার বলতে লেপার্ডের মতো জানোয়ার বোঝালেও কুগাররা আরও বড় ও শক্তিশালী জানোয়ার। অর্থাৎ ওই প্রজাতির একটি শাখা। প্যানথারদের গায়ের রং কালো। জাগুয়ারও আমেরিকার জঙ্গলে পাওয়া যাবে। এরা লেপার্ডের চেয়ে বড় আর মোটাসোটা জন্তু। গায়ের রং খয়েরি ধরনের হলুদ। বিশাল ল্যাজ। সারা গায়ে কালো ফোঁটা। আমেরিকায় জন্মানো ব্যাঘ্র প্রজাতি বলতে এরাই বনে জঙ্গলে বিরাজ করছে।

কিন্তু এদেশে যারা বাঘ, সিংহ পুষছে, তারা তো অন্য দেশের জানোয়ারদেরও আমদানি করছে। তা কীভাবে সম্ভব হচ্ছে? কারণ, আজকাল এসব ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইনটাইনের বেশ কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। "দ্য এনডেনজার্ড স্পিশিস অ্যাক্ট" ছাড়াও "কনভেনশন অৰ ইনটারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেনজার্ড স্পিশিস"—এর নিষোধাজ্ঞা অনুযায়ী — অন্য দেশ থেকে বন্য বাঘ আমদানি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। বাঘেদের ছিন্নমূল করা চলবে না। যে যার নিজের দেশের বন জঙ্গলে থাকবে। নয়তো নানা দেশের চিড়িয়াখানার দ্রষ্টব্য হিসেবে বছরে কয়েকটা বাঘকে সরকারি বন্দোবস্ত অনুযায়ী দেশ ছাড়া করা যেতে পারে। কিন্তু বিদেশিদের পোষা জন্তু হিসেবে বাঘের দেশান্তর চলবে না।

তাহলে? নিউইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে সুন্দরবনের বাঘ এল কোন পথে? এসেছে বংশধারার পথে। অনেকদিন আগে যখন বাঘ চালানের এত কড়াকড়ি ছিল না, তখন যে বাঘগুলো আমেরিকায় এসেছিল, তারাই পোষা জানোয়ার হিসেবে মালিকের বাঘ বাগিচায় বংশবৃদ্ধি করেছে। ফলশ্রুতি হচ্ছে হাজার হাজার বাঘ। মালিকদের এটা খুব লাভজনক ব্যবসা। এদের বলা হয় টাইগার ব্রিডার্স। বাঘেরা নাকি একটু জমি জায়গা পেলেই বংশবিস্তারে উৎসাহী হয়। তারপর সেই বাঘের ছানাদের নিয়ে মালিকরা নিলামে চড়ায়। "অলটারনেটিভ লাইভস্টক অকশনে" গিয়ে চড়া দামে বেচে দেয়। সেই বাঘগুলো আবার নতুন মালিকের কাছে প্রতিপালিত হয়। এভাবে আমেরিকার বাজারেই বাঘ কেনাবেচা চলছে। পোষা জন্তু হিসেবে বাঘ আর মালিক দুজনেরই সমান প্রেস্টিজ! ইচ্ছে করলে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও বাঘের ছানার অর্ডার দেওয়া যায়। টাইগার ব্রিডিং কোম্পানিরা সেখানে বিজ্ঞাপন দেয়। বাড়িতে পোষা বাঘ, বাঘিনীর তিনটে ছানার ছবি

দিয়ে অনেক স্বামী, স্ত্রীও বিজ্ঞাপন দেন। এঁরা দামও বেশি চান না। শ'তিনেক ডলারে একটি বাঘের বাচ্চা কেনা যায়। খুব সস্তাই বলতে হবে। একটা ভালো জাতের কুকুর কিনতে গেলে অনেক বেশি দাম পড়ে যায়। যেহেতু অনেক রাজ্যেই বাঘ পোষা নিষিদ্ধ নয়, লোকেরা শখ করে বাঘ পোষে। তবে নিউইয়র্ক রাজ্যে লাইসেন্স বা পারমিট নিয়ে বাঘ রাখা সম্ভব হলেও নিউইয়র্ক শহরে তা নিষিদ্ধ। অনেক বড় শহরেই বাঘ পোষার অনুমতি দেওয়া হয় না।

ইউ এস সেনেট এবার একটা প্রস্তাব অনুমোদন করাতে চলেছে। সার্কাস, চিড়িয়াখানা আর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ছাড়া আর কোথাও বাঘ আমদানি চলবে না। বিদেশের বাঘ শুধু নয়, বাঘ নিয়ে আমেরিকায় অন্তর্দেশীয় ব্যবসাও বন্ধ করতে হবে। কেননা পোষা জন্তু হিসেবে বাঘ শুধু মালিকের ক্ষেত্রে নয়, প্রতিবেশীদের কাছেও বিপজ্জনক। পশু বিশেষজ্ঞদের মতে — বাঘ কখনও পোষ মানে না। লোকে হাজার হাজার বছর ধরে কুকুর, বেড়াল পুষছে। তারা গৃহপালিত জন্তুর বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মায়। বাঘ মানুষের সঙ্গে থাকার জন্যে জন্মায় না। সে প্রকৃতই বন্য জানোয়ার। তাকে শাসন করে নিজের কবলে রাখা মানে প্রতি মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া। যারা বাঘের খেলা দেখায়, তারা ক্রমাগত তাদের উত্ত্যক্ত করে। দাপটের ওপর রাখে। দিনের পর দিন মানুষের দাপট সহ্য করতে করতে বনের হিংস্র জন্তু একদিন ক্ষেপে ওঠে। তারই পরিণাম সার্কাসের বাঘের হাতে ট্রেনারের মৃত্যু। খোঁজ নিলে এরকম বহু ট্র্যাজিক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যাবে।

চিড়িয়াখানা বা অ্যানিম্যাল শেলটারেও দিনের পর দিন ছোট পরিসরে আবদ্ধ থাকার দরুন বাঘেরা ভেতরে ভেতরে অশান্ত এবং ক্রুদ্ধ থাকে। সুযোগ পেলে স্বমূর্তি ধারণ করে সেখানকার কর্মচারীদের আক্রমণ করে। যে জানোয়ার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে উন্মুক্ত প্রান্তরে, সীমাহীন অরণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করেছে, তার বংশধরকে খাঁচায় বন্দি করে রাখলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? যে লোকটি তাকে খেতে দিতে আসে, যে কোনও মুহূর্তে তাকেই আক্রমণ করতে পারে। অ্যারিজোনায় চিড়িয়াখানার সারা নামে সেই কর্মচারী মেয়েটি খাঁচার ভেতর বাঘের পিঠে হাত বোলাতে গিয়ে বাঘের পেটে চলে যাচ্ছিল। আঁচড়ে, কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কোনও মতে প্রাণে বেঁচেছে।

বাঘের প্রাইভেট মালিকরাও তাদের বন্দি করেই রাখে। হয় উচু পাঁচিল

ঘেরা পেছনের জমিতে, নয়তো সেখানেই খাঁচায় ভরে দেয়। কারুর কারুর পোষা বাঘ মালিকের বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। আদর, যত্ন খুব হচ্ছে বটে। কিন্তু দাপিয়ে বেড়ানোর জায়গা তো নেই। কারণ তার পরিবেশ থেকে তাকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে। তাহলে এ কথাই ধরে নেওয়া যায় যে বাঘ পোষা মানে নিষ্ঠুরতা।

নিজের শখ মেটানোর জন্যে বন্য জন্তুর ওপর অবিচার করা। এভাবে কোনও নিশ্চিহ্ন হতে চলা ব্যাঘ্র প্রজাতিকে রক্ষা করা যায় না। কারণ এটা তাদের সহজাত পরিবেশই নয়। এদের কি কেউ আবার বনে জঙ্গলে ফেরত পাঠাবে? নাকি সেখানে গেলেও এরা বাঁচবে? কঠিন শীত, গ্রীষ্মের মোকাবিলা করতে শেখেনি। বন্য পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে শেখেনি। খাদ্য আহরণের সহজাত প্রবৃত্তি বা তাড়নার অভিজ্ঞতা নেই। এরা বনে জঙ্গলে গিয়ে অপঘাতে নয়তো অসুস্থ হয়ে মারা পড়বে।

তাহলে কনজারভেশন কথাটার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে? এক গাদা বাঘ নিয়ে একত্রে বড় করা নয়। জঙ্গলের পরিবেশে একগাদা বাঘকে আপন মনে থাকতে দেওয়া। সেখানেই তাদের বংশ বৃদ্ধি হোক। সার্কাসের বাজনা নয়, নিউইয়র্কের হার্লেমের জ্যাজ মিউজিক নয়, নিজের গর্জনেই বাঘ মুগ্ধ হয়ে বেঁচে থাক। তবু যারা বাঘের ছানা পুষতে চায়, তারা বরং বাঘের মাসিদের ধরে আনুক। বব ক্যাটের বদলে শুধু ক্যাট। মিং-এর বদলে একজোড়া হুলো আর মেনি।

দীর্ঘকাল আমেরিকা প্রবাসী আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখালেখির সূচনা কলকাতার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে। পেশাদারী লেখার শুরু কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা ''পরিবর্তন''-এর মার্কিন করেসপনডেন্ট হিসাবে। কলকাতার ''বর্তমান পত্রিকা''য় যোগ দেন ৯১ সালে। গত আঠার বছর ধরে ''সাপ্তাহিক বর্তমান''-এ ''প্রবাসীর চিঠি''র কলাম লিখছেন। ছাত্রজীবনে ''বসুমতী'' ও ''কৃত্তিবাস'' এ কবিতা লিখেছেন। পরে গল্প লিখেছেন ''দেশ'', ''আনন্দমেলা'', ''শারদীয়া বর্তমান'' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। প্রকাশিত গল্প সংকলনগুলির নাম ''পরবাস'', ''এই জীবনের সত্য'' ও ''মেঘবালিকার জন্য''। এছাড়া বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে ''প্রবাসীর চিঠি''র প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলায় প্রবাসী লেখিকা হিসাবে পেয়েছেন ''উৎসব'' পুরস্কার। দীর্ঘ প্রবাস জীবনে সংসার ও লেখালেখি ছাড়াও নিউজার্সির সাংস্কৃতিক সংগঠন ''কল্লোলের'' স্থাপক সদস্য হিসাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। আলোলিকা ভৌগোলিক অর্থে মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র হারাতে চান নি।